অনীশ দেব

ভয়পাতাল



ভয়পাতাল



অনীশ দেব

পত্র ভারতী

॥ এক ॥

ডায়েরিটা পড়তে-পড়তে হাত যেন কেঁপে গেল। ভীষণ ভয় করতে লাগল আমার। মনে হল, আমি বড্ড একা—চারপাশে আর কেউ নেই।

অথচ মা আছে পাশের ঘরে। জানলার বাইরে আছে দিনের আলো। আছে চঞ্চল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আর আকাশে কালো মেঘ।

বাপির ডায়েরির পাতায় আবার চোখ গেল আমার। এসব কী ভয়ঙ্কর কথা লিখে গেছে বাপি! ডায়েরিতে জড়ানো হাতের লেখায় ফুটিয়ে তোলা অক্ষরগুলো যেন আমারই হাতের লেখা। আর অক্ষরগুলো যে-'কথা' বলছে সবই যেন আমারই কথা, আমারই জীবনের ঘটনা।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম।

বাপিও নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলেছিল, বাপির মৃত্যুর কারণ 'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট'—হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু বাপির ডেডবডি আমি দেখেছি। মুখটা হাঁ করা, ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা দাঁত আর টাকরার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো বড়-বড়—ঠিক সেদ্ধ ডিমের মতো—যেন এক্ষুনি ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। চোখের তারা দুটো যেন সেই ডিমের ওপরে বসানো গোলমরিচের দানা। এ ছাড়া বাপির মুখে অসংখ্য ভাঁজ—যে ভাঁজগুলো পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মানুষের মুখে থাকে না। ওগুলো যে ভয়ের ভাঁজ সেটা আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

বাপির মৃত্যুর আসল কারণ ভয়। অমানুষিক ভয়ে বাপি হার্টফেল করেছিল। যদি বাপি অজ্ঞান হয়ে যেত, তা হলে বেঁচে যেত। হার্ট অ্যাটাকটা বোধহয় আর হত না।

বাপি মারা গেছে আজ ক'দিন হল? সাড়ে তিনমাস মতন। মে মাসের পাঁচ তারিখে বাপি চলে গেছে। আর আজ আগস্টের একুশ।

বাপির মারা যাওয়ার খবরটা পেয়ে মা ভীষণ কান্নাকাটি করেছিল। মনে হতে পারে এটা আবার বলবার কী আছে! স্বামী চলে গেলে সব স্ত্রী-ই সর্বহারার মতো কাঁদে। কিন্তু না, বাপি একটু আলাদামতন ছিল। সবসময় সোজা পথে চলত আর

সোজা কথা বলত। তাই বিয়ের পঁচিশ বছর পরেও মা বাপিকে একইরকম শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। বাপির কেউ প্রশংসা করলে মায়ের মুখে আলো জ্বলে উঠত। বাপিকে মা বোধহয় মনে-মনে গুরুর আসনে বসিয়েছিল। তাই মায়ের কান্নাটা ছিল অন্যরকম। সবসময় পথ-দেখানো কাছের মানুষ ছেড়ে চলে গেলে অসহায় কেউ যেমন করে কাঁদে, অনেকটা সেইরকম।

বাপির এই ডায়েরিটার কথা মা-কে আমি এখনও বলিনি। বললেই মা এটা পড়তে চাইবে। তারপর ভয়ের স্বপ্ন দেখে মাঝরাতে চিৎকার করে জেগে উঠবে।

না, সেটা আমি চাই না।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ডায়েরিটা তুলে নিয়ে বেশ ভালো করে খবরের কাগজে মুড়ে নিলাম। তারপর জামাকাপড় রাখার আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কয়েক লহমা ভাবলাম, ডায়েরিটা এখানে লুকিয়ে রাখাটাই ঠিক হবে কি না।

নাঃ, কোনও চিন্তা নেই। মা কখনও আমার ঘরে ঢুকে আলমারি হাঁটকায় না। সুতরাং আলমারি খুলে চটপট ডায়েরিটা কয়েকটা চুড়িদারের ফাঁকে গুঁজে দিলাম। বাপির 'ভয়' আপাতত এখানেই লুকিয়ে থাক।

আলমারি বন্ধ করে আবার বিছানায় এসে বসলাম।

মনটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর আকাশের ঝাপসা ঘোলাটে মেঘ কেমন যেন মনখারাপ করে দিচ্ছে।

বাপি চলে যাওয়ার পর থেকে আমি আর মা অফুরন্ত সময় হাতে নিয়ে বসে থাকি। অথচ বাপি যখন ছিল, তখন ফুরসত ছিল কত কম।

বাড়িতে থাকলে বাপি সবসময় হইচই করত, বকবক করত, টিভি দেখত।

টিভি দেখত শুধু নয়, কোন চ্যানেল দেখবে তাই নিয়ে আমার আর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিত। বাপির খুব ফেবারিট চ্যানেল ছিল ডিসকাভারি আর ডব্লিউ ডব্লিউ ই-র বেদম লড়াই। আমরা কিছু বললেই বলত, 'তোরা বুঝবি না—জীবনে লড়াইটাই হচ্ছে আসল। ডিসকাভারি চ্যানেলের জীবজন্তু পোকামাকড় সব লড়াই করে বেঁচে থাকে—আর ডব্লিউ ডব্লিউ ই-র এই মুশকো জোয়ানগুলো। শোন অন্তু, লাইফটাই হচ্ছে ফাইট—ফাইট ফর এক্সিস্টেন্স।'

মা বলত, 'তুমি কখনও তর্কে হারবে না। যেভাবে হোক আমাদের যা-হোক-কিছু একটা বুঝিয়ে দেবেই!'

উত্তরে বাপি হা-হা করে হাসত।

টিভি-র ওই দুটো চ্যানেল ছাড়া বাপি সবরকম খবর শুনত—ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি। কারণ, বাপি ছিল রিপোর্টার। 'সুপ্রভাত' কাগজে বাপি সিনিয়ার রিপোর্টার কাম ফিচার রাইটার ছিল। বাপির করা বহু 'স্টোরি' সুপারহিট হয়েছে।

মারা যাওয়ার তিনমাস আগে বাপি ড্রাগ মাফিয়াদের নিয়ে একটা ফিচার করেছিল। সেটা চার কিস্তিতে বেরিয়েছিল কাগজে। সেই লেখাটায় এমন অনেক তথ্য ছিল যা পুলিশের কাছেও ছিল অজানা। ফলে ওই লেখার সূত্রে বেশ কয়েকজন মাফিয়া ধরা পড়েছিল পুলিশের জালে।

সেই সময়ে বাপিকে নাম-না-জানা লোকেরা হুমকি দিত টেলিফোনে। কিন্তু বাপি একটুও উত্তেজিত না হয়ে শান্ত গলায় হেসে-হেসে তাদের সঙ্গে কথা বলত।

'আমার তো এখন আর কিছু করার নেই, ভাই। আপনারা বরং "সুপ্রভাত"-এর অফিসে ফোন করুন। এখন সবকিছু মালিক আর সম্পাদকের হাতে। না, না, আমাকে গালিগালাজ করে কোনও লাভ নেই...বুঝতে পারছি আপনার খুব রাগ হচ্ছে...কিন্তু কী করব বলুন। যা সত্যি সেটা লেখাই তো রিপোর্টারদের কাজ। না, না, আপনার এই গালাগালিতে আমি কিছুই মনে করছি না। আপনার জায়গায় আমি হলেও এরকম আজেবাজে গালাগাল দিয়ে মুখ খারাপ করতাম। আপনি পত্রিকা-অফিসেই ফোন করুন। আচ্ছা, রাখছি ভাই...থ্যাংক য়ু...।'

মা অবাক হয়ে বাপিকে দেখত। এই লোকটার কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই!

না, বাপি ভয় পেত না। সেইজন্যেই খবরের কাগজের জগতে সবাই বাপিকে অন্য চোখে দেখত। বলত, 'সুরঞ্জন মজুমদার আসলে হচ্ছে ফিয়ারলেস মজুমদার। ও এমন সাহসী যে, নিজের বউকেও ভয় পায় না।'

এসব কথা বাপি আমাকে আর মা-কে শোনাত, আর একইসঙ্গে গলা তুলে হা-হা করে হাসত। তখন যদি আশেপাশে কাক-চড়ুই-পায়রা থাকত, নির্ঘাত ওই বলগাহীন হাসির দাপটে উড়ে পালাত।

বাপি বলত, 'শোনো অন্তু আর অন্তুর মা, ভয় পেয়ে থমকে গেলে কখনওই তুমি সেন্‌সেশনাল স্টোরি করতে পারবে না। ভালো স্টোরি করতে গেলে অনেক রিস্ক নিতে হয়। তা হলে ভয় পেলে চলবে!'

তো সেই ফিয়ারলেস মজুমদার ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং ভয়টাও নিশ্চয়ই ছিল বড়মাপের ভয়।

ঘড়ির দিকে চোখ গেল আমার। সাড়ে চারটে বাজে। আকাশের রং বদলায়নি বলে দুপুরটা কখন বিকেল হয়ে গেছে একটুও টের পাইনি। এখুনি হয়তো মা চা নিয়ে আসবে।

রান্না তো দূরের কথা, সামান্য চা-টুকুও মা আমাকে করতে দেয় না। বলে, 'রান্নাবান্না যা করার বিয়ের পর করবি। আমিও তো বিয়ের পরে সবকিছু শিখেছিলাম!'

মা বড্ড ভালোবাসে আমাকে। বাপি চলে যাওয়ার পর থেকে আরও যেন আঁকড়ে ধরেছে। মা-কে ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না!

হঠাৎই টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলামাত্রই ওপাশ থেকে কথার ফুলঝুরি ঠিকরে বেরোল।

'হাই, অন্তরা! আমি ঝিমলি। তোর আজকের আর্টিক্‌লটা পড়লাম—"সুপ্রভাত"-এ। ইট্‌স রিয়ালি গ্রেট। লেখায় তুই যে-যে পয়েন্টগুলো বলেছিস আমার ওপিনিয়ানও তাই, য়ু নো। আমি ড্যাডকে বলেছি, এই দ্যাখো, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড কী হাই-ফাই একটা আর্টিক্‌ল লিখেছে। তারপর...।'

ঝিমলি সবসময় এত কথা বলে যে, ওর টেলিফোন-রিসিভারে কানে শোনার অংশটুকু না থাকলেও চলে যেত। ওর সঙ্গে আমি সিটি কলেজে ফিজিক্স অনার্স করেছি। তারপর ও এম. সি. এ. পড়তে ঢুকেছে, আর আমি জার্নালিজ্‌ম-এ সার্টিফিকেট কোর্স করেছি। ঠিকভাবে বলতে গেলে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব মোটামুটি চার বছরের, কিন্তু ও কীভাবে যেন সেটাকে চল্লিশ বছরের বানিয়ে দিয়েছে। ওর সঙ্গে এত মিশেছি অথচ একদিনের জন্যেও ওকে মুখভার করে থাকতে দেখিনি। ঝিমলির বোধহয় কোনও দুঃখ নেই।

ঝিমলি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করেছে। বাংলায় বেশ কাঁচা—বাংলা লেখা পড়তে ওর ভীষণ অসুবিধে হয়। কিন্তু আমার লেখা কোথাও বেরোলে সেটা ও বানান করে হলেও পড়ে শেষ করবে এবং ফোন করে জানাবে লেখাটা 'কী দারুণ! ফ্যানট্যাস্টিক! ডিভাস্টেটিং!'

ও আমার ভীষণ বন্ধু। বাপি মারা যাওয়ার পর ও প্রায় একমাস ধরে আমার কাছে-কাছে ছিল। আর নানানভাবে আমার মন ভালো করার চেষ্টা করে গেছে।

'তোর লেখার নামটাও একসিলেন্ট ঃ "বর বড়, না কনে বড়"। আমার কাছে তোর কথা শুনে ড্যাড-মাম দুজনেই আর্টিক্‌লটা পড়েছে—ওদেরও ভালো লেগেছে। তুই লেখা চালিয়ে যা। ডোন্ট স্টপ। আফটার অল ইট্‌স ইন ইয়োর ব্লাড। তুই...।'

ইট্‌স ইন ইয়োর ব্লাড!

আমার রক্তে লেখালিখি মিশে আছে! বাপি মিশে আছে তা হলে!

এভাবে কথাটা আগে কেউ বলেনি—ঝিমলিও না।

লেখালিখির শখ আমার একটু-আধটু ছিল। বাপি সেটা জানতে পেরে শখটাকে আরও উসকে দিয়েছিল। মাঝে-মাঝে লেখা কারেকশান করে দিত, কিংবা নতুন কোনও টপিক নিয়ে লেখার আইডিয়া দিত। একদিন নিজের অফিসে আমাকে নিয়ে গিয়ে কোলিগদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওঁরা সবাই আমাকে লেখার উৎসাহ দিয়েছিলেন।

এরপর আমার প্রথম লেখা বেরোল 'সুপ্রভাত'-এ। বিষয় ঃ আধুনিক তরুণ-তরুণীদের স্বপ্ন।

এটা ঠিকই যে, বাপি থাকার জন্যে লেখা ছাপানোর কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। তবে লেখাটা খুব একটা খারাপ হয়নি।

এর পরের লেখার বিষয় ছিল ঃ সেকালের খেলনা, একালের খেলনা। বিষয়টা আমি নিজেই ঠিক করেছিলাম, আর লেখাটা তৈরির জন্যে লাইব্রেরি ঘাঁটাঘাঁটি করে, দোকানে-দোকানে ঘুরে বেদম পরিশ্রম করেছিলাম। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন প্রবীণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের ছেলেবেলার খেলনা নিয়ে কথাবার্তাও বলেছিলাম।

লেখাটা দারুণ 'ক্লিক' করে গিয়েছিল।

তারপর থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। আমি বলতে গেলে 'সুপ্রভাত'-এর নিয়মিত ফিচার-লেখক হয়ে গেছি। অফিসে বাপির যাঁরা বন্ধু, তাঁদের কাছে আমার ডাকনাম হয়ে গেছে 'ফিয়ারলেস জুনিয়ার'। ওঁরা বলেছেন, হয়তো পুজোর পরেই 'সুপ্রভাত'-এ আমার একটা পাকাপাকি চাকরি হয়ে যাবে।

আমি এসব কথা ভাবছিলাম, আর ঝিমলি ফোনে একতরফা বকবক করে চলেছিল।

'...শোন, সোনুকে তোর মনে আছে? সেই যে, কলেজের ফাংশানে প্রিন্সিপালের ওয়াইফকে নিয়ে গান লিখে সেটা ক্যারিকেচার করে প্রেজেন্ট করেছিল। ওঃ, কাম অন, য়ু ক্যানট ফরগেট সোনু! সেই যে, লম্বা-লম্বা চুল, ডার্ক কমপ্লেকশান...হি হ্যাড আ ক্রাশ অন য়ু...।'

এইবার মনে পড়ল। ছেলেটা বেশ আড্ডাবাজ, ছটফটে ছিল। গানের গলাও খারাপ ছিল না। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইত। বলত, ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হতে চায়।

'কী হয়েছে সোনুর?' বুকের ভেতরে একবছর আগের কলেজের দিনগুলো ঝপ্ করে ফিরে এল।

'সোনু স্টেট্‌সে চলে গেছে, যাওয়ার আগে ফোন করেছিল। এই তো...লাস্ট মান্‌ডে। তখন তোর কথা জিগ্যেস করছিল। বলছিল, ঝিমলি, অন্তরাদিদিকা কেয়া সমাচার হ্যায়।'

'তুই কী বললি?'

'বললাম, তোর ড্যাডি রিসেন্ট্‌লি এক্সপায়ার করেছে। ইট ওয়াজ আ ভেরি স্যাড অ্যান্ড আনটাইম্‌লি ডেথ। বল, তাই না?'

আবার মনখারাপ হয়ে গেল আমার। বাপির ডায়েরিটা মনে পড়ে গেল। ইট ওয়াজ আ ভেরি স্যাড অ্যান্ড আনটাইম্‌লি ডেথ। বাপির এটা পাওনা

ছিল না।

ঝিমলির কথা ভালো করে কানে ঢুকছিল না আমার। শুধু যান্ত্রিকভাবে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছিলাম।

একটু পরে ও ফোন ছেড়ে দিল। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মা এসে ঘরে ঢুকল। হাতে দুটো চায়ের কাপ।

আমার মা-কে খুব মিষ্টি দেখতে। ছোটখাটো শান্ত চেহারা, চোখে চশমা। বয়েস ততটা না হলেও মাথার চুল চকের আঁচড় টানা ব্ল্যাকবোর্ড হয়ে গেছে।

বাপি মারা যাওয়ার পর মা-কে আমি থান পরতে দিইনি, মাছ-মাংসও ছাড়তে দিইনি।

খাওয়ার প্রসঙ্গে কোনও কথা উঠলেই বাপি মজা করে বলত, 'অন্তু, জানিস তো, তোর মা আমাকে বিয়ের পর-পর বলেছিল, মাছ না হলে ওর ভাত ওঠে না।' আর কথা শেষ করার পরই সেই টিপিক্যাল কাক-পায়রা-চড়ুই ওড়ানো হা-হা হাসি।

বিছানায় একটা পুরোনো খবরের কাগজ পেতে আমার চায়ের কাপটা রাখল মা। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে আলমারির পাশে রাখা তাকের কাছে গেলাম। বিস্কুটের কৌটো থেকে তিনটে বিস্কুট নিয়ে একটা মা-কে দিলাম।

মা বিছানায় বসে বিস্কুটে কামড় দিল, চায়ের কাপে চুমুক দিল। তারপর জানলা দিয়ে চোখ মেলে বৃষ্টি দেখতে লাগল।

বাপি বৃষ্টি ভালোবাসত।

আমি ঝিমলির ফোনের কথা মা-কে বললাম। তারপর লেখালিখি, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সংসারের টুকিটাকি—নানান বিষয়ে কথা শুরু করে দিলাম।

আমি বাড়িতে থাকলে মায়ের মনখারাপ হতে দিই না।

একটু পরে আবার ফোন বেজে উঠল।

চায়ের খালি কাপটা বিছানায় পাতা কাগজের ওপরে রেখে আমি উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম।

মিহিরদা। মিহির গাঙ্গুলি। 'সুপ্রভাত'-এর সিনিয়ার রিপোর্টার। বাপির দারুণ বন্ধু ছিলেন। বাপি মারা যাওয়ার পর অফিসের পাওনাগণ্ডা হিসেব করে পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মিহিরদা খুব হেল্প করেছিলেন। আমার লেখালিখির ব্যাপারেও মিহিরদা সবসময় ভরসার হাত বাড়িয়ে দেন।

এ ছাড়া, বাপির ডায়েরিটা মিহিরদাই আমাকে গত পরশু দিয়েছেন। তবে কোথা থেকে মিহিরদা কীভাবে ডায়েরিটা পেয়েছেন তার কিছুই বলেননি। শুধু বাদামি কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'সুরঞ্জনের

ডায়েরি। আমার পড়া উচিত নয়। বউদিকেও দেওয়া ঠিক হবে না—কারণ, ওতে ভালো-মন্দ কী লেখা আছে আমি জানি না। তুমি এটা নাও। পড়ে দ্যাখো। তারপর যা ভালো বোঝো করো।'

আমি অবাক হয়ে ডায়েরিটা নিয়েছিলাম। কারণ, বাপি কখনও ডায়েরি লিখত বলে শুনিনি কিংবা দেখিনি।

আমি রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলামাত্রই মিহিরদা বললেন, 'অন্তরা, মিহিরদা বলছি—মিহির গাঙ্গুলি। সিনিয়ার রিপোর্টার—"সুপ্রভাত"।'

'প্রত্যেকবার ফোনের শুরুতেই আপনার বায়োডেটা না-বললে চলে না?'

মিহিরদা আমার কথায় হেসে বললেন, 'শোনো ডিয়ার, এখন হচ্ছে সেল্‌ফ পাবলিসিটির যুগ। তাই শুরুতেই "যা দেবী সর্বভূতেষু"র মতো বায়োডেটার শ্লোকটা আওড়ে দিই।'

মিহিরদা এইরকমই। বয়েসটা ওঁর কম হলে জ্যাঠা ছেলে কিংবা ফাজিল বলতাম। কিন্তু যেহেতু ওঁর বয়েসটা প্রায় বাপির কাছাকাছি, তাই রসিক বলাই ভালো।

একবার ওঁর সামনে এই মন্তব্যটা করায় মিহিরদা বলেছিলেন, 'বয়েস তো কচিপানা, কিসুই জানো না। "ফাজিল" হল আরবি শব্দ—আর তার মানে হল, হেভি জ্ঞানী।'

জিগ্যেস করলাম, 'বলুন, কী মনে করে টেলিফোন?'

'তোমার লেখাটা পড়লাম। ভালোই হয়েছে—পাঞ্চ আছে। প্রশ্নটা ভালো তুলেছ ঃ বর বড়, না কনে বড়। আর শেষ পর্যন্ত উত্তরটাও দিয়েছ ভালোই—দুজনের মধ্যে শাশুড়িই বড়।' বলেই মিহিরদা ফোনের ও-প্রান্তে হাসতে লাগলেন।

আমি রাগ দেখিয়ে বললাম, 'লেখাটার মধ্যে শাশুড়িকে আবার কোথায় পেলেন! আসলে ভালো লাগেনি, তাই বলুন...।'

'না, মা-মণি—লেখাটা বেশ হয়েছে। আমি এমনি একটু মজা করছিলাম। যাকগে, শোনো—সুরঞ্জনের ডায়েরিটা পড়েছ?' মিহিরদার গলা কখন যেন সিরিয়াস হয়ে গেছে।

আমি আড়চোখে মায়ের দিকে একবার দেখলাম—বৃষ্টির দিক থেকে চোখ সরিয়ে এখন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

মা-কে বাপির ডায়েরিটার কথা বলিনি, বলতে চাইও না। তাই চাপা গলায় রিসিভারে জবাব দিলাম, 'পড়ছি, তবে এখনও শেষ হয়নি...।'

'কিছু পেলে?'

'হ্যাঁ—অল্প-অল্প...।'

'বোঝা যাচ্ছে, সুরঞ্জন কীসের ব্যাপারে স্টোরি করার জন্যে অত রিস্ক নিয়ে

যেতে উঠেছিল?'

'ন্-না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মিহিরদা বললেন, 'অন্তরা, তুমি কাল একবার আমাদের অফিসে আসতে পারবে?'

'পারব—কিন্তু কেন?'

'ওই ডায়েরিটার ব্যাপারে কয়েকটা কথা তোমাকে বলা দরকার। মানে, কীভাবে আমি ওটার খোঁজ পেলাম। কীভাবে ওটা জোগাড় করে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারলাম...এইসব আর কী!'

মিহিরদা আমাকে বলেছিলেন, ডায়েরিটা একরকম মিস্টিরিয়াসভাবেই ওঁর হাতে এসেছে। কিন্তু তারচেয়ে বেশি আর কিছু বলেননি। তখন আমার বেশ অবাক লেগেছিল। আর এখন...।

'ডায়েরিতে কী লেখা আছে তার একটু হিন্ট্স দেবে?' মিহিরদা জানতে চাইলেন।

আমি থমকে গেলাম। কী হিন্ট্স দেব মিহিরদাকে?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমার তো এখনও ওটা পড়া শেষ হয়নি...।'

মিহিরদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বোধহয় আমার পাশকাটানো উত্তরটা ওঁর পছন্দ হল না। তারপর একটা বড় শ্বাস ফেললেন, বললেন, 'অন্তরা, তোমাকে আগে বলিনি। কারণ, ভেবেছিলাম সময় হলে বলব। আগে তোমার কাছে জেনে নিই সুরঞ্জন ডায়েরিতে কী লিখে গেছে, তারপর...।'

'কী কথা, মিহিরদা?'

টেলিফোনের ও-প্রান্তে মিহিরদা কাশলেন। ওঁর একটু কাশির ধাত আছে।

কাশিটা সামলে নিয়ে বললেন, 'মারা যাওয়ার দু-দিন আগে...মানে, মে মাসের তিন তারিখে রাত দশটা নাগাদ...সুরঞ্জন আমাকে ফোন করেছিল...।'

আমার বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ শুরু হয়ে গেল।

মারা যাওয়ার দু-দিন আগে বাপি মিহিরদাকে ফোন করেছিল।

'কী বলেছিল বাপি?'

প্রশ্নটা করামাত্রই বুঝতে পারলাম ভুল করে ফেলেছি। কারণ, মায়ের চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, মা বিছানা ছেড়ে পায়ে-পায়ে চলে এসেছে আমার কাছে। এবং সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কথাবার্তাগুলো বোঝার চেষ্টা করছে।

মিহিরদা একটু থেমে-থেমে বললেন, 'অন্তরা, সেসব কথা টেলিফোনে বলাটা

ঠিক হবে না। সেইজন্যেই তোমাকে কাল অফিসে আসতে বলছি। সুরঞ্জনের কথায় এটুকু বুঝেছিলাম, ও খুব বিপদে পড়েছে...ভয় পেয়েছে। তাই জানতে চাইছিলাম, ডায়েরিটা পড়ে তুমি সেরকম কিছু জানতে পারলে কি না। তাহলে দুটো ব্যাপার যোগ করে আমরা সুরঞ্জনের মারা যাওয়ার মিস্ট্রিটা সলভ্ করতে পারতাম।'

আমি ডানহাত দিয়ে মা-কে ছুঁলাম। তারপর আস্তে-আস্তে বললাম, 'ডায়েরিটা পড়েও আমার সেরকম মনে হয়েছে। তা ছাড়া, ডায়েরিতে যা লেখা আছে সেটা পড়লে কেউই বিশ্বাস করতে চাইবে না।'

মা আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরল। চাপা গলায় জানতে চাইল, 'কার ডায়েরি, অন্তু?'

আমি চোখের ইশারায় মাথা নেড়ে মা-কে অপেক্ষা করতে বললাম।

মিহিরদা বললেন, 'ডায়েরিটা আমাকে পড়ানো যায়? মানে, ওতে যদি সুরঞ্জন ব্যক্তিগত কথা কিছু না লিখে থাকে তা হলে ওটা আমাকে পড়তে দিলে...মানে, কোনও অসুবিধে আছে?'

'না...এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু নেই, মানে...' আমি হোঁচট খেয়ে জবাব দিলাম, 'আমি আগে ওটা পড়ে শেষ করি...তারপর মনে হয় আপনাকে পড়তে দিতে পারব। মিহিরদা, আমি কাল নয়, পরশু আপনার অফিসে যাব।'

'বেশি দেরি কোরো না কিন্তু। হাতে সময় বড় কম।'

তার মানে? কী বলতে চাইছেন মিহিরদা?

সে-কথা জিগ্যেস করতেই মিহিরদা বললেন, 'যা বলছি সেটা বউদিকে বলার দরকার নেই। গত কয়েকদিন ধরে আমাকে কেউ টেলিফোন করে ভয় দেখাচ্ছে।'

কথাটা শোনামাত্রই আমার বুকের ভেতরে একটা সাপ হাঁটতে শুরু করল। সেইসঙ্গে কেমন একটা অদ্ভুত ঠান্ডা টের পেলাম—যে-ঠান্ডা সমস্ত অনুভূতি অসাড় করে দেয়।

আমার ফ্যাকাসে মুখের চেহারা দেখে মা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'কী হয়েছে, অন্তু, কী হয়েছে?'

॥ দুই ॥

'সুপ্রভাত' পত্রিকার অফিসটা বড্ড বেশি ঝকঝকে, বড্ড বেশি আধুনিক। গোটা অফিস এয়ার কন্ডিশন্ড তো বটেই, তার ওপরে রয়েছে ইলেকট্রনিক অটোমেশানের ছোঁয়া।

আর-একটু চেষ্টা করলেই অফিসটা 'পেপারলেস অফিস' হতে পারত।

ওদের রিসেপশান স্পেসটা রট আয়রন আর রাবার উডের ফার্নিচারে সাজানো। দেওয়ালের কোণে তিন-চারটে ফুলগাছ—তাতে লাল, নীল, হলুদ ফুল। ফুলগাছগুলো নকল, কিন্তু হুবহু আসলের মতো। কোনও বোকা মৌমাছি ভুল করে ওই ফুলে বসে পড়লে তাকে মোটেই দোষ দেওয়া যাবে না।

রিসেপশানে বসা দুটি মেয়ে এবং একজন পুরুষও ঠিক ওই ফুলগাছগুলোর মতন। ওদের ঠোঁটে প্রায়-আসলের-মতো নকল হাসি। এইখানে বসে সারাদিন ওরা হাসি আর আন্তরিকতা 'বিক্রি' করে—কখনও বিরক্ত হয় না, রেগে যায় না, বা ক্লান্ত হয় না। ওদের সামনে বসানো পার্সোনাল কম্পিউটারের মনিটরে রঙিন হরফ কিংবা ছবি। আর কিবোর্ডে ওদের আঙুল দরকার হলেই মাকড়সার মতো চলে বেড়াচ্ছে।

আমি এতদিন ধরে এই অফিসে যাতায়াত করছি তবুও ওদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। অথচ ওরা আমার দিকে তাকিয়ে অন্তত দুশো চল্লিশবার হেসেছে! ওদের হাসিটা সবসময় ঠোঁটে লেগে থাকে বলে মনে হয় ওদের অন্তরে আর কোনও হাসি জমে নেই, সব ফুরিয়ে গেছে।

ওদের সঙ্গে যান্ত্রিক কথাবার্তার পালা শেষ করে রিসেপশান পেরিয়ে গেলাম। মার্বেল পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলাম দোতলায়। সিঁড়ির লাগোয়া দেওয়ালে নাম-না-জানা শিল্পীদের পেইন্টিং ঝুলছে। সেগুলো আমার বহুবার দেখা। কিন্তু আজ সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটা ছবি আমাকে ভয় পাইয়ে দিল।

ছবিটার সব জায়গায় লাল রঙের ঢল নেমেছে। কোথাও-কোথাও গাঢ় লাল রং ঢেউ তুলে কমলা কিংবা হলুদ হয়ে গেছে। তারই মাঝে, ডানদিক ঘেঁষে, একটা অন্ধকার চোখ—কালো আর গাঢ় সবুজ রঙে তলিয়ে গেছে এক অতলান্ত ঘূর্ণির মতন। আর সেই গহ্বরের অতল থেকে উঠে আসছে সূক্ষ্ম সাদা ধোঁয়ার রেখা।

এই ছবিটা আগে বহুবার দেখা হলেও আজ, এখন, ভয় পেলাম। ডায়েরির লেখার সঙ্গে ছবিটার কোথায় যেন একটা গোপন মিল রয়েছে।

দোতলায় উঠে একটা কাচের দরজা আর একজন সিকিওরিটি গার্ড পেরোলেই মিহিরদার সেকশানে ঢুকে পড়া যায়।

ফ্লোরের বিশাল এলাকা বিলিতি কায়দায় বুক-সমান উঁচু কাঠ আর কাচের পার্টিশান দিয়ে গোলকধাঁধার মতো খোপ কাটা। সেই খোপগুলোয় বসে আছে পেশাদার অভিজ্ঞ মানুষগুলো—ভোরবেলায় যারা সারা পৃথিবীর খবর বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

গলা উঁচু করে মিহিরদার খোপটার দিকে তাকালাম আমি।

চুল-পাতলা-হয়ে-আসা মাথাটা দেখেই মিহিরদাকে চিনে নিতে পারলাম। **তারপরই** খোপের গোলকধাঁধায় ঢুকে এঁকেবেঁকে মিহিরদার কাছে পৌঁছে গেলাম।

মিহিরদা মাথা নিচু করে কাজ করছিলেন—কী একটা লিখছিলেন কাগজে।

আমি আলতো করে ডাকলাম, 'মিহিরদা—।'

মিহিরদা মুখ তুলে তাকালেন।

'আরে! তুমি এসে গেছ! তুমি তো দারুণ পাংচুয়াল!'

আমি হাসলাম। মিহিরদা ভালো করেই জানেন, আমি সময় মেনে চলতে ভালোবাসি। বাপিও ভালোবাসত।

'বোসো, বোসো। পাঁচমিনিট—হাতের কাজটা সেরে নিই।'

আমি একটা চেয়ারে বসলাম। কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করার সুবিধেওয়ালা খাটো-পিঠ ঘুরপাক চেয়ার। নাঃ, 'সুপ্রভাত'-এর অফিসে আরামের কোনও ঘাটতি নেই!

এমনসময় লম্বা রোগা চেহারার একজন মাঝবয়েসি মানুষ এগিয়ে এলেন আমার কাছে। সিনিয়ার সাব-এডিটর প্রকাশ সেন। সবসময় ফিটফাট হয়ে থাকেন। পোশাক থেকে পারফিউমের গন্ধ বেরোচ্ছে।

প্রকাশ সেন বাপির ভালো বন্ধু ছিলেন। এখন চোখাচোখি হতেই হাসলেন ঃ 'কেমন আছ, ফিয়ারলেস জুনিয়ার? তোমার পরশুর আর্টিক্‌লটা বেশ ক্লিক করে গেছে। চালিয়ে যাও—তোমার হবে।'

মিহিরদার হাতে কম্পিউটার প্রিন্টআউটের কয়েকটা গোছা ধরিয়ে দিয়ে প্রকাশ সেন বললেন, 'কাশ্মীরে মিলিট্যান্ট অ্যাক্টিভিটির ওপরে একটা স্টোরি করতে হবে—চিফের হুকুম। কাল অ্যাঙ্কর হবে। এগুলো তার র' মেটিরিয়াল। আমার স্টকে ছিল—আপনাকে দিতে বলেছে।'

মিহিরদা হেসে বললেন, 'গত একবছর ধরে জঙ্গিদের বিষয়ে রিপোর্ট করে-করে এক-একসময় আমার নিজেকেই জঙ্গি মনে হয়।'

প্রকাশ সেন ঠোঁট উলটে বললেন, 'কী বলব বলুন! আমাদের কাগজে আপনিই সেরা জঙ্গি এক্সপার্ট।' তারপর চোখ নাচিয়ে হাসলেন।

মিহিরদা বললেন, 'বুঝেছি, আজ অনেক রাত পর্যন্ত থাকতে হবে।'

প্রকাশ সেন চলে যেতেই মিহিরদা হাতের কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'চলো, বাইরে কোথাও বসে কথা বলব...।'

'সেটাই ভালো।' আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

সিঁড়ি নামতে-নামতে মিহিরদা চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'অন্তরা, ডায়েরিটা এনেছ?'

আমিও নিচু গলায় উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ—এনেছি।'

মিহিরদা সিঁড়ির ধাপে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কৌতূহলের চোখে আমার কাঁধ-ব্যাগের দিকে তাকালেন। তারপর নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন, 'চলো, "ব্যারন"-এ গিয়ে বসি।'

'ব্যারন' একটা ছোট রেস্তরাঁ। সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড আর কফি পাওয়া যায়। দোকানটার বয়েস অনেক, চেহারাও বেশ পুরোনো, তবে এয়ার কন্ডিশন্‌ড। সকাল থেকে যেরকম গুমোট আর মেঘলা তাতে 'ব্যারন'-এ বসতে আমার ভালোই লাগবে। আগেও ওখানে আমি বারদুয়েক গেছি।

'সুপ্রভাত'-এর বাইরের রাস্তাটা সবসময়েই আমার অপছন্দ।

রাস্তাটা চওড়া হলেও দুপাশের ফুটপাথ ঘেঁষে নানান রঙের গাড়ি দাঁড় করানো। ফলে পথটা অনেক সরু হয়ে গেছে। কর্পোরেশন কি ইলেকট্রিক কোম্পানির খোঁড়াখুঁড়ির দাপটে দু-দিকের ফুটপাথ ক্ষতবিক্ষত। তার ওপরে গাদাগাদি করে দাঁড়ানো পানের দোকান আর ফোনের দোকান। আবার কেউ-বা তার স্কুটারটি আর কোথাও জায়গা না পেয়ে ফুটপাথের ওপরেই দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে।

সব মিলিয়ে এক বীভৎস জটলা।

রাস্তার এখানে-ওখানে বৃষ্টির জল আর কাদা। ক'দিন ধরে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে ছাতা বন্ধ করতে-না-করতেই আবার খুলতে হচ্ছে। অবশ্য এখন বৃষ্টি নেই।

সাবধানে পা ফেলে আমি আর মিহিরদা সামনের বড় রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে বাঁ-দিকের ফুটপাথ ধরে দুটো দোকান পেরোলেই 'ব্যারন'।

অ্যালুমিনিয়াম আর কাঠের ফ্রেমে বসানো কাচের দরজা ঠেলে আমরা দুজনে 'ব্যারন'-এর ভেতরে ঢুকলাম। ফ্রেমের অ্যালুমিনিয়ামে ময়লা জমে আছে। এখানে-সেখানে তোবড়ানো। কাঠও জায়গায়-জায়গায় ভাঙ—পেরেক ঠুকে কোনওরকমে জোড়াতালি দেওয়া।

'ব্যারন'-এর ভেতরটা ঠান্ডা, কারণ মিহি শব্দে এসি মেশিন চলছে। কিন্তু ভেতরের যা চেহারা তাতে ব্যারনরা এখানে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বহুকাল আগেই। বিশাল ঘরের দেওয়ালে সময়ের ঝুলকালি। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও নিরিবিলিতে বসে কথা বলার পক্ষে বেশ ভালো।

মিহিরদার চাপে পড়ে মশলা দোসা খেতে হল, তারপর শব্দ করে চুমুক দিয়ে কফি। শব্দ করে চুমুক না দিতে পারলে চা কিংবা কফি কখনও জমে না।

কফি খেতে-খেতে মিহিরদা বাপির ডায়েরিটা দেখতে চাইলেন।

আমি চারপাশে একপলক চোখ বুলিয়ে কাঁধ-ব্যাগটা কোলে নিয়ে চেন খুললাম। তারপর ডায়েরিটা বের করে নিলাম ব্যাগের ভেতর থেকে।

অঙ্কের হিসেবে ডায়েরিটা তিনবছর আগের—কে যেন বাপিকে প্রেজেন্ট করেছিল। মলিন মেরুন রঙা ফোমে মোড়া এক্সারসাইজ খাতার মাপে তৈরি। এই ডায়েরিটা যে সবসময় বাপির কাছে-কাছে থাকত সেটা ডায়েরি পড়েই বুঝেছি।

ডায়েরিতে বাপির নানান কাজের নোট্‌স। বহু লোকের নাম, ফোন নাম্বার, তারিখ আর সময় লেখা—বোধহয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কখনও-কখনও কয়েকটা বিষয়ের নাম টেলিগ্রাফিক ল্যাঙ্গুয়েজে সংক্ষেপে লেখা রয়েছে। নিয়মিত ডায়েরি লেখা বলতে যা বোঝায় কোথাও সেরকম কিছু লেখা নেই—অন্তত প্রথম শ'খানেক পাতায়।

তারপর শুরু হয়েছে আসল কাহিনি—বাপির ভয় পাওয়ার কাহিনি। এবং এই অংশটা রোজনামচার আদলেই লেখা। তারিখ আর বার বসিয়ে পাতার পর পাতায় বাপি লিখেছে তাঁর ভয়ের অভিজ্ঞতার কথা।

প্রথম লেখাটার তারিখ ২ এপ্রিল, মঙ্গলবার। আর শেষ লেখাটার মাথায় বাপি লিখেছে, '৩ মে, শুক্রবার, (১৯ বৈশাখ), রাত এগারোটা' এবং তারপর মাত্র দশ-বারো লাইন এলোমেলো জড়ানো-প্যাঁচানো লেখা। সেই লেখার বেশিরভাগটাই আমি পড়ে উদ্ধার করতে পারিনি। শুধু শেষ দুটো লাইন পড়তে পেরেছি। বাপি লিখেছে ঃ 'আর কিছু লিখে যাওয়ার সুযোগ হয়তো পাব না, কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত আমি করবই—সহজে ছাড়ব না। ওরা বোধহয় জানতে পেরেছে...।'

বাপি কি বুঝতে পেরেছিল আর ডায়েরি লেখার সুযোগ পাবে না? সেইজন্যেই কি শেষবার ডায়েরি লেখার সময় বিস্তারিতভাবে দিন-তারিখ-সময়, এমনকী বাংলা তারিখ পর্যন্ত, লিখেছিল? তা ছাড়া 'ওরা' কারা?

ডায়েরিটা হাতে নিয়ে আমি বললাম, 'মিহিরদা, ডায়েরিটা আমি পড়েছি। আমি চাই...আপনিও এটা পড়ে দেখুন...।'

মিহিরদা টেবিলের ওপার থেকে হাত বাড়ালেন।

একজন বয়স্ক বেয়ারা এসে ভাজা মশলার বাটি রেখে গেল সামনে।

কফি শেষ করে আমি একচিমটে মশলা তুলে মুখে দিলাম। ডায়েরিটা মিহিরদার হাতে দিয়ে অনুযোগের সুরে বললাম, 'ডায়েরিটা কী করে আপনি পেয়েছেন সে-কথা কিন্তু আমাকে এখনও বলেননি!'

মিহিরদা ডায়েরিটা হাতে নিলেন। ওঁর হাত বোধহয় সামান্য কেঁপে গেল। কফির কাপে পরপর তিনটে চুমুক দিয়ে বললেন, 'বলছি...বলছি...। শুরু থেকে বলাই বোধহয় ভালো...।'

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। রেস্তরাঁর আবছা আলোয় মিহিরদার মুখটা কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল। তিনি বোধহয় ভাবছিলেন কোথা থেকে শুরু করবেন, অথবা, কতটা আমাকে বলা যায়।

আমি মিহিরদাকে দেখছিলাম। বয়েস বাপির মতোই—বাহান্ন কি তিপান্ন। সাদা জুলপি। কাঁচা-পাকা ভুরু। কপাল বেশ চওড়া। নাকের ওপর চকোলেট-রং শৌখিন ফ্রেমের চশমা। গাল সামান্য ভাঙা। সেখানে দু-একদিনের না-কামানো দাড়ি। চোয়ালের রেখা স্পষ্ট। চোখ মাপে ছোট তবে উজ্জ্বল—সবসময়েই যেন হাসছে। চোখের কোণ থেকে সরু-সরু ভাঁজের দাগ ছড়িয়ে পড়ে কাকের পায়ের ছাপ তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে গোটা মুখে কেমন একটা পোড়খাওয়া ভাব।

মিহিরদা কাশলেন কয়েকবার। ঠিক তখনই রেস্তরাঁর আরও শব্দ এই প্রথম আমার কানে ঢুকল।

উড়ন্ত মশার পিনপিন শব্দ করে এসি মেশিন চলছে। চামচ আর প্লেটে টুং-টাং মিষ্টি বাজনা বাজছে। আশপাশের কোনও টেবিলে কেউ চাপা আওয়াজে ট্রানজিস্টর চালিয়ে খেলার কমেন্ট্রি শুনছে। সেইসঙ্গে টুকরো হাসির শব্দ।

রেস্তরাঁর ভাজা-ভুজির গন্ধের সঙ্গে কারও পোশাকের পারফিউমের গন্ধ মিশে গিয়ে আমার নাকে এল।

মিহিরদা কফি শেষ করে একখাবলা মশলা মুখে ঢেলে দিলেন। পান চিবোনোর মতো চোয়াল নাড়তে-নাড়তে কয়েক সেকেন্ড কী ভাবলেন। তারপর কয়েকবার গলাখাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন।

'অন্তরা, তুমি তো জানো, সুরঞ্জন একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কলকাতার বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু কী অ্যাসাইনমেন্ট সেটা জানো কি?'

আমি মাথা নাড়লাম ঃ 'না, জানি না। বাপি শুধু বলেছিল, "একটা বড় কাজ নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। যদি ঠিকমতো খোঁজখবর করতে পারি তা হলে দারুণ একটা স্টোরি হবে...সবাই একেবারে চমকে যাবে।" তবে কাজটায় বোধহয় একটু রিস্ক ছিল।'

মিহিরদার চোয়াল নাড়ানো থেমে গেল। জিগ্যেস করলেন, 'রিস্ক ছিল জানলে কেমন করে?'

'বাপিই বলেছিল...।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন মিহিরদা, বললেন, 'হ্যাঁ, রিস্ক ছিল। আর সুরঞ্জনের স্টোরির বিষয়টাও ছিল ভারী অদ্ভুত। সেটা মাত্র দুজন জানত ঃ সুরঞ্জন, আর আমি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিহিরদা যোগ করলেন, 'এখন জানি একমাত্র আমি...।'

কী বিষয় নিয়ে স্টোরি করতে চেয়েছিল বাপি? আমার ভেতরটা উথালপাথাল ঝড়ের ঝাপটায় যেন কেঁপে উঠল। আবার সেই ড্রাগ মাফিয়াদের মতো কোনও বিপজ্জনক বিষয়?

'কী বিষয়, মিহিরদা?' আর থাকতে না পেরে জিগ্যেস করে ফেললাম।

'রিইন্‌কারনেশান—জন্মান্তর। তোমার বাপি জন্মান্তরের ওপরে একটা স্টোরি

করতে চেয়েছিল।'

ভারী অদ্ভুত বিষয় তো! মনে-মনে ভাবলাম আমি। হঠাৎই খেয়াল হল, আমি দাঁতে নখ কাটতে শুরু করেছি। কোনও কারণে টেনশান হলে আমার ছোটবেলাকার এই বদ অভ্যেসটা মাথাচাড়া দেয়।

ঠোঁটের কাছ থেকে হাত নামিয়ে নিলাম। তারপর নিচু গলায় জিগ্যেস করলাম, 'হঠাৎ জন্মান্তর নিয়ে বাপি স্টোরি করতে চেয়েছিল কেন?'

'কারণ, সুরঞ্জন একজন জাতিস্মরের সন্ধান পেয়েছিল—আট-ন'বছরের একটা ছোট ছেলে। কে যেন আমাদের অফিসে যোগাযোগ করে প্রথম সুরঞ্জনকে খবরটা দেয়। তুমি তো জানো, এইরকম সাংঘাতিক স্টোরি মেটিরিয়াল পেলে কেউ সেটা ডিসক্লোজ করে না—পাছে অন্য কেউ কায়দা করে ওটা করে ফ্যালে। রিপোর্টার-জার্নালিস্টদের মধ্যে এ ধরনের রাইভ্যাল্‌রি খুব কমন। তো সুরঞ্জন আমাকে বিষয়টা বলেছিল...কিন্তু সোর্স বলেনি, আর জায়গার নামটাও বলেনি। বলেছিল পরে বলব...।' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিহির গাঙ্গুলি : '...পরে জায়গাটার নাম আমাকে বলেছিল বটে, কিন্তু তখন তো অনেক...দেরি হয়ে গেছে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর মিহিরদা নরম গলায় বললেন, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, অন্তরা, মারা যাওয়ার দু-দিন আগে রাত দশটা নাগাদ সুরঞ্জন আমাকে ফোন করেছিল। তখনই জায়গার নামটা বলেছিল ও...সেইসঙ্গে ওর বিপদের কথাও বলেছিল...।'

বাপি বাইরে যাওয়ার সময় কোনও জায়গার নাম স্পষ্ট করে মা-কে বলে যায়নি। শুধু বলেছিল, 'বাংলা-বিহার বর্ডারের কাছাকাছি যাচ্ছি...একটু ঘোরাঘুরি করতে হবে। কাজ হয়ে গেলে...ফেরার পর...সব বলব। তোমাদের ফোন-টোন করার দরকার নেই...আমার তো পারমানেন্ট কোনও অ্যাড্রেস থাকবে না...আমিই সময়-সুযোগ মতো ফোন করে যা খবর দেওয়ার দেব। কোনও চিন্তা কোরো না।'

আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। সুরঞ্জন মজুমদার কিংবা ফিয়ারলেস মজুমদার নামের মানুষটা বিশাল আকার নিয়ে আমার চোখের সামনে হাজির হয়ে গেল। 'ব্যারন'-এর ছোট ঘরে মানুষটা এঁটে উঠছিল না। তার মাথা প্রায় সিলিং-এ ঠেকে গেল।

বাপি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত কি না জানি না, তবে মা বিশ্বাস করে। আর আমি? আমি বিশ্বাস করি না—অন্তত এখনও। কারণ, কেউ আমাকে কখনও এর কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি।

আঙুলের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলাম আমি। তারপর চোখ তুলে তাকালাম মিহিরদার দিকে। কাঁপা গলায় জানতে চাইলাম, 'ফোন করে কী বলেছিল বাপি?'

মিহিরদা কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, 'শুনবে? শুনলে কিন্তু তোমার কষ্ট হবে, অন্তরা।'

'হোক—আপনি বলুন। কষ্ট হলেও আমি সবটা শুনতে চাই...আমার শোনা দরকার...।'

'সুরঞ্জনের ফোনটা এসেছিল রাত দশটা নাগাদ। ও খুব চাপা গলায় কথা বলছিল...যাতে আশপাশের কেউ ওর কথা শুনতে না পায়। ও বলল, "মিহির, এখানে যে-অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছিলাম সেটা নিয়ে কাজ করতে-করতে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে।"

' "কী হয়েছে?" আমি জিগ্যেস করেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, ও ভীষণ ভয় পেয়েছে। কারণ, ওর গলা কাঁপছিল। অথচ সুরঞ্জন সহজে ভয় পাওয়ার ছেলে ছিল না।

'আমার প্রশ্নটা শোনার পর ও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "একটা স্টোরির ওপরে কাজ করতে গিয়ে আমি অন্য একটা স্টোরির মেটিরিয়াল পেয়ে গিয়েছিলাম। সেটা নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে আমি... আমি সত্যি-সত্যি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করে ফেলেছি। আমি...আমি...বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাবে। এতদিন তোমাকে ফোন করিনি...দরকার হয়নি, তাই করিনি। কিন্তু আজ মনে হল, এখন যদি ফোন না করি তা হলে আর বোধহয় চান্স পাব না। ওরা মনে হয় জানতে পেরে গেছে...।"

'আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছি, "কারা? কী জানতে পেরে গেছে?"

'উত্তরে সুরঞ্জন হেঁচকি তোলার মতো কয়েকটা শব্দ করল। বোধহয় ভয়ে নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিল না। আমি আরও কয়েকবার একই প্রশ্ন করায় ও কোনওরকমে জবাব দিল, "জানতে পেরে গেছে যে, আমি অনেক কিছু জানতে পেরে গেছি।"

'তখন আমি জানতে চেয়েছি, "ওরা কারা? মাফিয়া গ্যাং?"

'ও আমাকে একরকম থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "না, না, তুমি যা ভাবছ সেরকম কিছু নয়—একেবারে অন্যরকম—শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। মিহির, আমি সত্যি-সত্যি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করে ফেলেছি—সাপ না হলেও অনেকটা সাপের মতো। আমাকে...আমাকে...।" বলতে-বলতে কথা আটকে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিল সুরঞ্জন।

'আমি জিগ্যেস করলাম, "তোমার সেই জন্মান্তরবাদের কী হল? জাতিস্মর ছেলেটির দেখা পাওনি?"

'উত্তরে ও বলল, "হ্যাঁ, দেখা পেয়েছি। ওর নাম মলিন সামন্ত...চাঁদমনি গ্রামে

থাকে। কিন্তু ওর ব্যাপারটা নিয়ে প্রোব করতে-করতে...।"

'আমি বুঝতে পারছিলাম সুরঞ্জন ভেঙে পড়েছে। তাই প্রায় ধমকে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ওসব কথা থাক। আগে বলো, তুমি কোত্থেকে ফোন করছ। তোমার কোনও ভয় নেই...আমি যা করার করছি। তুমি আগে তোমার ঠিকানা বলো। এক্ষুনি।"

'আমার ধমকে সুরঞ্জন কেমন মিইয়ে গেল। তারপর ক্লান্ত গলায় ঠিকানাটা বলল আমাকে। বলার পর হঠাৎই ও কাঁদতে শুরু করল।

'আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ফিয়ারলেস মজুমদার কাঁদছে!

'কাঁদতে-কাঁদতেই ভাঙা গলায় সুরঞ্জন বলল, "আমি বড্ড দেরি করে ফেলেছি, মিহির। তুমি কি আর আমাকে রাখতে পারবে! অন্তু আর পূর্ণলতাকে আমার কথা বোলো। ওদের ভালো-মন্দে পাশে থেকো। আমার এই ফোনের কথা ওদের জানিয়ো না। শুনলে ওরা ভাববে...ভাববে আমি ভিতু ছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, যার মুখোমুখি আমি এসে দাঁড়িয়েছি মানুষ তা কখনও কল্পনা করতে পারবে না। পরে তুমি ওদের বুঝিয়ে বোলো। অন্তু আর পূর্ণলতাকে দেখো...।" '

মিহিরদা থামলেন। মাথা নিচু করে রইলেন।

আমি মিহিরদার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বেশ টের পাচ্ছিলাম, আমার চোখ জ্বালা করছে, দু-গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আমি চোখের জল মোছার চেষ্টা করলাম না।

পূর্ণলতা আমার মায়ের নাম। এই নামটা যে কত সত্যি তা শুধু আমিই জানি। মা খুব মিষ্টি, আর নরম—লতারই মতো। এসব কথা শুনলে মা সইতে পারত না। আমিও কি পুরোপুরি সইতে পারছি?

বাপির টেলিফোনের কথাগুলো আমার কানে ঝমঝম করে বাজতে লাগল। আমি মনে-মনে বললাম, 'না, বাপি, তুমি ভিতু ছিলে না। আমরা জানি—আমরা সব্বাই জানি।'

মিহিরদা জিভে একটা শব্দ করে বললেন, 'ব্যস, এই। তারপরই ও ফোন কেটে দিয়েছিল। এখন তো বুঝতে পারলে, কেন এসব কথা আমি আগে তোমাদের বলিনি।'

আমি ওড়না দিয়ে চোখের জল মুছে নিলাম। টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে ঢকঢক করে জল খেলাম। তারপর মিহিরদার চোখে তাকিয়ে বললাম, 'মিহিরদা, এবার জায়গাটার নাম বলুন। কোথা থেকে আপনাকে ফোন করেছিল বাপি?'

মিহিরদা আমার চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। আমার জলে

ভেজা চোখের তারায় বোধহয় একটা একগুঁয়ে জেদি ভাব খুঁজে পেলেন। ওঁর বাপির কথা মনে পড়ল কি না কে জানে!

মিহিরদা থেমে-থেমে বললেন, 'জায়গাটার নাম মাদিয়া—পুরুলিয়ায়—বাঘমুন্ডি থানা এলাকায়—সিংভূমের কাছাকাছি—সিংভূম নতুন হিসেবে ঝাড়খণ্ডে পড়ে। তো সেখানে "পথিক" নামের একটা হোটেলে উঠেছিল সুরঞ্জন...খুবই নোংরা সস্তা হোটেল। আসলে "মাইনিং অ্যান্ড মিনারেল্‌স" নামে একটা আধা-সরকারি কোম্পানির লোকজন ওখানে গারনেট—মানে, যেটাকে বাংলায় তামড়ি বলা হয়—তার সন্ধানে বছরখানেক ধরে খোঁড়াখুঁড়ি করছে। তাই যে যেমনভাবে পেরেছে...টিন, কাঠ, পাথর, বালি, সিমেন্ট দিয়ে যা-হোক করে হোটেলগোছের কিছু একটা বানিয়ে ফেলেছে...তারপর আমাদের মতো শহুরে লোকজনকে ভাড়া দিচ্ছে, ব্যাবসা করছে। সেরকমই একটা জোড়াতালি দেওয়া হোটেলে উঠেছিল সুরঞ্জন। তিন তারিখ রাতে যখন আমাকে ও ফোন করেছিল তখন জায়গাটার নাম আমাকে বলেছিল...।'

আমি দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বাপি মারা যাওয়ার খবর আমরা পেয়েছিলাম মিহিরদার কাছ থেকে। কিন্তু মিহিরদা কার কাছে খবর পেয়েছিলেন জানি না।

বাপির ডেডবডি নিয়ে আসার জন্যে মিহিরদাই গিয়েছিলেন। যাওয়ার আগে মা-কে দিয়ে কীসব কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়েছিলেন—যাতে বডি নিয়ে আসতে কোনও অসুবিধে না হয়। তারপর 'সুপ্রভাত'-এর সোর্স কাজে লাগিয়ে বডি এনে কলকাতায় পোস্টমর্টেম করিয়েছেন। বাপির ডেডবডি তখনই আমি দেখেছি। দেখে ভয় পেয়েছি।

বেয়ারাকে ডেকে মিহিরদা আবার কফির অর্ডার দিলেন। বললেন, 'কিছু একটা না নিলে বেশিক্ষণ বসা যাবে না।'

আমি কোনও কথা বললাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম আসল গল্পটা শোনার জন্যে।

মিহিরদা বলতে লাগলেন। সেই গল্পের মধ্যে কোথায় যেন একটা সাপ-খেলানো সুর লুকিয়ে ছিল...আমি তার ঘোরে ডুবে গেলাম, তার মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলাম।

বাপির ফোন পাওয়ার পর একটা দিন মিহিরদা ভীষণ দুশ্চিন্তায় কাটালেন। মনটা তীর-বেঁধা পাখির মতো ছটফট করতে লাগল। এমন সময় কেউ একজন তাঁকে উড়ো ফোন করে জানাল, সুরঞ্জন মজুমদার নামে একজন সাংবাদিক মারা গেছেন। তিনি মারা যাওয়ার আগে মিহির গাঙ্গুলি নামটা করে একটা ফোন নম্বর দিয়ে গেছেন। তাই সে ফোন করে এই খবরটা দিতে পারছে।

লোকটা কে মিহিরদা জানেন না।

কারণ, বাপির মারা যাওয়ার খবরটা দিয়েই সে ফোন ছেড়ে দিয়েছিল। তবে তার আগে হোটেলের নাম আর জায়গার নাম মিহিরদাকে বলেছিল।

মিহিরদা আর দেরি করেননি। তখনই মাদিয়া রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

ট্রেন, বাস, প্রাইভেট কার, হাঁটা পথ—সবমিলিয়ে মিহিরদা ৬ তারিখে, সোমবার, অনেক খোঁজাখুঁজির পর, সন্ধে নাগাদ পৌঁছলেন সেই হোটেলে।

শাল-মহুয়ার জঙ্গলের আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু গরম বাতাস তখনও ঠান্ডা হয়নি। চারপাশে শব্দ প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু মেটাল রোডের ওপর দিয়ে জিপ কিংবা অন্য কোনও গাড়ি চলে গেলে ইঞ্জিনের গর্জন শোনা যাচ্ছে। সন্ধে হতেই গাড়ি চলাচল এমন কমে গেল যে, মনেই হবে না এ-পথ দিয়ে কখনও গাড়ি চলে।

আধা-শহুরে জনপদের কোল ঘেঁষে 'পথিক' দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের দোতলা উঁচু জীর্ণ খাঁচাটা এমনভাবে হেলে রয়েছে যে, মনে হচ্ছে যে-কোনও সময় টলে পড়ে যাবে।

হোটেলের রং-চটা তোবড়ানো সাইনবোর্ডের মাথায় একটা একশো ওয়াটের বাল্‌ব চল্লিশ ওয়াটের তেজ নিয়ে জ্বলছিল। আসার পথেই মিহিরদা লক্ষ করেছেন, এদিকটায় ভোল্টেজ বেশ কম। পথচলতি দু-একটা দোকানে টিমটিমে বাল্‌বের পাশাপাশি লম্ফ কিংবা মোমবাতি জ্বলতে দেখেছেন।

হোটেলে ঢুকতেই একটা অচেনা গন্ধ মিহিরদার নাকে এল। অনেকদিন ধরে মুখ-বন্ধ-রাখা কোনও কৌটোর ঢাকনা খুললে যেরকম গন্ধ বেরোয়, অনেকটা সেইরকম।

হোটেলের কাউন্টারের মাথায় একটা টিমটিমে উলঙ্গ বাল্‌ব ঝুলছে। কাউন্টারের সামনে দুটো ছাই রঙের প্লাস্টিকের চেয়ার। তার পাশে কাঠের তৈরি একটা লম্বা বেঞ্চি—তার দু-একজায়গায় কাঠ এবং লোহার পাত দিয়ে জোড়া-তাড়া দেওয়া রয়েছে।

কাউন্টারের চেহারা সাধারণ টেবিলের মতো। তাতে আলপিন বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে দিনের-পর-দিন বহু আঁকিবুকি কাটা হয়েছে।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি বিড়ি টানার ভঙ্গিতে সিগারেট খাচ্ছিল। তার নিশ্চিন্ত ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবীতে আর কোনও সমস্যাই নেই।

লোকটির সিগারেট খাওয়া দেখে মিহিরদার সিগারেট-তেষ্টা পাচ্ছিল। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন।

লোকটির গায়ে সস্তা প্রিন্টের হাওয়াই শার্ট—শরীরের নীচের অংশ টেবিলের

আড়ালে। মাথার ওপরে বাল্‌ব জ্বলছে বলে চোখ দুটোকে কালো গর্ত মনে হচ্ছে—তারই ভেতর থেকে সাদা অংশ উঁকি দিচ্ছে। ওর মুখের সামনে সিগারেটের ধোঁয়া উড়তে থাকায় মুখটা কেমন আবছা মনে হচ্ছিল।

লোকটির কাছে এসে মিহিরদা জিগ্যেস করলেন, 'সুরঞ্জন মজুমদার নামে একজন রিপোর্টার এই হোটেলে...মানে, উঠেছেন...।'

সিগারেটে কষে টান দিয়ে দাঁত বের করে মুখ বিকৃত করল লোকটি, তারপর বলল, 'উঠেছিলেন—কিন্তু এখন তো আর নেই! উনি মারা গেছেন।'

মৃত্যুসংবাদ কেউ যে এই ঢঙে পেশ করতে পারে সেটা মিহিরদার জানা ছিল না।

সুরঞ্জন মারা গেছে! টেলিফোনে পাওয়া উড়ো খবরটা তা হলে ঠিক! মিহিরদার বুকটা কষ্টে ছেয়ে গেল। সুরঞ্জন আর নেই!

বাপির কথাগুলো মনে পড়ে গেল মিহিরদার ঃ '...আমি বড্ড দেরি করে ফেলেছি, মিহির। তুমি কি আর আমাকে রাখতে পারবে!'

'কখন মারা গেছেন?' মিহিরদা জিগ্যেস করলেন। আর ঠিক তখনই শুনতে পেলেন, হোটেলের দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে আসছে। কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে ঃ ঠক-ঠক, ঠক-ঠক...।

'মারা গেছেন কাল রাতে।' সিগারেটের তামাক কিংবা ওইরকমই কিছু একটা ঢুকে পড়েছিল লোকটির মুখে। শব্দ করে 'থু-থু' করে সেটা শূন্যে ছুড়ে দিল। তারপর ঃ 'ওপরে যান না—এখনও ওঁর বডি বিছানাতেই পড়ে আছে—আমি ডিসটার্ব করিনি...আর পুলিশেও খবর দিইনি—মানে, বাঘমুন্ডি থানায় কিছু জানাইনি।'

মিহিরদার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠেছিল। সুরঞ্জন মজুমদারের দেহ সেই কাল রাত থেকে আজ সন্ধে পর্যন্ত একইভাবে পড়ে আছে! আশ্চর্য!

একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা মিহিরদার চোখ ভিজিয়ে দিল।

ভেঙে যাওয়া গলার স্বর সামলে নিয়ে মিহিরদা বললেন, 'আমাকে শিগগিরই সুরঞ্জন মজুমদারের ঘরে নিয়ে চলুন। কত নম্বর ঘরে উঠেছিল ও?'

লোকটি সিগারেটে এমনভাবে মরিয়া টান দিল যেন গাঁজায় টান দিচ্ছে। তারপর মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করে বলল, 'পাঁচ নম্বর—।'

সিঁড়ির 'ঠক-ঠক' শব্দটা একতলায় চলে এল। মিহিরদা পাশ ফিরে তাকালেন শব্দটার দিকে।

একজন লম্বা ঢ্যাঙা মানুষ। পরনে ময়লা শার্ট আর খাটো ধুতি। গায়ের রং ঘোর কালো। দড়ি পাকানো চিমসে চেহারা। চোখের কোল বসা। মুখে বয়েসের ভাঁজ। মাথার ঘন চুল ধবধবে সাদা। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। বাল্‌বের আলো

চশমার কাচে ঠিকরে পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

লোকটির পায়ের দিকে তাকিয়ে শব্দের কারণটা বুঝতে পারলেন মিহিরদা।

লোকটির পায়ে কোনও চটি বা জুতো নেই। বরং বলা ভালো, তার বাঁ-পায়ে কোনও চটি কিংবা জুতো নেই। আর ডানপা-টা কাঠের—একটা মোটাসোটা কাঠের লাঠি হেঁটো ধুতির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

মিহিরদা অবাক চোখে লোকটিকে দেখছিলেন। ওর চোখে-মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। যেন প্রাচীন বটগাছ কিংবা পাথর।

সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো কিংবা রণপা লাগানো ডাকাতের মতো স্বচ্ছন্দে হেঁটে এল লোকটা। কোনও লাঠির ভরসা ছাড়াই কেউ যে কাঠের পা নিয়ে এত স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারে সেটা মিহিরদার জানা ছিল না।

মিহিরদা চোখে অবাক ভাব লক্ষ করে কাউন্টারে দাঁড়ানো লোকটি হাসল ঃ 'ও হচ্ছে মধুসূদন—মধু—আমাদের বেয়ারা। খুব পুরোনো লোক—আমার চেয়েও পুরোনো। একসময় ছৌ নাচত। হেভি ব্যালেন্স।'

মধুসূদন মাথাটা পেছনে হেলিয়ে চশমার কাচের ফাঁক দিয়ে মিহিরদার দিকে তাকিয়ে কী দেখতে চাইল কে জানে। ওর চোখের দৃষ্টি ভালো করে বোঝা গেল না। শুধু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

কাউন্টারে দাঁড়ানো লোকটি সিগারেটে শেষ এবং প্রাণান্তকর টান দিয়ে টুকরোটা দু-আঙুলে টিপে বের করে নিল ঠোঁট থেকে। সেটা বেশ ভালো করে পরখ করে টেবিলেই ঘষে নিভিয়ে দিল। আর একইসঙ্গে জানতে চাইল, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন...সুরঞ্জন মজুমদারের কে হন?'

মিহিরদা খানিকটা অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকালেন। ওর প্রশ্নটা কি নিতান্তই সাদামাটা? নাকি কিছুটা সন্দেহের ছাপ রয়েছে সেখানে?

'আমার নাম মিহির গাঙ্গুলি...' পকেট থেকে প্রেস কার্ড বের করে দেখালেন মিহিরদা ঃ 'আমি কলকাতা থেকে আসছি। আমি আর সুরঞ্জন একই নিউজপেপারে চাকরি করি...মানে, করতাম। "সুপ্রভাত" কাগজে...।'

'অ। তা উনি যে মারা গেছেন সে-খবরটা আপনাকে দিল কে?'

আবার অবাক মিহিরদা।

'আপনি দেননি! মানে, ফোনে খবরটা পেয়ে আমি ভেবেছি...আপনি...মানে আপনারা কেউ হয়তো আমাকে ইনফর্ম করেছেন...।'

লোকটি হাসল, বলল, 'যাকগে, ওসব ভেবে লাভ নেই। এখানে অনেক পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়—সবকিছুর মানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আপনি যদি আজ এসে না পড়তেন, তা হলে কালই জঙ্গল-টঙ্গলে বডিটার একটা গতি করে দিতাম।

বুঝতেই পারছেন, এ-হোটেলের ম্যানেজার বলুন, মালিক বলুন—সবই আমি। আমার তো একটা দায়িত্ব আছে!' মধুসূদনের দিকে ফিরে তাকাল ম্যানেজার, একটা চাবি ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মধু, ওঁকে পাঁচ নম্বর রুমে নিয়ে যাও।' তারপর আবার মিহিরদাকে লক্ষ করে বলল, 'হোটেলের খরচাপত্তর যা হয়েছে আমি বিল করে রাখছি। পরে আপনাকে বুঝিয়ে দেব। আর বডি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও হেল্প লাগলে বলবেন।'

মিহিরদা ঘাড় নাড়লেন।

মধু চাবিটা ম্যানেজারের, অথবা মালিকের, হাত থেকে নিয়ে কেমন যেন ঘষা গলায় বলল, 'আসুন, বাবু...।'

ও খটখট শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। মাঝে-মাঝে দেওয়াল ধরতে লাগল ব্যালান্স রাখার জন্যে। মিহিরদা ওকে অনুসরণ করলেন।

ঘুপচি সিঁড়ির দুপাশে নোনা-ধরা পলেস্তারা-খসা দেওয়াল। মিহিরদার মনে হচ্ছিল যেন সিঁড়ি নয়—সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে চলেছেন। একতলা কিংবা দোতলার বাল্‌বের আলো তেরছাভাবে সিঁড়ির কোনও-কোনও জায়গায় ছিটকে এসে পড়েছে। মধু আগে-আগে ওঠায় ওর ছায়া মিহিরদার গায়ে লেপটে ছিল।

ভয় পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও মিহিরদার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল।

দোতলায় উঠে সরু বারান্দায় পা রাখলেন ওঁরা।

মেঝেতে আঁকাবাঁকা ফাটল। কোথাও বা মেঝের খানিকটা অংশ ঢালু হয়ে টাল খেয়ে গেছে। বারান্দায় পুরোনো ঢঙের সারি-সারি লোহার শিক বসানো রেলিং। তার বেশ কয়েকটা শিক উধাও। ফলে সেই ফাঁক দিয়ে অনায়াসে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে নীচে পড়ে যেতে পারে। রেলিং-এর কাঠের হাতল রং-চটা, নড়বড়ে।

বারান্দায় আলো বলতে সিলিং থেকে ঝুলন্ত তারের ডগায় বাঁধা একটা বাল্‌ব। তার আলোয় দু-একটা আরশোলা চোখে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে মিহিরদার গা-টা কেমন শিউরে উঠল। মিহিরদা উড়ন্ত আরশোলা ভয় পান।

দোতলায় তিনটে ঘর। ঘরের দরজায় ক্যালেন্ডারের তারিখ কেটে আঠা দিয়ে সাঁটা।

প্রথম ঘরটার নম্বর চার। সেটা পেরিয়ে পরের ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মধুসূদন।

এটাই পাঁচ নম্বর।

দরজায় লোহার তালা ঝুলছিল। মধু ঝুঁকে পড়ে চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলল। তারপর হাতের চাপে দরজার পাল্লা খুলে দিল।

একটা নাম-না-জানা হালকা গন্ধ মিহিরদার নাকে আলতো করে ঝাপটা মারল। এবং মধুর শরীরের পাশ দিয়ে মিহিরদা সুরঞ্জন মজুমদারকে দেখতে পেলেন।

॥ তিন ॥

ঘরে একটা বাল্‌ব জ্বলছিল—বারান্দার মতোই সিলিং থেকে ঝুলন্ত তারে বাঁধা। এ ছাড়া, ডানদিকের দেওয়ালে আরও একটা বাল্‌ব হোল্ডারে লাগানো রয়েছে—তবে সেটা নিভে আছে। আর সিলিং-এর বাল্‌বের ঠিক ওপরেই ঝুল-কালি পড়া একটা সিলিং ফ্যান—চেহারা দেখে মনে হয় ওটা 'মারা' গেছে।

সিলিং-এর জ্বলন্ত বাল্‌বটা পেন্ডুলামের মতো দুলছিল। যেন ঘরে কেউ ছিল, চলে যাওয়ার আগে ওটা নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। অথচ ঘরের দরজা একটাই—যেখানে মিহিরদারা দাঁড়িয়ে আছেন। আর জানলাও একটা—দরজার ঠিক উলটো দিকে। সেটার পাল্লা খোলা। বাইরেটা অন্ধকার। শুধু পাতার খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধহয় জানলার বাইরে কোনও গাছ আছে—বাতাসে তার পাতা নড়ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে মিহিরদা একটা গন্ধ পাচ্ছিলেন—অনেকটা ন্যাপথালিনের গন্ধের মতন, তার সঙ্গে একটা মিষ্টি আমেজ। গন্ধটা কেমন নেশা-ধরানো।

মধু ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। মিহিরদা কাঁধে ঝোলানো ট্র্যাভেল ব্যাগটা বারান্দার মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন। তারপর মধুর পেছন-পেছন ঢুকে পড়লেন।

ঘরের দেওয়ালগুলো পলেস্তারা-খসা, নোনা-ধরা, স্যাঁতসেঁতে। সস্তার তিন অবস্থা নয়, যেন সাত অবস্থা হয়ে আছে। এরকম হোটেল সুরঞ্জন মজুমদার কি এমনি-এমনি পছন্দ করেছিল—নাকি এর আড়ালে কোনও রহস্য আছে?

মিহিরদা স্পষ্ট টের পেলেন, ঘরের ভেতরটা বেশ ঠান্ডা। এবং সুরঞ্জন মজুমদারের দিকে তাকিয়ে তার কারণটাও বুঝতে পারলেন।

ঘরের বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা সিঙ্গল খাট রয়েছে। তার বিছানার ওপরে একটা সাদা রঙের পলিথিন শিট পাতা। সেই পলিথিনের ওপরে সুরঞ্জনের দেহটা শোয়ানো। ওঁর শরীরের ওপরে অসংখ্য বরফের টুকরো চাপানো। তার অনেকটাই গলে জল হয়ে গেছে। পলিথিন বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে।

মৃতদেহ যাতে ঠিকঠাক থাকে তার জন্যে হোটেলের মালিকই এসব ব্যবস্থা করেছে। এর জন্যে যা-কিছু খরচ হয়েছে তা নিশ্চয়ই সুরঞ্জনের হোটেলের বিলের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে।

মিহিরদা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুরঞ্জনের শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া দেহটা চিত হয়ে পড়ে ছিল। দু-হাত দু-দিকে ছড়ানো। হাতের আঙুলগুলো বাতাস খামচে ধরার চেষ্টায় কাঁকড়ার পায়ের মতো বাঁকানো। দু-চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখ হাঁ করা, ঠোঁট ফোলা। আর চিত হয়ে থাকা দেহটা ধনুকের মতো সামান্য বাঁকা—যেন মারা যাওয়ার আগে সুরঞ্জন মজুমদার ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

মিহিরদা কেঁপে উঠলেন। এরকম বীভৎস মৃতদেহ তিনি কখনও দেখেননি।

বাল্‌বের আলোটা এপাশ-ওপাশ দুলছিল। তাতে মনে হচ্ছিল, মৃতদেহটা যেন নড়ছে।

মিহিরদার চোখে জল এসে গেল। ফিয়ারলেস মজুমদারের শেষটা এইরকম হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করার এই পরিণাম! এটাকে কি স্বাভাবিক মৃত্যু বলা যায়!

সুরঞ্জন মজুমদার যে মারা গেছে, এই খবরটা কে দিল মিহিরদাকে? এই হোটেলের মালিক সে-ব্যাপারে কিছু জানে না। শুধু বলেছে, এখানে অনেক পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়—সবকিছুর মানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

মিহিরদা বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন—হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন সুরঞ্জনের মাথার কাছটায়। ওর শক্ত-হয়ে-থাকা বাঁ-হাতটা চেপে ধরলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে কেঁদে ফেললেন। চশমায় চোখের জলের ফোঁটা পড়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল।

মেঝেতে গড়িয়ে পড়া বরফজলের ছোঁয়া মিহিরদা টের পাচ্ছিলেন। ওঁর প্যান্ট হাঁটুর কাছটায় ভিজিয়ে দিয়ে জলের সূক্ষ্ম ফোঁটা কৈশিক টানে তিলতিল করে প্যান্ট বেয়ে ওপরে উঠছিল।

হঠাৎই মিহিরদা ঝাপসাভাবে দেখতে পেলেন, সুরঞ্জনের মৃতদেহের পাশে জমে থাকা জল আর বরফের এখানে-ওখানে সবুজ রঙের কী যেন ভাসছে।

চোখ থেকে চশমা খুলে নিলেন মিহিরদা। জামার খুঁট দিয়ে কাচ মুছে নিয়ে চশমাটা আবার নাকের ওপরে বসালেন।

হ্যাঁ, ঠিকই তো!

বরফের ছোট-বড় টুকরোর গায়ে সবুজ শ্যাওলার মতো কী যেন লেগে আছে। সুরঞ্জনের গায়ে আর জামাকাপড়েও সেরকম কয়েকটা টুকরো নজরে পড়ল।

অতি সাবধানে একটুকরো সবুজ শ্যাওলা দু-আঙুলে তুলে নিলেন মিহিরদা। শ্যাওলার টুকরোটা বরফের মতো ঠান্ডা।

মিহিরদা আঙুলে আঙুল ঘষলেন। জিনিসটা কেমন যেন হড়হড়ে—অনেকটা জমাট বাঁধা লালার মতো।

মিহিরদার গা-ঘিনঘিন করতে লাগল।

ধীরে-ধীরে আঙুল দুটো নাকের কাছে নিয়ে এলেন। সুরঞ্জন মজুমদারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার সম্পর্কের কথা মনে করে একটা অদ্ভুত বেপরোয়া জেদ তৈরি করলেন। তারপর সেই জিনিসটার ঘ্রাণ নিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে মিহিরদার অনুভূতি কেমন অবশ হয়ে এল।

এ এক অদ্ভুত নতুন স্বাদের ঘ্রাণ। চেনা কোনও ঘ্রাণের তালিকায় একে রাখা যায় না। কিছুটা মিষ্টি, কিছুটা ঝাঁঝালো, কিছুটা বাসি খাবারের কটু গন্ধ মেশানো—এ যেন অন্য কোনও গ্রহের অচেনা কোনও উদ্ভিদের ঘ্রাণ।

মিহিরদা বরফজলে হাত ডুবিয়ে কাদা-কাদা হয়ে যাওয়া শ্যাওলাটা ধুয়ে নিলেন। তারপর প্যান্টে হাত মুছে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে যাবেন, হঠাৎই ভয়ে চাপা চিৎকার করে উঠলেন।

মিহিরদা চিৎকার করতে চাননি। কিন্তু কখনও-কখনও এমন অবস্থার মুখোমুখি মানুষকে দাঁড়াতে হয় যখন কোনওরকম সংযম কিংবা নিয়ন্ত্রণ কাজ করে না। এখনও তাই হল। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও চিৎকারটা মিহিরদার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

মিহিরদা ভয় পাওয়া চোখে তাকিয়ে ছিলেন সুরঞ্জন মজুমদারের মুখের দিকে।

একটা মোটাসোটা কালো লোমশ পোকা—মাপে প্রায় ভিমরুলের মতো হবে—অলস পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এসেছে সুরঞ্জনের হাঁ করা মুখের ভেতর থেকে। তারপর ওর শুকনো কালচে ঠোঁট বেয়ে চলে এসেছে নাকের কাছাকাছি। সরু-সরু অসংখ্য পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে সুরঞ্জনের কাঁচা-পাকা গোঁফের ওপরে।

মিহিরদা ঠিক তখনই চিৎকারটা করে উঠেছেন।

সেই চিৎকারে কি না কে জানে—পোকাটা সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল সুরঞ্জনের নাকের ডানদিকের ফুটোর ভেতরে।

মিহিরদার গা শিরশির করে উঠল। ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিলেন। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিলেন।

মধুসূদন এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে মিহিরদাকে লক্ষ করছিল। মিহিরদাকে ভয় পেতে দেখেই ও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় কাঠের পায়ে শব্দ তুলে দু-লাফে চলে এল মিহিরদার কাছে।

'কী হয়েছে, বাবু, কী হয়েছে? ভয় পেলেন না কি?'

মিহিরদা মধুসূদনের প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারলেন না। পাছে টলে পড়ে যান সেই ভয়ে বাঁ-হাতটা নোনা-ধরা দেওয়ালে রেখে হাঁপাতে লাগলেন।

মধুসূদনের ক্ষিপ্রতা মিহিরদাকে অবাক করে দিয়েছিল। লোকটার বয়েস কম করেও ষাট-পঁয়ষট্টি। মাথার চুল কাশফুল। তা সত্ত্বেও ওর দড়িপাকানো রোগা

পেশিতে এত শক্তি!

সেটা আরও ভালো করে বোঝা গেল একটু পরেই।

মিহিরদা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আর দেরি করব না, মধুসূদন। ডেডবডি নিয়ে আমি এখনই শহরে রওনা দেব। এসব চোখে দেখা যায় না।'

মাথাটা পেছনে সামান্য হেলিয়ে চশমার পুরু কাচের আড়াল থেকে মিহিরদার দিকে তাকাল মধুসূদন। ওর চোখ দেখা গেল না—শুধু সিলিং-এর জ্বলন্ত বাল্‌বটা চশমার কাচে আলোর ফুলকি হয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

মধুসূদন ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'সিটাই ভালো হবে, বাবু। ই-বডি এখানে রাখা ঠিক হবে নাকো।'

মিহিরদা ডেডবডির নাকের ফুটোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন—বোধহয় দেখতে চাইছিলেন ঘিনঘিনে কালো পোকাটা বেরিয়ে আসে কি না।

মধুসূদন মিহিরদার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'আর দেরি করবেন না, বাবু। সময়টা বড় ভালো নয়। আপনি...।'

মিহিরদা জিগ্যেস করলেন, 'ওই সবুজ-সবুজ শ্যাওলার মতো ওগুলো কী? তুমি কি কিছু জানো?'

'জানি অনেক কিছু, কিন্তু এখন কিছু বলতে পারব নাকো। এখন ভয়ের সময়...।'

'তার মানে!'

'ওই দেখুন—।' বলে ঘরের মেঝে আর দেওয়ালের দিকে দেখাল মধুসূদন।

মিহিরদা তাকিয়ে দেখলেন।

ঘরের মেঝেতে, দেওয়ালে—নানা জায়গায় অল্পবিস্তর ওই সবুজ শ্যাওলার ছিটে।

সারা ঘরময় এরকম সবুজ আঠা ছড়িয়েছে কে? সে-কথাই জিগ্যেস করলেন মধুসূদনকে।

মধুসূদন কোনও জবাব না দিয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ, পায়ে 'ঠক' শব্দ তুলে এক পা পিছিয়ে গেল।

লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না মিহিরদা। এ-অঞ্চলে কুসংস্কারের চল আছে—থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেসব মেনে নিয়েও তো ব্যাপারগুলোকে মেলানো যাচ্ছে না! তা ছাড়া, 'এখন ভয়ের সময়...' কথাটারই-বা মানে কী!

জানলার বাইরে খসখস শব্দটা ক্রমেই বাড়ছিল।

মধুসূদন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সেদিকে। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'বাবু, আপনি তাড়াতাড়ি করুন।'

ঠিক তখনই হালকাভাবে শিস দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন মিহিরদা। জানলার বাইরে থেকেই শব্দটা আসছে বলে মনে হল।

না, মানুষের শিসের শব্দ নয়। আরও মিহি, আরও তীক্ষ্ণ।

শব্দটা শুনেই মধুসূদন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল জানলার কাছে। জানলার গরাদের ফাঁকে মুখ লাগিয়ে বাইরের অন্ধকারে কিছু একটা খুঁজতে লাগল।

মিহিরদা দমবন্ধ করে মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকার জানলার চৌকো পটভূমিতে মধুসূদনের সাদা ধবধবে চুল কেমন যেন অলৌকিক মনে হচ্ছিল।

হঠাৎই মধুসূদন জানলার কাছ থেকে ছিটকে কয়েক হাত পিছিয়ে এল। চাপা গলায় ছড়া কেটে বলতে লাগল :

'বুধপুরের বুদ্ধেশ্বর,
আনাড়ার বাণেশ্বর
চিড়কার গৌরীনাথ,
বলরামপুরের বুড়াবাবা
পেহেল পেহেল পেহেল।'

কথাগুলোর মানে পুরোপুরি আঁচ করতে না পারলেও মিহিরদা বুঝলেন, ব্যাপারটা শিবের মন্ত্রগোছের কিছু। 'গৌরীনাথ' আর 'বাণেশ্বর' শব্দদুটোই ওঁকে সে-ইঙ্গিত দিল।

মধুসূদন ছড়াটা সবে আড়াইবার কেটেছে, ঠিক তখনই কী যেন একটা ওকে এক ঝটকায় সাপটে ধরল। তারপর কী এক অলৌকিক টান মধুকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে আছড়ে ফেলল জানলার ওপরে—যেন কেউ হাত বাড়িয়ে মধুসূদনকে এক হ্যাঁচকায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে জানলার গরাদের বাইরে।

মধুসূদন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। মিহিরদাও ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

খসখস আওয়াজটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল, আর খানিকটা পালটেও যাচ্ছিল—যেন কেউ শুকনো গাছের পাতা কড়মড় করে চিবোচ্ছে। আর তার সঙ্গে হালকা শিসের শব্দ।

ঘরের সিলিং-এ ঝোলানো বাল্‌বটা আরও জোরে দুলতে শুরু করল।

মধু প্রচণ্ড চেষ্টায় জানলার কাছ থেকে সরে আসার চেষ্টা করতে লাগল। আর একইসঙ্গে বিড়বিড় করে কী সব আওড়াতে লাগল—তার একটি বর্ণও মিহিরদা বুঝে উঠতে পারলেন না।

অদ্ভুত এক লড়াই করে শেষ পর্যন্ত শক্ত মানুষটা জিতে গেল। জানলার

কাছ থেকে ও ঠিকরে পড়ল মেঝেতে। ওর চশমা ছিটকে গেল দূরে।

কিন্তু মধুসূদন অবিশ্বাস্য এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হাঁপাতে-হাঁপাতে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না।

আবার শুরু হয়ে গেল মরণপণ টানাপোড়েনের লড়াই। সেইসঙ্গে শিসের শব্দ।

কিন্তু কার সঙ্গে লড়ছে মধুসূদন! মিহিরদা কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎই মুখে একটা বিচিত্র শব্দ করে শূন্যে ডিগবাজি ঝাঁপ দিল মধু। ছৌ নাচ যারা নাচে তাদের এরকম শূন্যে ডিগবাজি খেতে দেখেছেন মিহিরদা। তিনি অবাক চোখে পাথর হয়ে তাকিয়ে ছিলেন মধুসূদনের দিকে। যেন দর্শকের আসনে বসে মঞ্চের ওপরে কোনও নৃত্যনাট্য দেখছেন।

মিহিরদার সারা মুখে ঘাম। ভেজা সপসপে প্যান্ট বরফ-ঠান্ডা হয়ে পায়ে লেপটে আছে। আর নাম-না-জানা এক ভয় বুকের ভেতরটায় অস্থিরভাবে ছটফট করছে।

মধুসূদন তখন ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছিল। মুখে অর্থহীন শব্দ টগবগ করে ফুটছে। ও শিকারি চিতার ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিয়ে জানলার দিকে একবার এগোচ্ছিল, আর-একবার পিছিয়ে আসছিল।

ঘড়ির কাঁটার হিসেবে পুরো ব্যাপারটা চলেছে বোধহয় কয়েকমিনিট, তবে মিহিরদার মনে হচ্ছিল সময় আর চলছে না। এই ছায়াযুদ্ধের যেন শেষ নেই।

একসময় সব শান্ত হল। শিসের শব্দ থেমে গেল। খসখস শব্দটা ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল।

চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল মধুসূদন। ও হাপরের মতো শ্বাস টানছিল। চশমা চোখে দিয়ে জামাকাপড় ঠিকঠাক করতে-করতে বলল, 'কেউ আমার আর ক্ষেতি করতে পারবেনিকো। পাঁচবছর আগে আমাকে নিতে গিয়ে শুধু আমার ডান পা খেয়েছে। আর আমার কোনও ডর নেইকো। একবার অঙ্গহানি হয়ে কোনওরকমে বেঁচে গেলে তাকে আর সে কিছু করতে পারে না। তবে আপনার ভয় আছে...।'

'কীসের ভয়, মধুসূদন?' মিহিরদার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল।

'শ্-শ্-শ...' ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে মিহিরদাকে চুপ করতে ইশারা করল মধু। তারপর বড়-বড় শ্বাস ফেলে বলল, 'আপনি বডি নিয়ে এক্ষুনি রওনা হয়ে যান। তবে আপনার টেলিফোন নম্বরটা আমায় দিয়ে যাবেন। কাউকে সে-কথা বলার দরকার নেইকো। একটা জিনিস আমি পেয়েছি—পরে আপনাকে খবর দেব।'

'কী পেয়েছ?'

'চুপ।' আবার ঠোঁটে আঙুল ঃ 'কানাকানি হয়ে জানাজানি হয়ে যাবে। তখন

সর্বনাশ কেউ আর রুখতে পারবেনিকো।’

মিহিরদার মাথা কাজ করছিল না। সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যা দেখছেন, যা শুনছেন, এসব সত্যি নয়। যেন কোনও আজগুবি সিনেমা।

কিন্তু বিছানায় পড়ে থাকা সুরঞ্জন মজুমদারের বীভৎস মৃতদেহটা তো আজগুবি নয়!

তা হলে কি সুরঞ্জন জটিল কোনও ঘটনার পাকে জড়িয়ে পড়েছিল?

মধুসূদন মিলিটারি ব্যস্ততা শুরু করে দিল। মিহিরদাকে পাশ কাটিয়ে ও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘরে একা হয়ে যেতেই একটা ভয়ের ঝাপটা মিহিরদাকে কাঁপিয়ে দিল। তিনি তাড়াতাড়ি চলে এলেন ঘরের বাইরে।

একটু পরেই কোথা থেকে একটা জং-ধরা লোহার বালতি নিয়ে এল মধুসূদন। মিহিরদাকে বলল, ‘আসুন, বাবু—হাত লাগান।’

ওঁরা দুজনে ঘরে ঢুকলেন।

তারপর মিহিরদা পলিথিন জড়িয়ে সুরঞ্জন মজুমদারের মাথার দিকটা তুলে ধরে রইলেন। আর মধু কাজ করে চলল। বেশ কসরত করে ও বিছানার পলিথিন থেকে বরফ আর জল যতটা সম্ভব ঢেলে নিল বালতিতে।

মিহিরদার গা শিরশির করছিল। তাই মনের সমস্ত জেদ একজায়গায় জড়ো করে সুরঞ্জনের দেহটা ধরে রইলেন। বারবার মনে হতে লাগল, এই বুঝি কালো লোমশ পোকাটা বেরিয়ে আসবে নাকের ফুটো দিয়ে।

মিহিরদা মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন ঘরের দেওয়ালের দিকে। কিছুতেই তিনি একটু আগের ঘটনাগুলোকে মনে ঠাঁই দিতে চান না। সবকিছু তিনি ভুলে যেতে চান। এক্ষুনি।

বরফ আর জল পরিষ্কার করার পর পলিথিনসমেত ডেডবডিটা বাইরের বারান্দায় নিয়ে এলেন ওঁরা দুজনে।

মধুসূদন বলল, ‘আপনি একটু এখানে থাকুন। আমি নীচে গিয়ে মালিককে বলে লোকজন ডাকি—একটা সাইকেল ভ্যান-ট্যানের ব্যবস্থা করি—।’

একা এই ঘরে থাকতে হবে ভেবে মিহিরদা যেন আঁতকে উঠলেন ঃ ‘না, না। চলো, আমিও নীচে যাচ্ছি। ওসব সাইকেল ভ্যান-ট্যান নয়—একটা জিপ-টিপ কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে।’

মধু ঠোঁট কামড়ে একলহমা কী ভাবল। তারপর চাপা গলায় বলল, ‘দিন, আপনার টেলিফোন নম্বরটা দিন।’

মিহিরদা মেঝেতে নামানো ট্র্যাভেল ব্যাগের সাইড-চেম্বারের চেন খুললেন। নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে মধুসূদনের হাতে দিলেন।

ও কোনও কথা না বলে কার্ডটা কোমরে গুঁজে ফেলল। তারপর বলল, 'আপনি তা হলে নীচে যান—মালিকের সঙ্গে কথা বলুন—আমি এখানে আছি।'

ঠিক এমনসময় ছ'নম্বর ঘরের দরজা খুলে রোগা মতন একজন লোক বেরিয়ে এল। গায়ে দু-তিনটে ফুটোয়ালা স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি।

ঘর থেকে বেরিয়েই তার চোখ গেল মেঝেতে শুয়ে থাকা কাঠ-কাঠ মৃতদেহটার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে হেঁচকি তোলার মতো একটা আওয়াজ করে সে আবার ঘরে ঢুকে গেল। তারপরই দরজা বেশ জোরে বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল।

মিহিরদার অবাক লাগল।

এতক্ষণ এই ঘর থেকে শব্দ-টব্দ কিছু কম হয়নি। চিৎকার কিংবা শিসের শব্দও নিশ্চয়ই শোনা গেছে। অথচ ছ'নম্বর ঘর থেকে কেউ বেরোয়নি। কিন্তু এখন...।

মিহিরদা মনে-মনে ভাবলেন ঃ দরজা বন্ধ করলেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! ঘরের জানলা দিয়েও তো ভয় ঢুকে পড়তে পারে! আবার দরজা-জানলা বন্ধ করেও হয়তো রেহাই পাওয়া যায় না। কে জানে!

মিহিরদা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।

কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যে ব্যবস্থা হল, তা নয়। মোটামুটি আড়াই ঘণ্টা লাগল।

মালিকের হাতে হিসেবমতো টাকা তুলে দিতেই ভদ্রলোক নির্বিকার মুখে প্রায় রোবটের মতো একের-পর-এক কাজ করে চলল। হোটেলের টেলিফোন থেকে বাঘমুন্ডি থানায় ফোন করে বড়বাবুকে খবর দিল।

মিহিরদা নিজের পরিচয় দিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। ব্যাপারটা ভুলে থাকার জন্যে বড়বাবুর সঙ্গে দু-হাজার টাকায় রফা হল।

তিনি বললেন, 'ডেথ সার্টিফিকেট আর পুলিশি কাগজপত্র আমি তৈরি করে ''পথিক''-এ পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি ডেডবডির নাম, বয়েস, ঠিকানা এসব চটপট বলুন...।'

ডেডবডির নাম, বয়েস, ঠিকানা? মিহিরদার ভেতরে একটা অদ্ভুত তোলপাড় শুরু হল। একটু সময় নিয়ে তিনি একে-একে সব বললেন।

বড়বাবু বোধহয় ও-প্রান্তে সবকিছু টুকে নিচ্ছিলেন। টোকা হয়ে গেলে তথ্যগুলো মিহিরদাকে আবার পড়ে শোনালেন।

মিহিরদা যখন বললেন, সব ঠিক আছে, তখন বড়বাবু হেসে বললেন, 'পয়সা নিচ্ছি, কেসটা ঠিকঠাক সাজাতে হবে তো!' আবার হাসি। তারপর তিনি বললেন,

টাকাটা সুখেন্দু পালের হাতে দিয়ে দিন, আমি পেয়ে যাব। আর আপনার কাগজ আধঘণ্টার মধ্যে "পথিক"-এ পৌঁছে যাবে।'

'সুখেন্দু পাল কে?' মিহিরদা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

ও-প্রান্তে ভারী গলায় হাসি শোনা গেল। তারপর ঃ 'তাও জানেন না! "পথিক"-এর মালিক। টাকাটা ওর কাছে দিয়ে দিন।'

মিহিরদা হোটেলের মালিকের দিকে চোখ ফেরালেন।

সুখেন্দু পাল হাসল। আঙুলের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটে উদোম টান দিয়ে শিরা-ওঠা ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল মিহিরদার দিকে।

মিহিরদা রিসিভার নামিয়ে রেখে টাকাটা মিটিয়ে দিলেন।

ওপর থেকে মধুসূদনকে ডেকে দুটো বরফের চাঁই কেনার টাকা দিয়ে সুখেন্দু পাল কীসব বলে রওনা করিয়ে দিয়েছিল। একটু পরেই ও জিপে করে দুটো বরফের চাঁই নিয়ে এসে হাজির হল। আর বড়বাবুর পাঠানো কাগজপত্রও এসে পড়ল আধঘণ্টার মধ্যেই।

সুরঞ্জনের দেহটা দোতলা থেকে নামিয়ে অনেক কসরত করে জিপের পেছনে তেরছাভাবে শোয়ানো হল।

প্রথমে পলিথিনের চাদর পাতা হল। তার ওপরে বেশ পুরু করে ছড়িয়ে দেওয়া হল বরফের টুকরো। তারপর সুরঞ্জনের দেহটা রেখে আবার বরফের চাঁই চাপা দেওয়া হল। সবশেষে পলিথিনের চাদর ঢাকা দিয়ে নাইলনের দড়ি দিয়ে দেহটা বাঁধা হল।

সুখেন্দু হোটেলের দরজার কাছে বেরিয়ে এসেছিল। মিহিরদা আর মধুর কাজ শেষ হতেই একগাল হেসে মিহিরদাকে বলল, 'আবার আসবেন কিন্তু। আমার সাইড থেকে ফুল রিসেপশন পাবেন। আমার হোটেলটা খারাপ নয়। এখানে থাকলে কোনও ভয় নেই...।'

মিহিরদা জিপে উঠতে গিয়েও থমকে গেলেন। অবাক চোখে সুখেন্দুকে দেখলেন। লোকটাকে নেহাতই নির্লজ্জ অর্থপিশাচ বলে মনে হল। কিন্তু মিহিরদা অর্থপিশাচকে ভয় পান না—পিশাচকে ভয় পান—যদি পিশাচ বলে সত্যি কিছু থেকে থাকে।

বাইরের অন্ধকারে আবছাভাবে কয়েকটা গাছপালা দেখা যাচ্ছিল—তার ফাঁক দিয়ে চাঁদ। যে-চাঁদ দেখে অন্য সময় মনে কবিতা জেগে ওঠে এখন সেই চাঁদ দেখে মিহিরদা চকিতে কেঁপে উঠলেন।

আজ পূর্ণিমা নাকি?

পূর্ণিমা যদি না-ও হয় তা হলে বলতে হবে পূর্ণিমার খুব কাছাকাছি।

ঝিঁঝিঁপোকার কান্না শোনা যাচ্ছিল। গভীর অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে।

সামনের পথ দিয়ে টিমটিমে আলো জ্বেলে সাইকেল চালিয়ে কে একজন চলে গেল।

মিহিরদা সুখেন্দুকে বললেন, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। চলি...দরকার হলে আপনাকে ফোন করব।'

'অবশ্যই, অবশ্যই...তবে আপনি মধুকে সঙ্গে নিয়ে যান। পথে বিপদ-আপদ হলে ও ঠেকাবে।'

কথাটা শুনেই মিহিরদার কেমন খটকা লাগল।

মধুসূদন হোটেলের সদর দরজার একপাশে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে লক্ষ করে সুখেন্দু পাল বলল, 'বাবুর সঙ্গে তুমিও উঠে পড়ো, মধু। নিশ্চিন্দি পথ দিয়ে বাবুকে নিয়ে যেয়ো।'

মধুসূদন কোনও কথা না বলে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। মিহিরদা জিপের পেছনের সিটে বসলেন। সুরঞ্জনের পলিথিন-মোড়া দেহে যাতে পা না লাগে সেজন্যে অনেকটা কাত হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে থিতু হলেন। ড্রাইভারের পেছনে বসে পা-দুটো কোনওরকমে সুরঞ্জন মজুমদারকে ডিঙিয়ে উলটোদিকের সিটে পৌঁছে দিলেন।

মিহিরদা মনে-মনে ঠিক করলেন, বলরামপুর টাউনে পৌঁছে সেখান থেকে সুরঞ্জনের বাড়িতে ফোন করে সব খবর জানাবেন।

জিপ স্টার্ট নিল। কেন জানি না, মিহিরদা বিড়বিড় করে প্রায় নিঃশব্দে উচ্চারণ করলেন ঃ 'দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।'

জিপ খানিকটা এগোতেই মধুসূদনকে কী একটা বলার জন্যে মিহিরদা কথা শুরু করতে গেলেন।

কিন্তু মধুসূদন ঠোঁটের ওপরে আঙুল রেখে মিহিরদাকে চুপ করতে ইশারা করল।

মিহিরদা সঙ্গে-সঙ্গে চুপ করে গেলেন।

॥ চার ॥

হু-হু বাতাসে মিহিরদার চুল উড়ছিল। জিপের সামনের রাস্তায় হেডলাইটের জোরালো আলো পিছলে যাচ্ছিল। ঝিঁঝিঁপোকার ডাক তখনও কানে আসছে। চাঁদের আলো দুপাশের গাছপালার কোথাও-কোথাও ঠিকরে পড়ে গাছের পাতায় রাংতা

মুড়ে দিয়েছে।

একটু পরেই গাছপালা শেষ হয়ে রুক্ষ প্রান্তর দেখা দিল। চাঁদের আলোয় দৃশ্যটাকে বেশ মোলায়েম দেখাচ্ছিল। কোথাও-কোথাও ছোট জলা চোখে পড়ল। জলা যে সেটা টের পাওয়া গেল চাঁদের টলটলে ছবি দেখে।

মধুসূদন ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের ভয় এখনও কাটেনি, বাবু।'

'কেন?' মিহিরদার গলাও কেমন খাদে নেমে এল।

'কান পেতে শুনুন—কিছু শুনতে পাচ্ছেন?'

মিহিরদা কান পেতে শুনলেন।

হ্যাঁ—স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে শব্দটা : হালকা শিসের শব্দ।

আশ্চর্য! জিপ প্রচণ্ড বেগে ছুটলেও শব্দটা মোটেই মিলিয়ে যাচ্ছে না।

মিহিরদা অবাক হয়ে কী-একটা মধুসূদনকে বলতে যাবেন, ওঁকে থামিয়ে দিয়ে মধুসূদন চাপা ফিসফিসে গলায় বলে উঠল, 'অপদেবতা আমাদের পিছু নিয়েছে, বাবু।'

'অপদেবতা! কী বলছ তুমি!' মিহিরদা চাপা গলায় বলে উঠলেন। সেইসঙ্গে খানিকটা যেন অবাকও হলেন। প্রথমটায় শিসের শব্দটাকে তিনি কোনও রাতপাখির শিস বলে ভুল করেছিলেন। ভুল এই কারণেই যে, রাতপাখি কখনও জিপ তাড়া করে ছুটে আসতে পারে না।

তা হলে কি মধুসূদনের কথামতো কোনও অপদেবতা জিপ তাড়া করে ধেয়ে আসছে?

অপদেবতায় মিহিরদার তেমন বিশ্বাস নেই, বরং দেবতায় আছে। কিন্তু কোনও দেবতা এরকম শিস দেন বলে মিহিরদা শোনেননি। তা হলে কি সত্যি-সত্যি কোনও অপদেবতা তাঁদের পিছু নিয়েছে? এইভাবে পিছু নেওয়ার কারণ কী?

সে-কথাই জিগ্যেস করলেন মধুসূদনকে।

মধুসূদন অস্পষ্টভাবে বলল, 'মুখের গেরাস কেড়ে নিলে অপদেবতা চটে যায় জানেন না! তাই রাগে ফুঁসছে...ধাওয়া করছে...এলাকা না পেরোলি থামবে নাকো।'

কয়েক লহমা চুপ থাকার পর মধু জিপের পাইলটকে বলল, 'আর-একটু জোরে চালাতে পারো?'

অ্যাক্সিলারেটরে চাপ পড়ল, ইঞ্জিনের গর্জন গাঢ় হল। রাস্তা আরও জোরে ছুটতে লাগল পেছনদিকে।

দিনের বেলার ঝাঁ-ঝাঁ গরমের তাপ উঠে আসছিল মাটি থেকে। ছুটে আসা বাতাস সেই কুসুম-কুসুম উষ্ণতা মিহিরদার চোখেমুখে বুলিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎই তার সঙ্গে কী করে যেন মিশে গেল হিমবাতাস। উষ্ণতার মাঝে সেই সূক্ষ্ম অথচ অসংখ্য হিমশীতল স্রোত মিহিরদার কেমন অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল।

মিহিরদা কাঠ হয়ে বসেছিলেন। চোখ রেখেছিলেন সামনের রাস্তার দিকে। আর কান শুনতে পাচ্ছিল বাতাস কেটে ছুটে আসা শিসের শব্দ।

কতক্ষণে এই এলাকা পেরোতে পারবেন তাঁরা? আর এলাকা মানে...কীসের এলাকা?

মধুসূদনকে সে-কথা জিগ্যেস করতে যাবেন, দেখলেন, কালো রোগা লড়াকু মানুষটা বিড়বিড় করে সুর কেটে কী যেন বলছে—বলেই চলেছে।

ভালো করে কান পাততেই শুনতে পেলেন কথাগুলো ঃ

'আরাবন্দি মায়াবন্দি সগ্‌গে পাতালে ব্রহ্মাবন্দি
ফলন্তি নজরবন্দি, ফলন্তি মুখবন্দি।
এক খাড় চৌবাশি বাপ, মা ভবানী মড্ডাপান।
কে গা বাঁধে? গুরুর আজ্ঞায় আমি বাঁধি।'

তার পরেও আরও কীসব বলে চলল মধুসূদন, কিন্তু মিহিরদা স্পষ্ট করে আর কিছু শুনতে পেলেন না।

মিহিরদা ড্রাইভারকে বলেছিলেন বলরামপুরের রেল স্টেশনে পৌঁছে দিতে। স্টেশনের নাম অবশ্য বরাভূম। ঠিক আমাদের কলকাতার মতন—শহরের সবচেয়ে বড় স্টেশনের নাম শেয়ালদা।

সড়কপথে বরাভূম পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেন। ট্রেনে করে এই ডেডবডি নিয়ে...যদি অবশ্য তক্ষুনি ট্রেন পাওয়া যায়।

জিপের মেঝেতে পড়ে থাকা বড়সড় পুঁটলিটার দিকে চোখ গেল মিহিরদার। বরফ ক্রমশ গলে যাওয়ায় দড়ির বাঁধন ঢিলে হয়ে এসেছে। তা ছাড়া, এবড়ো-খেবড়ো কাঁচা রাস্তায় ছুটে চলা জিপের ঝাঁকুনিও কিছু কম নয়। তাই পুঁটলিটা যেভাবে গুছিয়ে বাঁধা হয়েছিল সেরকম আর নেই। এটাকে আগলে সামলে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যাবে তো!

মিহিরদার ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছেন। যে-কোনও সময় ঘুম ভেঙে দেখবেন, স্বপ্নটা আর নেই। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আর ভাঙছিল না—স্বপ্নটাও শেষ হচ্ছিল না কিছুতেই। সুখেন্দু পালের কথাটা মনে পড়ছিল আবার ঃ এখানে অনেক পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়—সবকিছুর মানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

না, মানে খুঁজতে মিহিরদা চাইছেন না আর। শুধু নিরাপদে কলকাতা পৌঁছতে পারলে তিনি বেঁচে যান। এটা শুধু কথার কথা নয়—আক্ষরিক অর্থেই সত্যি।

সুরঞ্জনকে ঘিরে বহু কথা মনে পড়ছিল। একটা মানুষ 'আছে' থেকে হঠাৎ 'নেই' হয়ে গেলে তার কাছাকাছি মানুষজন—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব—এক অদ্ভুত ধাক্কা খায়। আর তারপরই ঘটে যায় আশ্চর্য ঘটনা। মরা মানুষটাকে নিয়ে যেসব স্মৃতি একেবারে হারিয়েই গিয়েছিল, মনের অতলে একরকম ডুবেই গিয়েছিল বলা যায়, সেগুলো ভুস করে আচমকা ভেসে ওঠে—সিনেমা হয়ে চলতে থাকে চোখের সামনে।

সেরকমই একটা সিনেমা দেখতে শুরু করলেন মিহিরদা।

সুরঞ্জন মজুমদারকে ঘিরে নানান স্মৃতির পাঁচালি দেখতে-দেখতে তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। আনমনাভাবে পকেটে হাত চালান করে বের করে নিলেন সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলেন। তখনই টের পেলেন হাত কাঁপছে, ঠোঁটও কাঁপছে। কয়েকবারের চেষ্টায় লাইটার জ্বাললেন। সিগারেটটা ধরাতে-ধরাতেই কোথা থেকে যেন হিমবাতাসের স্রোত ছিটকে এল লাইটারের শিখার দিকে—ছোবল মারল চন্দ্রবোড়ার ক্ষিপ্রতায়। লাইটারের শিখা নিভে গেল। মিহিরদার লাইটার ধরা হাত সেই অদৃশ্য বরফ-বাতাসের ছোঁওয়া টের পেল।

কোথা থেকে এল এই বাতাস?

হাত কেঁপে গেল মিহিরদার। স্মৃতির সিনেমা উধাও হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। তাড়াতাড়ি লাইটার আর সিগারেটের প্যাকেট ঢুকিয়ে দিলেন পকেটে। সিগারেটে টান দিয়ে কাশলেন দুবার। সিগারেট খাওয়া ডাক্তারের বারণ। বহুবার ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি। বাড়িতেও এ নিয়ে অশান্তি কিছু কম হয়নি। তাই শেষপর্যন্ত একটা রফায় পৌঁছেছেন মিহিরদা ঃ খুব প্রয়োজন না হলে সিগারেট ধরান না। কারণ, তিনি জানেন, তাঁর কাশির ধাতটা ভালো নয়। সিগারেট সেটাকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

প্রচণ্ড টেনশান কমাতে সিগারেটে পরপর কয়েকবার টান দিলেন মিহিরদা।

লক্ষ করলেন, মধুসূদন একবার পাশ ফিরে তাঁকে দেখল। মিহিরদা যেন অনুভব করলেন, মধু ঠোঁট নাড়ছে, বিড়বিড় করছে। অথচ তিনি ওর ঠোঁট নাড়া দেখতে পাননি, বিড়বিড় করে উচ্চারণ করা কোনও শব্দও শুনতে পাননি।

শুনতে যেটা পাচ্ছিলেন সেটা শিসের শব্দ।

প্রথম দিকটায় শিসগুলো ছিল ছোট-ছোট মাপের, কাটা-কাটা—ঝাঁকুনি দেওয়া সেই অদ্ভুত সুরের মধ্যে কেমন একটা উল্লাসের ভাব ছিল কিন্তু এখন? এখন শিসের ঢংটা বদলে গেছে। এখন টানা-টানা, লম্বা-লম্বা দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনাচ্ছে। তীব্রভাবে শুরু হয়ে বিলাপের আর্তির মতো স্তিমিত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে যেন ফুটে উঠছে আক্ষেপ আর হতাশা।

মিহিরদার মনে বহু প্রশ্ন জাগছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, মধুসূদন সেসব প্রশ্নের অনেকগুলোরই উত্তর জানে। সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া গেছে মধুসূদনের কথাতেই ঃ 'জানি অনেক কিছু, কিন্তু এখন কিছু বলতে পারব নাকো। এখন ভয়ের সময়...।'

ভয়ের সময় বলতে, ভয় দেখানোর সময়...নাকি ভয় পাওয়ার সময়?

জিপ ছুটছে তো ছুটছেই। মিহিরদা জানেন, বলরামপুর ঘণ্টাখানেক-ঘণ্টাদেড়েকের পথ। কিন্তু এই পথ কি আর শেষ হবে না? মিহিরদার হাতের সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। জ্বলন্ত টুকরোটা তিনি জানলা দিয়ে ছুড়ে দিলেন বাইরে।

হঠাৎই দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু দেখা গেল। মধু ওর সিটে নড়েচড়ে বসল, বলল, 'এসে গেছি...।' তারপর শব্দ করে একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

'কোথায় এসে গেছি, মধু?'

'এলাকার বাইরে, বাবু।'

'এলাকা মানে? কার এলাকা?' একটু আগেও কথাটা বলেছে মধুসূদন, কিন্তু রহস্যটা খোলসা করেনি।

মধুসূদন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মিহিরদার দিকে। ওর চশমার কাচ আবছাভাবে ঝিকিয়ে উঠল। তারপর ঘষা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'কীসের এলাকা আবার! ভয়ের এলাকা।'

মিহিরদা আর কোনও জবাব দিলেন না। তবে ঠিক সেই মুহূর্তেই খেয়াল করলেন, শিসের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

মিহিরদার বুকের ভেতরে একটা চাপ হালকা হয়ে গেল পলকে। তখনই বুঝতে পারলেন, এতক্ষণ কেমন একটা রুদ্ধশ্বাস চাপ তাঁকে ভেতর থেকে কাবু করে দিয়েছিল।

'সামনের ওই বাঁকের মুখটায় আমি নেমে যাব।' ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল মধুসূদন, 'ওই মন্দিরের কাছটায় গাড়িটা একটু দাঁড়া করাতে হবে...।'

মন্দির! কোথায় মন্দির? মিহিরদা জিপের উইন্ডস্ক্রিনের পরদা ডিঙিয়ে মন্দিরটা খুঁজতে লাগলেন।

যখন মন্দিরটা চোখে পড়ল, তখন গাড়ি তার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে।

কাঁচা সড়কের দু-পাশে গুটিতিনেক দোকান। আলো বলতে কেরোসিন-কুপি অথবা মোমবাতি। এত রাতে কোনও দোকানেই কোনও খদ্দের নেই। দু-চারজন কাঠের বেঞ্চিতে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। হয়তো দিনের গরমের উপশম করতে রাতের ঠান্ডা প্রলেপ বেশিক্ষণ ধরে গায়ে মাখতে চাইছে।

জটলা করা লোকগুলোর কাছাকাছি কয়েকটা সাইকেল দাঁড় করানো রয়েছে। হয়তো সাইকেল-দূরত্বেই কোনও গ্রাম আছে। একটু পরে ওরা সেখানেই ফিরে যাবে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মধুসূদন। অনেক কষ্টে, সুরঞ্জন মজুমদারের দেহ বাঁচিয়ে পা ফেলে, মিহিরদাও নামার জন্যে এগোলেন। বরফ-গলা জলে পা পড়ায় তাঁর কাবলি-চটি খানিকটা ভিজে গেল। জিপের লোহার পাদানি থেকে তিনি লাফিয়ে নেমে এলেন ধুলো-মাখা রাস্তায়। তারপর হাত লম্বা করে ট্রাভেল ব্যাগের সাইড-চেম্বার থেকে একটা ছোট টর্চ বের করে নিলেন।

রাস্তা থেকে খানিকটা দূর পর্যন্ত অল্পস্বল্প আগাছা আর ঝোপঝাড়। তারপরই শুরু হয়েছে বড়-বড় গাছপালা। অন্ধকারে তাদের চেনা না গেলেও আন্দাজ করা যায়। কারণ, এখানে আসার পথে মিহিরদা গাছপালার ধরন নজর করেছিলেন। বেশিরভাগই শাল, মহুয়া, কেঁদ, পলাশ আর গলগলি। কয়েক সারি বড় গাছপালা শেষ হতেই আবার ধূ-ধূ প্রান্তর।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। এখন খানিকটা ওপরে উঠে পড়েছে। আর কোথা থেকে যেন একপ্রস্থ মেঘ শিল্পীর তুলির টানের মতো চাঁদের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে—একটা গোটা চাঁদকে অনায়াসে দু-টুকরো করে দিয়েছে।

কাঠের পা টেনে-টেনে রাস্তার একপাশে দাঁড়ানো মন্দিরটার কাছে গিয়ে থামল মধুসূদন। মিহিরদা টর্চের আলোয় পথ খুঁজে নিয়ে মধুর পিছু নিলেন।

জিনিসটা ঠিক মন্দির নয়, বরং বলা যেতে পারে মন্দিরের আদলে গড়া ফুটপাঁচেক উচ্চতার একটা কাঠামো—মাটি দিয়ে লেপা, আর তার গায়ে রঙিন নকশা আঁকা। পথের ধারে গজিয়ে ওঠা শনিমন্দিরের সঙ্গে তার খুব একটা তফাত নেই।

মিহিরদা মধুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মধু বলল, 'খুব জাগ্রত দেবতা, বাবু। উনি একবার আশীর্বাদ করলে আপনাকে-আমাকে মরণ আর ছুঁতে পারবেনিকো...।'

মিহিরদার ভুরু কুঁচকে গেল। মন্দিরের মুখটা বেশ ছোট। ভেতরে একটা টিমটিমে প্রদীপ জ্বলছে। ফলে দেবতার মূর্তিটা তেমন স্পষ্ট নয়। তাই খানিক চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি সরাসরি জানতে চাইলেন, 'কীসের মন্দির এটা, মধু?'

মিহিরদার দিকে ফিরে তাকাল মধুসূদন। ওর ভাঁজ-পড়া মুখে চাঁদের আলো পড়ে রহস্যময় দেখাল।

ও বলল, 'যমরাজার মন্দির, বাবু।'

যমরাজার মন্দির! যমের কোনও মন্দির হয় বলে মিহিরদা কখনও শোনেননি। মধুর কথায় অদ্ভুত এক কৌতূহল হল তাঁর। মাথা ঝুঁকিয়ে দেবতার মুখটি দেখার চেষ্টা করলেন।

ঘোর সবুজবর্ণের মুখ ও গলা। চোখদুটি বড়-বড়, পটের ছবির মতন। মাথায় ছোট সোনালি মুকুট, কানে মাকড়ি, কানের পেছন দিয়ে বাবরি চুলের ঢল নেমেছে কাঁধ পর্যন্ত। আর ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল।

দেবতার এই মূর্তি দেখে ভক্তির চেয়ে ভয় জাগে বেশি। অন্তত মিহিরদার তাই মনে হল। মূর্তির পরনে কী ধরনের বস্ত্র তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কারণ, যমরাজার দেহটি ছোট-বড় ফুলের মালা ও একটুকরো সাদা থানে ঢাকা। সেই থানের একপাশ থেকে যমের বাহন মহিষের কুচকুচে কালো মাথা ও সামনের পা-দুটি দেখা যাচ্ছে। মূর্তির পায়ের কাছে রাখা প্রদীপের আলোয় মন্দিরের দেওয়ালে বেশ বড়-সড় বিকৃত ছায়া পড়েছে। প্রদীপকে ঘিরে অসংখ্য পুরোনো-নতুন কুচোফুল—বহুদিন পরিষ্কার না করায় জমে-জমে স্তূপ হয়ে গেছে।

মধুসূদন বিড়বিড় করে বলতে লাগল ঃ

'রবির পুত্র যমরাজা যম নাম ধরে
বিনা অপরাধে যম কারু দণ্ড নাহি করে।
চিত্রগুপ্ত মহুরী তার দিবারাত্র লেখে
যার যেমন কপালের লিখন বিধাতা লিখেছে।
ভালো লোক হলে দেখুন কৃষ্ণদূতে যায়
মন্দলোক হলে যমদূত সদ্য যান।
কেউ ধরে চুলের মুষ্টি...'

শুনতে-শুনতে মিহিরদা কেমন আনমনা হয়ে গেলেন। জিপে পড়ে থাকা সুরঞ্জন মজুমদারের কথা মনে পড়ছিল বারবার। জন্মান্তর নিয়ে সেনসেশ্যনাল স্টোরি করতে এসেছিল সুরঞ্জন। সেই কাজ অসমাপ্ত থেকে গেল। আর কী করে যেন আর-এক সেনসেশ্যনাল স্টোরির মধ্যে মিহিরদা জড়িয়ে গেলেন!

এর শেষ কোথায়? কত গভীরে লুকিয়ে আছে এই জটিল রহস্যের কুটিল ব্যাখ্যা?

মধুসূদন বিড়বিড় করে ওর পাঁচালি পড়ছিল—যদিও কথাগুলো বেশ অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল—অর্থ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না...শুধু কেমন একটা অদ্ভুত আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে ওই মন্ত্রপড়াগোছের ব্যাপারটা মিহিরদাকে কেমন যেন ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল।

যমের মন্দির, যমের পুজো—এসব মিহিরদা কখনও না শুনলেও এটা জানেন যে, যম সূর্যদেবতার পুত্র—যম আর শনি দুই ভাই।

মিহিরদার মনের ভেতরে অদ্ভুত একটা দোলাচলের ঢেউ কাজ করছিল। তাঁর চিন্তাভাবনা অবশ হয়ে যেতে চাইছিল বারবার।

দূরে কোথা থেকে একটা রাত-চরা পাখি ডেকে উঠল কর্কশ স্বরে। মিহিরদার গায়ে কাঁটা দিল। মনে হল, এই বুঝি শোনা যাবে সেই অপার্থিব শিসের শব্দ। কিন্তু না...শোনা গেল না। মধুসূদনের কথামতো মিহিরদারা ভয়ের এলাকা পেরিয়ে এসেছেন।

'আসুন, বাবু...।'

মধুর ডাকে মিহিরদার চমক ভাঙল। দেখলেন, কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে মধু জিপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মিহিরদা চলার পথে টর্চের আলো ফেলে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন। পেছন থেকে ডেকে বললেন, 'মধু, বরাভূম স্টেশন আর কত দূর?'

'বড়জোর আধঘণ্টা।' মধুসূদন জবাব দিল, 'আমি আর এগোব না, বাবু। এখান থেকে সাইকেলে ফিরে যাব।'

'সাইকেল! সাইকেল কোথায় পাবে?'

একটু দূরে বসে থাকা মানুষগুলোকে দেখাল মধুসূদন, বলল, 'ওদের কারও সাইকেলে চড়ে চলে যাব, বাবু।'

মিহিরদার মুখে আশঙ্কার আলতো ছায়া বোধহয় ফুটে উঠেছিল। কিন্তু মধুসূদন সেটা কেমন করে ঠাহর করল কে জানে! সে তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'আপনি যান...আপনার আর কোনও ভয় নেই।'

জিপের কাছে এসে মিহিরদা জিগ্যেস করলেন, 'একটা কথার জবাব দেবে, মধু?'

মধুসূদন মুখ তুলে তাকাল মিহিরদার দিকে। ওর হাই-পাওয়ার চশমার কাচে চাঁদ দেখা গেল। আলতো গলায় মধুসূদন বলল, 'কী কথা, বাবু?'

'কীসের ভয়ে তুমি মুখ বুজে আছ? সুখেন্দু পালই-বা কেন বলল, এখানে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার হয়। তুমি...তুমি আসল ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলবে? আসল ঘটনাটা আমি জানতে চাই, মধু।' কী করে মারা গেল সুরঞ্জন মজুমদার?

মরা চাঁদের মতো হাসল মধুসূদন। বিড়বিড় করে কীসব বলল, কপালে হাত ছোঁয়াল। তারপর ঃ 'আপনি আর দেরি করবেন না—রওনা হয়ে যান। রাত বাড়ছে। পরে কখনও সময়-সুযোগ হলে সব বলব।' একটু থেমে কী ভেবে আবার যোগ করল ঃ 'অবশ্য আমিও সবটা জানি না। তবে যেটুকুন জানি সেটুকুনও কিছু কম নয়।'

'তুমি চাঁদমনি গ্রামটা চেনো?' এবার সরাসরি প্রশ্ন করলেন মিহিরদা।

সাংবাদিক মিহির গাঙ্গুলি বেরিয়ে এল তাঁর ভেতর থেকে।

'হ্যাঁ—চিনি। সে-গাঁ ছাড়িয়ে আমরা অনেকটা পথ চলে এসেছি।'

'সে-গ্রামের মলিন সামন্ত নামে কাউকে চেনো? ছোট ছেলে...এই আট-ন' বছর বয়েস হবে...।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল মধুসূদন ঃ 'উঁহু—।'

মিহিরদা বলেই চললেন, '...ছেলেটা নাকি জাতিস্মর। আগের জন্মের সব কথা নাকি ওর মনে আছে...। সুরঞ্জন মজুমদার...আমার এই বন্ধু...' জিপে রাখা মৃতদেহটার দিকে আঙুল দেখালেন মিহিরদা ঃ 'মলিন সামন্তকে নিয়ে খোঁজখবর করতেই এখানে এসেছিল...।'

মধুসূদন যেন চমকে উঠল। তারপরই সামলে নিল নিজেকে। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে থেমে-থেমে বলল, 'এরকম একটা...ছেলের নাম...শুনছিলাম যেন। চাঁদমনি গাঁয়ে...কোন একটা কোম্পানির নাকি অফিসারের ছেলে...।' শেষদিকে মধুসূদনের কথা অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর আচমকাই কথাবার্তায় পূর্ণচ্ছেদ টানার ঢঙে ও বলে উঠল, 'এর চেয়ে বেশি আর কিছু জানি না, বাবু। আমি যাই...।'

মধুসূদন পা বাড়াল।

মিহিরদা ওকে ডেকে বললেন, 'আমাকে ফোন করতে ভুলো না যেন...।'

ও পেছন ফিরে তাকাল ঃ 'অবশ্যই করব। সেই জিনিসটা আপনাকে দিতে হবে না!'

মিহিরদা আর দেরি করলেন না। জিপে উঠে পড়লেন। ড্রাইভারকে বলতেই সে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

টর্চের আলোয় হাতঘড়ি দেখলেন মিহিরদা। প্রায় পৌনে দশটা। স্টেশনে পৌঁছে যদি ট্রেন না পান তা হলে সুরঞ্জনের শরীর আগলে বসে থাকতে হবে। সময় যত গড়াচ্ছিল কাজটা ততই কঠিন বলে মনে হচ্ছিল। সেই ভাবনাটা মন থেকে সরাতে মিহিরদা সুরঞ্জন মজুমদারের কথা ভাবতে শুরু করলেন।

অফুরন্ত প্রাণশক্তি ছিল সুরঞ্জনের। যে-কোনও হতাশ কিংবা কাহিল মানুষকে কী সহজেই না টগবগে করে তুলত। ও বোধহয় ম্যাজিক জানত। একবার 'সুপ্রভাত'-এর চিফ রিপোর্টারের সঙ্গে খটাখটি লাগায় মিহিরদা ঠিকই করেছিলেন চাকরি ছেড়ে দেবেন। স্টাফ ক্যান্টিনে বসে সুরঞ্জনের সঙ্গে সে-বিষয়েই কথা বলছিলেন।

চিফ রিপোর্টার অতুল সরখেল যে লোক সুবিধের নন, সেটা 'সুপ্রভাত'-এর সবাই জানে। কিন্তু লোকটার নিউজ সেন্স আর ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্যাক্ট অসম্ভব ভালো। সেইজন্যেই কাগজের মালিকও ওঁকে ঘাঁটান না। তবে অতুল সরখেলের একটা বদনাম আছে ঃ 'সুপ্রভাত'-কে সামনে রেখে তিনি দারুণ ফায়দা লোটেন।

পলিটিক্যাল লিডারদের কাছ থেকে মোটা টাকা নেন বলেও অফিসে গুজব চালু আছে। মিহিরদার কথা শোনার পর সুরঞ্জন বলেছিল, 'জানি, তুমি অন্য কাগজে এক্ষুনি চাকরি পেয়ে যাবে, তবে, তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু মাথা গরম করে এ-চাকরিটা ছাড়তাম না।'

'কেন?' চায়ে চুমুক দেওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়েছিলেন মিহিরদা।

'প্রথম কথা হচ্ছে, অফিসে সবার বিশ্বাস, অতুল সরখেল কোরাপ্‌টেড। সেই মানুষটার সঙ্গে তোমার লড়াই বেধেছে। এই লড়াইটাকে কোরাপ্‌শনের সঙ্গে তোমার লড়াই বলে ভাবতে হবে, ঠিক আছে?' চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ফিয়ারলেস মজুমদার ঠকাস্ করে কাপটা নামিয়ে দিয়েছিল প্লেটের ওপরে। তারপর ঃ 'তুমি চাকরি ছেড়ে চলে গেলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? না অতুল সরখেল আরও অ্যাডভান্টেজ পাবেন। ওঁর কোরাপ্‌শনের লেভেলটা আরও বেড়ে যাবে। এটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন, গাঙ্গুলি, তোমার মতো সিধে শিরদাঁড়ার মানুষগুলো যদি একটা কোরাপ্‌টেড সিস্টেম ছেড়ে একে-একে চলে যায় তা হলে সিস্টেমটা শেষ পর্যন্ত হানড্রেড পারসেন্ট কোরাপ্‌টেড হয়ে পড়বে। তা ছাড়া, য়ু মিস দ্য ফাইট। জীবনে লড়াইটাই হচ্ছে আসল—জেতা বা হারাটা নয়।'

মিহিরদা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন।

মিহিরদার চোখে জল এসে গেল। সেটা টের পেলেন বাতাসের ঝাপটায় দু-চোখের কোল ঠান্ডা লাগছে বলে। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছলেন। কিন্তু কোনও লাভ হল না। চোখের আড়ালে থাকা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড চোখের জলের জোগান দিয়েই চলল।

ঝাপসা চোখে মিহিরদা সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর মাথার ভেতরে একটা অদ্ভুত মানুষ ঘুরপাক খাচ্ছিল—যে-মানুষটা সবকিছুকে লড়াই দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইত, লড়াইটা ছিল যার সবচেয়ে বড় ভরসা।

কিন্তু এ-যাত্রা লড়াই সুরঞ্জনকে বাঁচাতে পারেনি।

নানান কথা ভাবতে-ভাবতে মিহিরদার চোখ একসময় বুজে এল। অসহ্য ক্লান্তি আরামের প্রলেপ বুলিয়ে দিল কপালে। মিহিরদা তন্দ্রায় ডুবে গেলেন।

বরাভূম স্টেশনে পৌঁছে জিপ ঝাঁকুনি দিয়ে থামতেই মিহিরদার ঘুম ভাঙল। বেশ কয়েকটা দোকানপাট, আলো, মানুষজন মিহিরদাকে ভরসা দিল। ফলে বাকি কাজটুকু এখন আর তেমন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না। তা ছাড়া, ভেতর থেকে কে যেন বলছিল, 'গাঙ্গুলি, তুমি পারবে। আই নো, য়ু ক্যান ডু ইট। ফাইট,

গাঙ্গুলি, ফাইট—!'

চোখে জল এসে গিয়েছিল আবার, কিন্তু দাঁতে-দাঁত চাপলেন মিহিরদা। মনে-মনে বললেন, 'পারতে আমাকে হবেই, ফিয়ারলেস, যে-করে-হোক, পারতে আমাকে হবেই...।'

শেষ পর্যন্ত মিহিরদা পেরেছিলেন।

চোখের জল মুছে নিলেন মিহিরদা। আমাকে পুরোনো কথা বলতে-বলতে কী করে যেন টাইম মেশিনে চড়ে সেই পুরোনো সময়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মিহিরদা যে বাপিকে ভীষণ ভালোবাসতেন সেটা আরও বেশি করে বুঝতে পারছিলাম।

মিহিরদার চশমার কাচের নীচ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। বাঁ-দিকের গালের ওপরে চামড়ার ভাঁজে একফোঁটা জল বহুক্ষণ ধরে আটকে রইল। আমি সেই অশ্রুবিন্দুর দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম। মিহিরদার কথাগুলো আমাকে একটা সিনেমা দেখাচ্ছিল। বারবার। তবে সেই অপার্থিব সিনেমার জায়গায়-জায়গায় ছবিটা ঝাপসা, অস্পষ্ট। আর শেষটা জানা নেই।

'ব্যারন'-এর ঘরটা হঠাৎই 'পথিক' হোটেলের পাঁচনম্বর ঘর হয়ে গেল। একটা দম আটকানো ন্যাপথালিনের গন্ধ কোথা থেকে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসল। তার সঙ্গে নেশা ধরানো একটা মিষ্টি আমেজ।

'ব্যারন'-এর আলো বলতে টিউবলাইট—কোনও বাল্ব-টালব্ নেই। তবুও মনে হল, টিউবলাইটগুলো যেন অল্প-অল্প দুলছে।

মিহিরদার সঙ্গে কথা বলার আগে আমি কোথায় ছিলাম, আর এখন কোন সপ্তপাতালের অতলে!

বাপির ডায়েরিতে ওই সবুজ শ্যাওলার কথা লেখা আছে। লেখা আছে ওই ভয়ংকর শিসের কথাও। টানা-টানা ওই শিসের শব্দ এই মুহূর্তে আমার কানের পরদা ফাটিয়ে দিতে চাইছিল। আমি কানে হাত চাপা দিলাম। আরও কত কী জানতে বাকি আছে কে জানে!

মিহিরদার দিকে তাকিয়ে আমার মনটা শ্রদ্ধায় ভরে গেল। মানুষটাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে হল। এত সাহস এই রোগা-সোগা মানুষটার ভেতরে! বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে আসার জন্যে মিহিরদা রক্ত হিম-করা ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে প্রাণ হাতে করে হেঁটে এসেছেন!

আমি চোখ মুছলাম আবার। অপেক্ষা করতে লাগলাম। গোটা শরীরটা কেমন যেন জেলি হয়ে গিয়েছিল। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। শুধু দেখছি, শুনছি,

আর অনুভব করছি।

মিহিরদা হাতের চেটো দিয়ে গাল মুছলেন। জলের গ্লাসটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে তুলে নিলেন টেবিল থেকে। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে চুমুক দিয়ে জল খেলেন। তারপর ছোট্ট করে দুবার কাশলেন। গলা চেপে খুব ধীরে-ধীরে বললেন, 'সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের টান কতখানি ছিল সেটা আমি এর আগে বুঝতে পারিনি, অন্তরা। ওর জীবনের শেষ ক'টা দিন ভাবতে শুরু করলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন হু-হু করে ওঠে...।'

মিহিরদা প্রাণপণে কান্না চাপতে চেষ্টা করছিলেন। সেইজন্যেই চোয়াল চেপে ধীরে-ধীরে কথা বলছিলেন।

'গত সপ্তাহে মধুসূদন আমাকে ফোন করেছিল। আমি ভেবেছিলাম, ওর ফোন বোধহয় আর কোনওদিনও আসবে না। হয়তো ও ভয় পেয়েছে...তাতে...সে যাই হোক, ও ফোন করে বলল সুরঞ্জন মজুমদারের একটা ডায়েরি ওর কাছে আছে। মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে সুরঞ্জন ডায়েরিটার কথা মধুসূদনকে বলেছিল। বলেছিল, ওর ভালো-মন্দ কিছু হয়ে গেলে এটা যেন ওর বাড়ির লোকের হাতে পৌঁছয়।

'মে মাসের পাঁচ তারিখে, সুরঞ্জন যেদিন মারা যায়, মধুসূদন হোটেলের দোতলার পাঁচনম্বর ঘর থেকে অস্বাভাবিক কিছু শব্দ শুনতে পায়। রাত তখন প্রায় দশটা। দরজায় ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গিয়েছিল—আর মধু দেখেছিল, সুরঞ্জনের বিকৃত মৃতদেহ বিছানায় পড়ে আছে...।'

'ঘরের দরজা কি খোলাই ছিল?' আমি জিগ্যেস করলাম, 'অত রাতে দরজা খোলা রেখে কেউ কি বিছানায় শুয়ে থাকে?'

মিহিরদা বললেন, 'কে জানে! মধুসূদন সেসব কিছু বলেনি। ও শুধু বলল, তক্ষুনি কী ভেবে ও ডায়েরিটা খুঁজতে শুরু করে। একটু পরে বালিশের নীচ থেকে সেটা পেয়েও যায়। ব্যস...তারপর থেকে ওটা মধুসূদনের কাছেই ছিল। ফোন করে ও আমাকে পরদিন পুরুলিয়া স্টেশনে আসতে বলল। বলল, "একটু কষ্ট করে এসে এ-জিনিসটা নিয়ে যান, বাবু...তা হলে আমি দায় থেকে মুক্তি পাই...।" আমি তখন গিয়ে সেটা নিয়ে আসি।

'দিনের আলোয় পুরুলিয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে যখন মধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল, তিনমাস আগের ব্যাপারগুলো সব মিথ্যে, সব কল্পনা। কথায়-কথায় মধু আমাকে বলল, চাঁদমনি গ্রামের মলিন সামন্তের খোঁজ ও পেয়েছে। মলিন সামন্ত একটা মাইনিং কোম্পানির এক কেরানির ছেলে। এমনিতে ছেলেটা নাকি ভালোই—তবে ও কিছু-কিছু অদ্ভুত কথা বলছে। বলছে, সেগুলো নাকি ওর

আগের জন্মের কথা।

'আর কোনও কথা মধুসূদন বলতে চায়নি। মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছিল। ও চলে যাওয়ার আগে ওর হাত চেপে ধরে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, "মধু, কখনও যদি এখানে খোঁজখবর করতে আসি...ধরো ওই মলিন সামন্তের ব্যাপারে...তা হলে আমাকে সাহায্য করবে তো?" উত্তরে মধুসূদন মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল, বলেছিল, "যতটা সাধ্যি করব, বাবু।" '

মিহিরদার শেষ কথাটা আমাকে যেন উসকে দিল। মিহিরদা কি আবার যেতে চান সেই ভয়ের দেশে? গিয়ে খোঁজ করবেন মলিন সামন্তের? তা হলে তো এটাও খোঁজ করে দেখা যায়, বাপি কেন ভয় পেয়েছিল, কেন বাপির শেষটা ওরকম ভয়ংকর হল!

'আপনি কি মলিন সামন্তকে নিয়ে স্টোরি করতে চান, মিহিরদা?'

মিহিরদা চমকে উঠলেন। সরাসরি তাকালেন আমার চোখে। একটু সময় নিয়ে থেমে-থেমে বললেন, 'ঠিক জানি না...তবে করতে পারলে সুরঞ্জনের আত্মা খুশি হত। তোমার কী মনে হয়, অন্তরা?'

'আমি আর কী বলব। আপনি ডায়েরিটা আগে পড়ে দেখুন। তারপর যদি মনে করেন...' ইতস্তত করতে-করতে পরের কথাগুলো একরকম ছিটকে বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে : '...যদি যান, আমিও আপনার সঙ্গে যাব, মিহিরদা।'

মিহিরদা অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কে জানে, আমার মধ্যে হয়তো বাপিকে খুঁজছিলেন। আমি চোখ নামিয়ে ঘাড় কাত করে খানিকটা জেদি ভঙ্গিতে বসে রইলাম।

বাপির রক্ত বইছে আমার শরীরে। রক্ত তো নয়, যেন তরল আগুন! সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। প্রতিটি রক্তকণিকা যেন একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে বলছে, 'ফিয়ারলেস মজুমদারের রক্তের বদলা চাই। ভয় পেয়ে যদি সে মারা গিয়ে থাকে তা হলে সেই ভয়ের মুখোশ খুলতে চাই। কাম অন, ফিয়ারলেস জুনিয়ার, লেট আস ডু ইট। ওঃ, কাম অন...।'

রক্ত যখন ডাকে তখন বোধহয় এইভাবেই ডাকে।

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখের নজর ঝাপসা হয়ে এল। কয়েক লহমার জন্যে চারপাশটা একেবারে মুছে গেল।

যখন আবার চেতনা ফিরে এল, দেখি কপালে-গলায় ঘামের ফোঁটা। অথচ রেস্তরাঁর এসি মেশিন দিব্যি কাজ করছে।

মিহিরদা হঠাৎই উঠে দাঁড়ালেন। বাপির ডায়েরিটা ডানহাতের শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার মা সুরঞ্জনের এই ডায়েরিটার কথা জানে?'

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ছোট্ট করে বললাম, 'ঠিক জানে না, তবে খানিকটা বোধহয় আঁচ করেছে।'

মিহিরদা বড় করে শ্বাস ফেললেন। 'ব্যারন'-এর ক্যাশ কাউন্টারের দিকে এগোতে-এগোতে বললেন, 'মা-কে তুমি সামলে রেখো। তোমার মা-তো খুব অল্পেতেই টেনশানে ভোগে। যেটুকু বলার বুঝে-শুনে বোলো।'

রেস্তরাঁর বিল মিটিয়ে দিলেন মিহিরদা। বললেন, 'আমি পরশুদিন তোমাকে ফোন করব।'

আমি বললাম, 'ফোন কেন? চলে আসুন না—অনেকদিন আসেননি। আপনি এলে মা খুশি হবে।'

মিহিরদা বিড়বিড় করে বললেন, 'হুঁ, অনেকদিন যাইনি। ঠিক আছে...অফিসের পর যাব...সেদিন তুমি আমাকে রেঁধে খাওয়াবে কিন্তু...।' বলে মিহিরদা হাসলেন।

'ঠিক আছে, খাওয়াব।'

'ডিম সেদ্ধ আর ডিমভাজা ছাড়া আর কিছু রাঁধতে শিখেছ? অনেকদিন তোমার রান্নার খবর নিইনি...।'

এই হচ্ছেন মিহিরদা। মুহূর্তে আবহ বদলে দেন। এতক্ষণ কোথায় ছিলাম, আর এখন কোথায় চলে এলাম।

আমি হেসে ফেললাম ঃ 'শুধু ডিমসেদ্ধ আর ডিমভাজা নয়—আমি আরও অনেক রান্না জানি। আপনি চাইলে রান্না নিয়ে ''সুপ্রভাত''-এ একটা আর্টিক্‌ল লিখে ফেলতে পারি!'

মিহিরদা গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'না, ওটা লিখো না। ওটা ছাপা হলে আমাদের কাগজটা সেদিন এত টেস্টফুল হবে যে, পাঠকরা কাগজটা স্রেফ গপগপ করে খেয়ে ফেলবে। তারপর নার্সিংহোম আর হসপিটাল...পরদিন আমাকেই হয়তো লিড নিউজ লিখতে হবে।'

আমি শব্দ করে হেসে ফেললাম। হাসির দমক সামলাতে মুখে হাত চাপা দিলাম। বুকের ভেতরটা পলকে কেমন হালকা হয়ে গেল।

পরশুদিন মানে রবিবার। কিন্তু মিহিরদাদের উইকলি ছুটিটা রোটেশনাল। এ-সপ্তাহে মিহিরদার অফিস আছে। তাই যখন জিগ্যেস করলাম, রোববার কখন আসবেন?' মিহিরদা বললেন, 'এই ধরো সাতটা—।'

কথা বলতে-বলতে 'ব্যারন'-এর কাচের দরজা ঠেলে আমরা বেরিয়ে এলাম বাইরে।

ঘোলাটে আকাশ থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। চারপাশে সবকিছুই স্বাভাবিক। ভিজে রাস্তা দিয়ে টায়ারের চড়চড় শব্দ তুলে ছুটে যাওয়া গাড়ি, বাস,

অটোরিকশা—আর ছাতা মাথায় হেঁটে চলা মানুষজন—সবকিছু এত চেনা যে, তাতে ভয়ের লেশমাত্রও নেই।

আসলে অচেনা জিনিসকেই আমরা ভয় পাই।

॥ পাঁচ ॥

সবকিছু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

একটু আগেই কয়েক পশলা হয়ে গেছে। আমার জামাকাপড় বেশ ভিজে গেছে। আচমকা এরকম বৃষ্টি এসে পড়বে ভাবিনি। কিন্তু তারপরই ঘোলাটে মরা রোদ ফুটে উঠেছে।

যতদূর চোখ যায় নুড়ি-পাথর ঢালা রুক্ষ প্রান্তর—বৃষ্টিতে ধুয়ে চকচক করছে। এক অদ্ভুত ধরনের ঢেউ খেলিয়ে সেই প্রান্তর মিলিয়ে গেছে দিগন্তে। সেখানে লম্বা-লম্বা কয়েকটা গাছ। পিছনে আবছা সূর্য থাকায় গাছগুলো কালো ছায়া-ছবি হয়ে গেছে।

ক্ষয়ে আসা বিকেল এখন ধীরে-ধীরে রাতের পোশাক পরছে। তাই চারদিক কেমন শান্ত স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে—যদিও জানি, সেটাই আসল চেহারা নয়।

হঠাৎই চোখে পড়ল, দিগন্তের প্রান্ত থেকে কয়েকজন লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছে। ওদের কালো ছায়াগুলো ধীরে-ধীরে বড় হচ্ছে। ডুবে যাওয়া সূর্যের দিক থেকে ওরা এগিয়ে আসছে আমারই দিকে।

লোকগুলোর দিকে একমনে তাকিয়ে আছি, হঠাৎই যেন মনে হল ঢেউ খেলানো বিস্তৃত প্রান্তরটা অল্প-অল্প কাঁপছে। কাঁপুনিটা এমন যেন একটা বিশাল মাপের রবারের চাদর কেউ মেলে ধরেছে। আর তার তলায় সমুদ্রের ঢেউ বাচ্চা ছেলের মতো দাপাদাপি করছে।

তা হলে কি ভূমিকম্প হচ্ছে?

সেই প্রশ্নের উত্তর পেলাম না কিছুতেই। শুধু লক্ষ করলাম, লোকগুলো হেঁটে আসছে সমান তালে। পায়ের নীচে ঢেউখেলানো জমি 'জ্যান্ত' হয়ে উঠলেও ওদের পা ফেলতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

পশ্চিমদিকের লাল আভা কালচে হয়ে যাচ্ছিল।

আর ঠিক তখনই আমি শিসের শব্দ শুনতে পেলাম।

লোকগুলো একসঙ্গে এক অদ্ভুত সুরে শিস দিচ্ছে।

ওরাই তো, নাকি অন্য কেউ?

আরও কাছে এসে পড়ল ওরা। কিন্তু আশ্চর্য! ওদের ছায়া শরীরগুলো স্পষ্ট হচ্ছে না কেন? ওরা সেই আগের মতোই কুচকুচে কালো আট-দশজন মানুষ। বুঝি অন্ধকার দিয়েই ওদের শরীর তৈরি। ওরা শিস দিচ্ছে।

তখনই লক্ষ করলাম, ওদের কালো দেহে নানান জায়গায় সবুজ ছোপ। সবুজ শ্যাওলা মাখা মানুষগুলো শিস দিতে-দিতে আমার খুব কাছে এসে পড়েছে। ওদের পায়ের নীচে রুক্ষ প্রান্তরের ঢেউগুলো আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে কে একজন তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠল ঃ 'অন্তু!'

বাপি!

কে? ওদের মধ্যে কে বাপি?

আমার চোখ পাগলের মতো ছায়াময় মানুষগুলোর মুখের আদল খুঁজতে লাগল। আমি চিৎকার করে সাড়া দিলাম বাপির ডাকে।

'বাপি! বাপি! এই যে আমি!'

'অন্তু!'

'বাপি!'

'অন্তু! অন্তু!'

কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে, আর ডাকছে ঃ 'অন্তু! অন্তু!'

ঘুম ভেঙে গেল।

মা আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, অন্তু? ভয় পেয়েছিস? সেই কখন থেকে তোকে ডাকছি...।'

চোখ খুললাম। চেতনার দরজাও যেন খুলে গেল একইসঙ্গে। মিষ্টি রিমঝিম শব্দ কানে এল আমার। বৃষ্টি পড়ছে। কখন শুরু হয়েছে কে জানে!

বিছানার পাশ ঘেঁষেই জানলা। জানলা দিয়ে আকাশের মেঘ আর তার আড়ালে চাঁদের নৌকো ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে। আকাশ থেকে ছুটে আসা বৃষ্টির ফোঁটাগুলোও কখনও-কখনও চোখে পড়ছে।

মা ঝুঁকে পড়েছে আমার ওপরে। মায়ের মুখটা অন্ধকার, কিন্তু মনের চোখ দিয়ে সেটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

'কোনও বাজে স্বপ্ন দেখছিলি নাকি?'

আমি বড় করে শ্বাস টানলাম। তারপর উঠে বসলাম বিছানায়।

রাতে মা আর আমি একসঙ্গে মায়ের ঘরে শুই। বাপি চলে যাওয়ার পর থেকে আমি মাকে সবসময় আগলে রাখি। কিছুতেই মায়ের মনখারাপ

হতে দিই না।

এখন কী বলব মাকে? বাপির ডায়েরিটা পড়লে পাছে মা মাঝরাতে ভয়ের স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ওঠে, সেইজন্যে মাকে ওটা পড়তে দিইনি। কখনও ভাবিনি আমার অবস্থা মায়ের মতন হবে।

মা আমার পিঠে হাত রাখল। বলল, 'কী হয়েছে আমাকে খুলে বল, অন্তু। আমার কাছে লুকোস না।'

আমি কথা ঘোরানোর চেষ্টায় বললাম, 'তুমি ঘুমোওনি?'

অন্ধকারে মা মাথা নাড়ল ঃ 'ঘুম আর এল কোথায়! সবে একটু তন্দ্রামতন এসেছে, তখনই শুনি তুই গোঁ-গোঁ শব্দ করছিস। পাশ ফিরে দেখি তোর বুকের ওপরে হাত—তোকে বোবায় ধরেছে। তোর হাতটা সরিয়ে দেওয়ামাত্রই তুই "বাপি! বাপি!" করে ডেকে উঠলি। আমি যতই তোকে ডাকি, তুই শুধু "বাপি! বাপি!" করে যাচ্ছিস। তখন তোকে জোরে ধাক্কা দিয়েছি।'

মা আমার পিঠে হাত বোলাচ্ছিল। এক অদ্ভুত আরামে আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। স্নেহ-মমতা এত জাদুই জানে!

আমি আর পারলাম না। দু-হাতে অন্ধকার মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মায়ের কাঁধে মাথা রেখে ডুকরে উঠলাম ঃ 'মা-মাগো! আমি আর পারছি না।'

মা কোনও কথা বলল না। শুধু আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পর মা আলতো গলায় জিগ্যেস করল, 'ডায়েরিটার কথা আমাকে বলবি না, অন্তু?'

আমি কেঁদে ফেললাম। মায়েরা বোধহয় এইরকমই হয়। আমাদের মনের দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, ভালোবাসা সব কেমন অলৌকিকভাবে টের পেয়ে যায়।

মা আমার শরীরের কাঁপুনির খবর পেল। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'কেন এত কষ্ট পাচ্ছিস? সবকথা আমাকে খুলে বল—।'

আমি মায়ের কাছ থেকে একটু সরে বসলাম। চোখ মুছে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

মা চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

অন্ধকারেই আমার চোয়াল শক্ত হল। সবকথা বলব মাকে। মা কষ্ট পাবে, ভয় পাবে—কিন্তু সবসময় তো অনেক কষ্ট আর ভয় ডিঙিয়েই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে হয়।

মাকে বললাম, 'সবকথা তোমাকে খুলে বলব, মা—কিন্তু তুমি সইতে পারবে তো!'

মা অন্ধকারে ফুঁপিয়ে উঠল, বলল, 'বাঁচতে আমার আর ইচ্ছে করে না, অন্তু।

শুধু তোর কথা ভেবে যেতে পারি না। এ কি সংসারের টান, নাকি মায়া...জানি না।'

আমি হাতড়ে-হাতড়ে মায়ের হাত খুঁজে পেলাম। সে-হাতে কী ম্যাজিক আছে কে জানে! কারণ, হাতটা ছোঁয়ামাত্রই মনে এক অদ্ভুত আশ্বাস পেলাম।

ধীরে-ধীরে মাকে সবকথা বলতে শুরু করলাম। মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি আর অন্ধকার রাত আমার কথা শুনতে লাগল।

বলতে-বলতে টের পেলাম, এখন আর আগের মতো ভয় করছে না।

মা চুপটি করে আমার কথা শুনছিল—যেন রূপকথার গল্প শুনছে। আমাকে থামিয়ে একটি কথাও জিগ্যেস করল না।

আমি অন্ধকারে চোখ মেলে বাপির গল্প বলছিলাম। মাকে ঠিকমতো ঠাহর করা যাচ্ছিল না বলে মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল, আমি বোধহয় আপনমনেই কথা বলে চলেছি। তবে খুব হালকাভাবে মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমার কানে আসছিল—সেইসঙ্গে মাথার ওপরে ঘুরন্ত সিলিং পাখার হাঁপানির ঘসঘস শব্দ।

কথা বলতে-বলতে আমি বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমাদের উত্তর কলকাতার পুরোনো ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে আমি যেন পুরুলিয়ার ক্ষুধার্ত প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাপির ভয় পাওয়ার গল্প যেন আমারই ভয় পাওয়ার গল্প।

আমার কথা যখন শেষ হল তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। ঝাপসা চাঁদও সরে গেছে জানলা থেকে।

আমি মায়ের কোনও সাড়া পাচ্ছিলাম না। মা কি মন দিয়ে শুনেছে আমার গল্প?

'মা—।' আমি ডেকে উঠলাম।

আর ঠিক তখনই মায়ের ফোঁপানি শুরু হল। খুব চাপা শব্দে মিহি সুরে মা গুমরে কাঁদছে।

আমার বুকের ভেতরটা পাথর হয়ে গেল।

একটা মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে সাড়ে তিনমাস আগে। তখন আমরা প্রিয়জনের শোকে প্রচুর চোখের জল ফেলেছি। ভেতরের বুক মুচড়ে ওঠা শোক অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এসেছে চোখ দিয়ে।

কিন্তু আর কতদিন? আর কতদিন আমরা ফিয়ারলেস মজুমদারের জন্যে চোখের জল ফেলব?

আমি চোখ মুছলাম। ভেতরে-ভেতরে বেশ বুঝতে পারছিলাম, যদি বাপির এই রহস্যময় মৃত্যুর রহস্য আমরা জানতে না পারি তা হলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের চোখের জল ফেলতে হবে। বাপি নিশ্চয়ই চাইত না আমরা সবাই সারাজীবন

চোখের জল ফেলি। বাপি মিহিরদাকে বলে গেছে ঃ '...অন্তু আর পূর্ণলতাকে দেখো...।' কী দেখবেন মিহিরদা? সেই মানুষটাওতো আজ বিকেলে বাপির জন্যে চোখের জল ফেলেছে!

কী হতভাগ্য আমাদের জীবন!

মা তখনও গুঙিয়ে-গুঙিয়ে কাঁদছিল। আর ইনিয়েবিনিয়ে বলছিল, 'না রে, তোর বাপি ভিতু ছিল না। না রে, তোর বাপি ভিতু ছিল না...।'

আমি আবার ডেকে উঠলাম ঃ 'মা! কী হচ্ছে!'

আমার গলা কেমন শক্ত আর ভাঙাচোরা শোনাল—যেন অনেকটা পুরুষালি গলায় কোনও মেয়ে কথা বলল।

এটা কি আমার গলা! কে জানে! তবে মা আমার কথা শুনল। মায়ের কান্নার গোঙানি থেমে গেল। শুধু শ্বাস টানার শব্দ পাচ্ছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মা অস্পষ্ট ক্লান্ত গলায় বলল, 'অন্তু, আমাকে একগ্লাস জল দিবি?'

অন্ধকারেই বিছানা ছেড়ে নামলাম। এই ঘরের ভূগোল আমার খুব চেনা। শুধু এই ঘরের কেন, দোতলার এই ফ্ল্যাটের প্রতিটি অণু আমার ভীষণ চেনা। বিয়ের পর থেকেই মা আর বাপি এই বাড়িতে ভাড়াটে। পরে এসেছি আমি।

রাতে বিছানা ছেড়ে উঠলে আমি কখনও আলো জ্বালি না। বোধহয় অন্ধকারকে ভয় পাই না বলেই। সুতরাং চেনা ভূগোলে পা ফেলে অনায়াসে পৌঁছে গেলাম জলের জগের কাছে। ওটা নিয়ে এসে মায়ের হাতে দিলাম।

মা আন্দাজে হাতড়ে জলের জগটা নিয়ে জল খেল। তারপর ওটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার কাছে এসে বোস—।'

আমিও দু-ঢোক জল খেলাম। তারপর জগটা রেখে এসে মায়ের ঠিক পাশটিতে বসলাম।

মা থেমে-থেমে বলল, 'একটা কথা মনে হচ্ছে, অন্তু। তোর বাপি...।'

'কী কথা, মা?'

'তোর বাপি শুধু নিজের জন্যে ভয় পায়নি।'

এটা আবার কী ধরনের কথা! মায়ের কথার ঠিক-ঠিক মানে বুঝতে পারলাম না আমি।

'নিজের জন্যে ভয় পায়নি মানে? তুমি কী বলতে চাইছ?'

'তোর বাপি এমন কিছু দেখেছিল, এমন কিছু জেনেছিল, যাতে ওর মনে হয়েছে অনেকের বিপদ হতে পারে। তাই বলছি, ও শুধু নিজের জন্যে ভয় পায়নি।'

আমি মায়ের কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। নিজের জন্যে ভয়

পাওয়া, পরের জন্যে ভয় পাওয়া, অনেকের জন্যে ভয় পাওয়া—এসব কি আবার আলাদা না কি!

'যার জন্যেই বাপি ভয় পেয়ে থাকুক, সেই ভয়টার খোঁজ করা দরকার, মা। সেই ভয়ের মুখোশটা খোলা দরকার—দেখা দরকার, ওই সাংঘাতিক মুখোশটার আড়ালে কী আছে।'

শব্দ করে একটা শ্বাস ফেলল মা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তোর বাপিও আমাকে সেই কথাই বলছিল...।'

আমি চমকে উঠে মায়ের দিকে তাকালাম। আবছা আলো মায়ের গায়ের এখানে-ওখানে, কিন্তু মুখটা অন্ধকার।

এসব কী বলছে মা! বাপিও বলছিল মানে!

সে-কথাই মাকে জিগ্যেস করলাম।

মা আনমনাভাবে বলল, 'হ্যাঁ, বলছিল ...স্বপ্নে। তোর বাপি চলে যাওয়ার পর থেকে একটা রাতেও আমি ঠিকমতো ঘুমোতে পারিনি, অন্তু। ও স্বপ্নের মধ্যে কতরকমভাবে যে আসে...কত কথা বলে...কত ইশারা করে...সব আমি ঠিকমতো বুঝতেও পারি না। কিন্তু বুকের মধ্যে দারুণ কষ্ট হয়। তবে তুই ঠিক বলেছিস...ওই ভয়ের আড়ালে কী আছে সেটা জানা দরকার...।'

কথা বলতে-বলতে মায়ের গলা ভাঙচুর হচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, বুকের ভেতরে একটা কালবৈশাখী চেপে রেখে মা কথা বলছে।

বাইরে জোলো বাতাস বইছিল। দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় বৃষ্টিকণা চোখে পড়ছিল। কখন আবার শুরু হয়েছে কে জানে!

আমি মায়ের কথার রেশ টেনে বললাম, 'যদি ওই ভয়ের আড়ালে আর-একটা ভয় থাকে, মা!'

'থাকুক। থাকলে সেটাও সরিয়ে দেখতে হবে...।'

আমার মা ছোটখাটো চেহারার নরম স্বভাবের শান্ত মানুষ। পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। এর মানেই যে মানুষটাকে ভিতু হতে হবে তা নয়। কিন্তু কেন জানি না, মাকে কখনও আমার সাহসী বলে মনে হয়নি। আমি যেন এক নতুন মা-কে খুঁজে পেলাম।

মনে-মনে হাসি পেল আমার। আসলে ভুলটা আমারই। কারও বাইরের চেহারা দিয়ে ভেতরের সাহস মাপা যায় না।

যদি ভয়ের আড়ালে ভয় থাকে, তার আড়ালে আর-একটা ভয়, তার পরেও...নাঃ, ভেবে কোনও লাভ নেই। সবক'টা ভয়ের মুখোশ আমাকে খুলতে হবে। খুলতেই হবে! দেখতে হবে, শেষ মুখোশটার আড়ালে কী আছে।

এরপর অনেকক্ষণ আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

তারপর মা আমাকে পুরোনো কথা শোনাতে লাগল। বাপির কথা, আমার ছোটবেলার দুষ্টুমির কথা, অসুখবিসুখের কথা, আমার প্রথম স্কুলে যাওয়ার কথা, আমাকে নিয়ে বাপি আর মায়ের ঝগড়াঝাঁটির কথা, আরও কত কী!

শেষরাতে আমরা দুজনে শুয়ে পড়লাম। আমি মায়ের কাছ ঘেঁষে পাশ ফিরে শুলাম। একটা হাতে জড়িয়ে ধরলাম মাকে। মা, আমার মা! ভয়ের খোঁজে আমি যেখানেই যাই না কেন, মনে-মনে আমি সবসময় তোমার কাছেই থাকব। এখন তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।

মা অন্ধকারেই আমার হাতের পাতাটা মুঠো করে চেপে ধরল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'তোর কোনও ভয় নেই, অন্তু...।'

ঘুম ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। ও-ঘরে ফোন বাজছে।

বাপির বিশ্রামের সময় টেলিফোন বাজলে বাপি খুব বিরক্ত হত। তাই টেলিফোন বরাবরই আমার ঘরে। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন ওই ঘরটা ছিল আমাদের বসবার ঘর। লোকজন এলে ওই ঘরেই বসতে দেওয়া হত। পরে আমি বড় হলে, বসার ঘরটা আমার দখলে আসে, আর বাপি-মায়ের ঘরটা বেডরুম-কাম-ড্রইংরুম হয়ে যায়। নামগুলো ইংরেজিতে যতই শৌখিন শোনাক, আসলে ঘরগুলোর চেহারা তাদের বাংলা নামের সঙ্গেই বেশি মানানসই।

জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। আকাশে মুখগোমড়া করে থাকা গালফোলা মেঘের দল তাকে আরও মলিন করে দিয়েছে।

মায়ের দিকে তাকালাম। গায়ের কাপড় সরে গেছে। গলার দুপাশে উঁচু হয়ে থাকা হাড় দুটো বেমানান ভাবে চেয়ে আছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। শ্বাস টানার শব্দ বেশ জোরেই শোনা যাচ্ছে।

টেলিফোনের শব্দ মাকে জাগাতে পারেনি। মা হয় ঘুমোচ্ছে, কিংবা স্বপ্ন দেখছে।

প্রথমে ভাবলাম, ফোন ধরব না। এটা কি একটা টেলিফোন করার সময়! কিন্তু তারপরই মনে হল, ফোনটা জরুরি হতেও পারে। বাপির তো অদ্ভুত-অদ্ভুত সময়ে ফোন আসত। তার বেশিরভাগ ফোনই বাপি ধরত। বলত, 'সাংবাদিকদের আবার সময়-অসময় কী—শুধু বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া!'

সুতরাং সাত-পাঁচ ভেবে চোখ থেকে ঘুম মুছতে-মুছতে পাশের ঘরে গেলাম।

ক্লান্ত হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বললাম।

'এটা কি সুরঞ্জন মজুমদারের বাড়ি?' ও-প্রান্ত থেকে মোলায়েম পুরুষালি গলায় কেউ জানতে চাইল।

আমি জড়ানো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?'

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। বরং তার বদলে ভেসে এল পালটা প্রশ্ন ঃ 'আপনি সুরঞ্জন মজুমদারের কে হন?'

ভারী অসভ্য তো লোকটা! বিরক্তিতে ঘুম-ঘুম ভাবটা চটে গেল। একটু রুক্ষভাবেই বলে উঠলাম ঃ 'আমি ওঁর মেয়ে। তো?'

ও-প্রান্তে হালকা হাসির শব্দ শোনা গেল ঃ 'সুরঞ্জন মজুমদারের ডায়েরিটা এখন তা হলে আপনার কাছে?'

আমার রিসিভার-ধরা হাতটা হঠাৎই কেমন ঠান্ডা হয়ে গেল। হাত বেয়ে একটা চিনচিনে হিমেল স্রোত ছড়িয়ে যেতে লাগল সারা শরীরে।

'ডায়েরিটা আমি ফেরত চাই, ম্যাডাম।' খুব স্বাভাবিক ভদ্র গলায় লোকটি কথা বলছিল।

'ডায়েরিটা আমার বাপির। ওটা আমাদের কাছেই থাকবে।' আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে ধারালো গলায় চেঁচিয়ে বললাম, 'আপনি কে?'

আবার হাসল সে। তারপর ঃ 'আমি কে জেনে কোনও লাভ নেই, মিস। ওই ডায়েরিটা আমরা ফেরত চাই। আর ওই ডায়েরিতে যেসব কথা লেখা আছে সেগুলো আপনারা দয়া করে ভুলে যাবেন, প্লিজ। মিহির গাঙ্গুলি...আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড...ওঁকেও আমি একই রিকোয়েস্ট করেছি। এবার বলুন, ডায়েরিটা আপনি ফেরত দেবেন, নাকি আমরা ফেরত নিয়ে নেব?'

প্রশ্নটায় যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে সেটা বুঝতে আমার অসুবিধে হল না। কিন্তু কী জবাব দেব আমি?

কিছু ভেবে না পেয়ে হুট করে জিগ্যেস করে বসলাম ঃ 'ওই ডায়েরিটা নিয়ে আপনি কী করবেন?'

ও-প্রান্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ঃ 'দেখুন মিস, যা গোপন থাকা উচিত, তা গোপন রাখাই ভালো। ডায়েরিটা নিয়ে আমরা ডেস্ট্রয় করে ফেলব। বলুন, ওটা কবে ফেরত দিচ্ছেন?'

'ওটা আমার বাবার স্মৃতি।'

'ওই স্মৃতি রাখতে গেলে আপনারাও স্মৃতি হয়ে যাবেন।' ঠান্ডা মোলায়েম গলায় মন্তব্য শোনা গেল।

আমি হঠাৎই ঘামতে শুরু করলাম। পেটের ভেতরটা কেমন ফাঁকা মনে হল—

যেন খুব উঁচু নাগরদোলায় চড়ে সোঁ-সোঁ করে নীচে নামছি।

লোকটি তখন বলছে, 'আপনাদের তিনদিন সময় দিলাম, ম্যাডাম। আমার রিকোয়েস্ট না শুনলে আপনাদের অনেক দাম দিতে হবে...।'

॥ ছয় ॥

সাতটার সময় কলিংবেল বেজে উঠতেই বুঝলাম মিহিরদা।

সকালে মিহিরদা ফোন করেছিলেন। বলেছেন, অফিসের কাজ সেরে সাতটা নাগাদ চলে আসবেন আমাদের বাড়িতে। মিহিরদা দিব্যি সময়-টময় মেনে চলতে পারেন। তাই বুঝলাম, এই বেলের শব্দ মানে মিহিরদা হাজির।

দরজা খোলার আগে স্বভাবমতো জিগ্যেস করে ফেলেছি 'কে?'

ব্যস, আর যায় কোথায়!

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে গলাটা বেশ চেষ্টা করে গম্ভীর করে মিহিরদা বলে উঠলেন, 'অন্তরা ম্যাডাম আছেন? আমি মিহির গাঙ্গুলি—"সুপ্রভাত" সংবাদপত্রের সিনিয়ার রিপোর্টার—।'

আমি দরজা খুলেই বললাম, 'আবার সেই হ্যাকনিড বায়োডেটা! তার সঙ্গে "অন্তরা ম্যাডাম"। ওঃ, আপনি পারেনও বটে! আসুন, ভেতরে আসুন...বহুদিন পরে এলেন।'

মিহিরদা হাসতে-হাসতে ভেতরে ঢুকলেন, বললেন, 'আজকাল মানুষের যা ভুলো মন! খুব সহজেই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ভুলে যায়। সেইজন্যেই সবসময় আমি সেল্‌ফ পাবলিসিটি দিয়ে শুরু করি।'

লক্ষ করলাম, মিহিরদার হাতে পলিথিনের প্যাকেটে একটা মিষ্টির বাক্স, আর-একটা ছোট প্যাকেট—সুতো দিয়ে বাঁধা। এ ছাড়া কাঁধে ঝোলানো একটা কালো চামড়ার ব্যাগ।

মিহিরদা ছোট প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'এই নাও—সুরঞ্জনের ডায়েরি।' তারপর পলিথিনের প্যাকেটটা দিয়ে বললেন, 'এটা বউদিকে দাও—গাঙ্গুরামের আইসক্রিম সন্দেশ—তিনজনে মিলে খাব বলে নিয়ে এসেছি।'

পলিথিনের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে আমি ভুরু কুঁচকে মিহিরদার দিকে তাকালাম। আমার প্রচ্ছন্ন বকুনি ওঁকে বলতে চাইল, এসব নিয়ে আসার কী দরকার ছিল।

মিহিরদা জুতো ছাড়তেই আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'মা, মিহিরদা এসেছেন—।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মা বেরিয়ে এল। মায়ের মুখে অনেকদিন পর মন-খোলা হাসি ফুটে উঠল। আমরা নানান কথার কিচিরমিচির তুলে মায়ের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

মিহিরদা কাঁধের ঝোলা-ব্যাগ বিছানায় রেখে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। মুখে আরামের শব্দ তুলে হাত-পা ছড়িয়ে এমনভাবে আড়মোড়া ভাঙলেন যেন নিজের বাড়ি। এই হল মিহিরদা। যাদের আপন মনে করেন, এইভাবেই তাদের কাছাকাছি চলে আসেন।

মা মিহিরদাকে একগ্লাস জল এনে দিল। তারপর হেসে বলল, 'আপনি আসবেন বলে অন্তু নিজের হাতে চাউমিন আর চিলিচিকেন তৈরি করেছে। রাতে বাড়ি গিয়ে আর খাবেন না।'

মিহিরদা মায়ের কথা শুনে আমার দিকে চোখ টেরিয়ে একবার দেখলেন। তারপর মা-কে জিগ্যেস করলেন, 'বউদি, আপনাদের পাড়ায় কোনও চাইনিজ রেস্টুরেন্ট নেই?'

মা অবাক হয়ে বলল, 'আছে—"প্রান্তিক"। ওখানে পাঁচমিশেলি খাবারের মধ্যে চাইনিজ ফুডও পাওয়া যায়। কিন্তু কেন বলুন তো?'

মিহিরদার মতলবটা অনেক দেরিতে আমি বুঝতে পারলাম। তখন নকল শাসনের গলায় বললাম, 'মিহিরদা, কী হচ্ছে! আপনি যা ভাবছেন মোটেই তা নয়—চাউমিন আর চিলিচিকেন আমি "প্রান্তিক" থেকে কিনে আনিনি। একেবারে হান্ড্রেড পারসেন্ট আমার হাতের রান্না। "অন্তরা" রেস্টুরেন্টে তৈরি—।'

মিহিরদা এবার হেসে উঠলেন। মিহিরদার ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে মা-ও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, 'মিহিরদা, আজ আমার হাতের চাইনিজ রান্না খেয়ে আপনাকে সার্টিফিকেট দিয়ে যেতেই হবে।'

এক ঢোকে গ্লাসের জলটা শেষ করে গ্লাসটা মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিলেন মিহিরদা। তারপর বললেন, 'ভয় দেখাচ্ছ? তা হলে সার্টিফিকেট তো দিতেই হয়।'

'ভয়' কথাটা শোনামাত্রই বাপির ফটোর দিকে চোখ গেল আমার। মায়ের বিছানার মাথার দিকে দেওয়ালে ফটোটা টাঙানো। শ্রাদ্ধের সময় চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। অনেক সময় দেখেছি মা ফটোটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, আর বিড়বিড় করে কীসব কথা বলে।

মা রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছিল।

আমি মিহিরদাকে জিগ্যেস করলাম, 'বাপির ডায়েরিটা পড়েছেন?'

মিহিরদা রান্নাঘরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, পড়েছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে...।'

'মিহিরদা, আমি মাকে সব বলেছি... কাল রাতে।' মাথা ঝুঁকিয়ে মেঝের দিকে তাকালাম আমি ঃ 'আসলে আমি একা-একা আর পারছিলাম না...।'

'বউদি কী বলল?'

আমি মিহিরদার চোখে চোখ রাখলাম ঃ 'বলল, ওই ভয়ের আড়ালে কী আছে সেটা জানা দরকার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মিহিরদা। তারপর বললেন, 'চাঁদমনি গ্রামে আমাকে যেতেই হবে। জানতে হবে মলিন সামন্তের গল্পটা...।'

'আর আমি কলকাতায় হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

'না, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।' একটু থেমে মিহিরদা জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু বউদি কোথায় থাকবেন? এখানে...একা-একা...।'

'মা-কে বর্ধমানে মাসির কাছে রেখে আসব।'

'আমি তা হলে দু-চারদিনের মধ্যেই তোমাকে জানাব কবে আমরা রওনা হব। অফিস থেকে একটা অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট করিয়ে নেব।'

'আর ফটোগ্রাফার?'

হাসলেন মিহিরদা, বললেন, 'অফিসের খরচ আর বাড়াব না। আমার সাদাসিধে ইয়াশিকা মিনিটা সঙ্গে নিয়ে নেব।'

'আমাদের স্টোরি ফটোসমেত ছাপা হলে লোকে চমকে যাবে।' আমি মিহিরদার দিকে ঝুঁকে বসলাম ঃ 'আচ্ছা, মিহিরদা, ডায়েরির ওই লেখাগুলো আপনার বিশ্বাস হয়?'

'বিশ্বাস না করে উপায় কী বলো। কারণ, ওই শিসের শব্দ, সবুজ শ্যাওলা —ওগুলোও তো ডায়েরিতে লেখা আছে। আর আমি সেগুলো নিজের কানে শুনে এসেছি, নিজের চোখে দেখে এসেছি। তা ছাড়া, মধুসূদনও কম কিছু জানে না।'

'বাপি ডায়েরিতে মিথ্যে কথা লিখবে না কিছুতেই। আপনিও দেখে-শুনে এসেছেন অনেক কিছু। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডায়েরির কিছু-কিছু ঘটনা এতই অ্যাবসার্ড আর ফ্যানট্যাস্টিক যে, মন কিছুতেই মানতে চাইছে না। আজকের এই ইলেকট্রনিক্সের যুগে...বলুন...অ্যাবসার্ড লাগে না?'

মিহিরদা কাশলেন কয়েকবার। তারপর একটু সময় নিয়ে বললেন, 'দ্যাখো, অন্তরা, কলকাতায় বসে পাখার হাওয়া খেতে-খেতে টিউবলাইটের আলোয় অনেক

কিছুই অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, দেখার ভুল, হতেই পারে না, ইত্যাদি বলে মনে হবে। কিন্তু তোমার বাপির ডেডবডি নিয়ে আসার সময় এমন সব ঘটনা ঘটেছে যে, সেগুলো আজ এখানে বসে আমার স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সত্যি-সত্যি ওগুলো আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম তো!'

আমি চুপ করে রইলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, মিহিরদা ভুল কিছু বলছেন না।

'অন্তরা, আমাদের ভয়ের কাছাকাছি যেতে হবে...।' মিহিরদা বাপির ফটোর দিকে চোখ রেখে কেমন আনমনাভাবে কথাগুলো বললেন।

ভয়ের কাছাকাছি। মানে, সত্যের মুখোমুখি? ঠিকই, এর কোনও বিকল্প নেই।

এমনসময় মা এসে ঘরে ঢুকল, মিহিরদার খাবারদাবার সাজিয়ে দিল ছোট মাপের রং-চটা একটা টি-টেবিলে। তারপর মিহিরদাকে বলল, 'নিন, চেখে দেখুন, আপনার ভাইঝি কেমন রেঁধেছে—।'

'অবশ্যই—' বলে প্লেটের দিকে হাত বাড়ালেন মিহিরদা ঃ 'অন্তরার রান্না টেস্ট করে কাল কাগজে রিপোর্টটা তো ছাপাতে হবে...।'

আমি কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎই পাশের ঘরে ফোন বাজতে শুরু করল।

আমি, 'একমিনিট—' বলে উঠে গেলাম ফোন ধরতে।

ফোনে কথা বলতেই বুঝলাম মিহিরদার ফোন। 'সুপ্রভাত'-এর অফিস থেকে প্রকাশ সেন ফোন করেছেন, মিহিরদাকে চাইছেন।

মায়ের ঘরে ফিরে এসে মিহিরদাকে খবরটা দিতেই তিনি 'আসছি—' বলে চলে গেলেন আমার ঘরে।

মা আমাকে জিগ্যেস করল, 'ডায়েরিটার জন্যে তোকে যে ফোনে ভয় দেখিয়েছে সে-কথা ওঁকে বলেছিস?'

আমি বললাম, 'না, এখনও বলিনি—বলব।'

একটু পরেই গজগজ করতে-করতে মিহিরদা ফিরে এলেন। বললেন, 'অফিস তো নয়, একেবারে গুপিযন্ত্র—বাজছে তো বাজছেই, থামার নাম নেই। কোনও এমার্জেন্সি হলে যাতে আমাকে কনট্যাক্ট করতে পারে সেইজন্যে এ-বাড়ির ফোন নাম্বারটা দিয়ে এসেছিলাম। এখন বলছে, অফিসে আবার যেতে হবে—রাজধানী এক্সপ্রেস একটা ব্রিজের ওপরে বেলাইন হয়েছে...গোটা চার-পাঁচ বগি উলটে নদীতে পড়েছে। দুর, ভাল্লাগে না।'

আমি বললাম, 'আপনি মোটেই তাড়াহুড়ো করবেন না...এতদিন পর আমাদের বাড়িতে এসেছেন...।'

মা-ও আমার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্তে খান। তারপর চা করে দিচ্ছি। অফিসের কাজ তো রোজই আছে। অন্তরার বাপিও দিন-দিন কেমন কাজপাগল হয়ে যাচ্ছিল...আপনি যেন ওরকম হয়ে যাবেন না।'

আমি মিহিরদাকে বললাম, 'মিহিরদা, কাল খুব ভোরে একটা ফোন এসেছিল।'

মিহিরদার খাওয়া থেমে গেল।

আমি ফোনের কথাটা বললাম।

'...লোকটা ডায়েরিটা ফেরত চাইছিল। বলছিল, ডায়েরির লেখাগুলো যেন আমরা ভুলে যাই। যা গোপন থাকা উচিত তা নাকি গোপন রাখাই ভালো। ডায়েরিটা নিয়ে ওরা ডেস্ট্রয় করে ফেলবে। আমি বলেছিলাম, ওটা আমার বাবার স্মৃতি—ওই স্মৃতি আমরা রাখতে চাই। তার উত্তরে লোকটা বলেছে, ওই স্মৃতি রাখতে গেলে আমরাও স্মৃতি হয়ে যাব।'

আমার বুকের ভেতরে কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ পাচ্ছিলাম। যেন সমুদ্রের পাড়ে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। কিন্তু ভয় করছিল না মোটেই।

মিহিরদা আবার খাওয়া শুরু করলেন।

ঠিক তখনই বোধহয় বৃষ্টি শুরু হল। কারণ, পাশের একতলা বাড়িটার টিনের চালে বৃষ্টির বাজনা শুনতে পেলাম।

মিহিরদা কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, 'ডায়েরির ঘটনাগুলো ভুলে যাওয়ার জন্যে লোকটা আমাকেও রিকোয়েস্ট করেছিল। ওরা চায় না, ডায়েরির কথাগুলো চাউর হোক।'

'ওরা কারা?' প্রশ্নটা মা করল।

মিহিরদা হেসে বললেন, 'সেইটাই তো জানতে হবে, বউদি। চাঁদমনি গ্রামে যেতে হবে আমাদের।'

মা কোনও জবাব দিল না। চুপটি করে কী ভাবতে বসল।

বৃষ্টির শব্দ শুনতে-শুনতে আমি মিহিরদাকে জিগ্যেস করলাম, 'আমরা পারব তো, মিহিরদা?'

মিহিরদা একটুকরো চিলিচিকেন মুখে পুরে দিয়ে মামুলি সুরে বললেন, 'পারতেই হবে।' তারপর মাকে লক্ষ করে বললেন ঃ 'বউদি, অন্তরা রেঁধেছে কিন্তু দারুণ! এবার থেকে আপনাদের বাড়িতে একটু ঘন-ঘন আসতে হবে।'

এরপর আমরা সাধারণ সাত-পাঁচ কথায় মেতে গেলাম। মা মিহিরদার ছেলে-মেয়ে আর সংসারের খবর নিতে লাগল। ওদের পড়াশুনো কেমন চলছে, মিহিরদার স্ত্রীর আর্থারাইটিসের ব্যথা কেমন আছে, মিহিরদার যে মাইগ্রেনের সমস্যা ছিল সেটা কমেছে কি না—এইসব।

মা-কে স্বাভাবিক দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগছিল।

মোটামুটি আরও আধঘণ্টা পর মিহিরদা যখন চা-সিগারেট খেয়ে চলে গেলেন, ঠিক তখনই আবার ফোন বেজে উঠল।

আমি জলদি-পায়ে এসে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বললাম।

'অন্তরা মজুমদার, কেমন আছেন?' ভরাট গলায় কেউ প্রশ্ন করল। প্রশ্নের ঢং-টা এমন যেন আমি তার কতকালের চেনা।

'আপনি কে বলছেন?'

'নাম একটা বলতে পারি, কিন্তু সেটা জেনে আপনার কোনও লাভ হবে না।' ও-প্রান্তে লোকটি ছোট্ট করে হাসল ঃ 'কারণ, আমাকে আপনি চেনেন না। যদিও আপনাকে আমি চিনি...।'

আমি দম বন্ধ করে লোকটার কথা শুনছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লোকটা আবার কথা বলল ঃ 'আমি ওই ডায়েরিটার ব্যাপারে ফোন করেছিলাম...।'

'গতকাল ভোরবেলা আপনি ফোন করেছিলেন—।'

'না, আমি না—ওটা অন্য আর-একজন করেছিল।'

তার মানে? একটা ডায়েরির জন্যে নানান লোকে ফোন করছে। হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে, গতকালের লোকটার গলা একটু অন্যরকম ছিল।

'আপনি কী চান?' রুক্ষভাবে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলাম।

'আমি যা চাই তা তো আপনি ভালো করেই জানেন।' খুকখুক করে হাসল সে। তারপর হাসির জের টেনে বলল, 'গতকাল ভোরবেলাই তো আপনাকে সব খুলে বলা হয়েছে। ওই ডায়েরিটার কথা আপনাদের ভুলে যেতে হবে। আপনাদের বন্ধু মিহির গাঙ্গুলিকেও আমরা একই রিকোয়েস্ট করেছি।'

আমি কেমন একটা জেদের বশে বলে উঠলাম, 'ওই ডায়েরিটা তো জেরক্স করেও রাখা যায়...।'

'উঁহু, জেরক্স আপনি করবেন না, অন্তরা মজুমদার—কারণ, সেটা আমরা চাই না। আমরা না চাইলে এই ডায়েরিটার ব্যাপারে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।'

লোকটার স্পর্ধা আমাকে স্তম্ভিত করে দিল। একটা নিষ্ফলা রাগ মাথার ভেতরে টগবগ করে ফুটতে লাগল।

'ডায়েরিটা আমাদের...ওটা বাপির স্মৃতি...।'

ও-প্রান্তের লোকটা হেসে উঠে আমার কথা থামিয়ে দিল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, জানি। ওসব ভাবতে গেলে গতকাল ফোন করে যা বলা হয়েছে আপনারা

তাই হয়ে যাবেন। যাকগে ওসব অবান্তর কথা। শেষে শুধু মনে করিয়ে দিই, আপনাদের হাতে আর দেড়দিন আছে। শুভরাত্রি।'

ফোন রেখে দিল লোকটা।

মনে পড়ল, আগের লোকটা ফোন করে আমাকে তিনদিন সময় দিয়েছিল।

ভয়-টয় পাওয়ার বদলে রাগ হল আমার। কোথায় পুরুলিয়ার মাদিয়া—বাঘমুন্ডি—চাঁদমনি গ্রাম, আর কোথায় উত্তর কলকাতার এই ঘিঞ্জি পাড়া! যদি এতদূরে থাকা সত্ত্বেও কেউ আমাদের ভয় দেখায়, তা হলে কাছে গিয়ে ভয় পেতে দোষটা কোথায়!

ভীষণ রাগ হল—সেইসঙ্গে কৌতূহলও। একটা ডায়েরিকে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলার জন্যে এত মাথাব্যথা! ডায়েরির ঘটনা লোক-জানাজানি হলে কীসের ভয়? তা হলে ভয়-দেখানো ওই লোকগুলোও ভয় পায়! ভয় দেখানো যাদের নেশা কিংবা পেশা তারাও মাঝে-মাঝে ভুলে যায় যে, তারাও ভয়ের আওতার মধ্যেই আছে!

ভয় মানুষের মনের একটা আদিম অনুভূতি। এর এলাকা ছেড়ে কখনও বেরোনো যায় না। তুমি, আমি, সবাই সবসময় এর শাসনেই থাকি। শুধু তফাত হল এই, কেউ অল্পে ভয় পায়—কেউ বেশিতে।

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে আনমনা হয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম। বৃষ্টির জলে আমার সমস্ত ভয়ডর যেন ধুয়ে যাচ্ছিল। শুধু মনে হচ্ছিল, ভয়ের ব্যাপারে আমরা সবাই সমান। তা হলে আর ভয় কীসের! টেলিফোনের ও-প্রান্তের লোকটাকে এবার আমাদের ভয় দেখানোর পালা শুরু হোক।

পাশের ঘর থেকে মা 'অন্তু, অন্তু' বলে ডাকছিল। হঠাৎ সেই ডাকটা কানে যেতেই ঘোর কাটল। 'যাই' বলে সাড়া দিয়ে চলে এলাম মায়ের কাছে।

মা বিছানায় বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। আমাকে দেখেই জিগ্যেস করল, 'কার ফোন?'

আমি ঠোঁট বেঁকিয়ে জবাব দিলাম, 'ওই একই টাইপের ফোন। ডায়েরির কথা কাউকে জানানো চলবে না।'

'কী হবে তা হলে?'

আমি বেপরোয়া ভঙ্গিতে জবাব দিলাম, 'ওরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে "সুপ্রভাত"-এ ডায়েরির লেখাটা ছাপিয়ে দেব।'

উত্তরটা শুনে মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নতুন চোখে আমাকে দেখল। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, 'তোর বাপি হলেও তাই করত।'

সেই মুহূর্তে মাকে আমার জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করছিল। আমার

সঙ্গে বাপির তুলনা! এই সার্টিফিকেটের কোনও জবাব নেই।

ঠিক করলাম, আবার যদি হুমকি দিয়ে ফোন আসে তা হলে আমিও ডায়েরিটা ছাপিয়ে দেওয়ার পালটা হুমকি দেব। তবে আমরা যে পুরুলিয়া গিয়ে খোঁজখবরের মতলব এঁটেছি সেটা জানাব না।

রাত দশটার সময় তিন নম্বর হুমকি দেওয়া ফোনটা এল।

এবারে এক মহিলার কণ্ঠস্বর। নতুন বলতে শুধু এইটুকুই। বোঝা গেল, ভয় দেখানোর যে-পাঠশালা এরা খুলেছে সেটা কো-এডুকেশান।

মহিলা আমাকে জানাল যে, সময় ছত্তিরিশ ঘণ্টার থেকে আরও কমে গেছে। আমার কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না? এইরকম বোকা-বোকা জেদের কোনও মানে হয় না। কারণ, এই জেদের জন্যেই সুরঞ্জন মজুমদার অকালে মারা গেছে।

আমি মহিলাকে গোল্লায় যেতে বললাম এবং অনুরোধ করলাম সেখান থেকে ও যেন আর না ফিরে আসে। তারপর জানালাম, বাপির ডায়েরিটা আমি 'সুপ্রভাত' কাগজে ছাপাচ্ছি।

মহিলা থমকে গেল। ওর শ্বাস টানার শব্দ পেলাম। বুঝলাম, ওদের ভয় দেখানোর এক্কাগাড়ি ধাক্কা খেয়েছে।

একটু পরে ও বলল, 'এই কাজ যদি আপনি করেন তা হলে তো আপনার মা-কেও বাঁচানো যাবে না। এ পর্যন্ত আমরা শুধু আপনার কথাই ভাবছিলাম। এখন দেখছি আপনার সঙ্গে আপনার মা-কেও উৎসর্গ করতে হবে।'

তারপর ফোন কেটে দিল।

আমার কপালে ঘাম জমেছে টের পেলাম। হাতের পিঠ দিয়ে ঘাম মুছে নিলাম। উৎসর্গ? খতম করে দেওয়াটাকেই কি ব্যঙ্গ করে মহিলাটি উৎসর্গ বলল? না, ওর কথার সুর তো বেশ সিরিয়াসই ছিল। তা হলে উৎসর্গ বলতে কী বলতে চাইল?

আরও একটা কথা আমাকে ভাবিয়ে তুলল ঃ ওরা কতজন? ওরা আমার বা মিহিরদার ফোন নাম্বার পেল কীভাবে?

এইসব দুশ্চিন্তা নিয়ে রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকল। তারপর সবে শুতে যাচ্ছি, আবার ফোন।

আমি দুমদুম করে পা ফেলে টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুললাম। তারপর আগুনঝরা গলায় বলে উঠলাম, 'আপনাদের কাউকে আমি ভয় পাই না। বাপির ডায়েরিটা আমি কাগজে ছাপাবই। আমি...।'

'হাই, অন্তরা, হোয়াট্স আপ? কাকে ভয় পাস না? কী পাবলিশ করবি?' ঝিমলি।

কিন্তু এত রাতে ও ফোন করেছে কেন?

॥ সাত ॥

ঝিমলির সঙ্গে রাস্তায় বেরোনো একটা অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার সঙ্গে বাড়তি আরও যে-অভিজ্ঞতাটুকু হল তার জন্যে আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, খুব ধীরে-ধীরে আমি যেন একটা লম্বা টানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ছি। অন্ধকার টানেলটার শেষ প্রান্তে কী আছে জানি না। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারছি কে যেন আমাকে টানছে। টানেলটা ঠিক যেন কোল্ড ড্রিঙ্ক-এর বোতলের স্ট্র—যেমন করে আমরা স্ট্র-তে টান দিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্ক খাই, ঠিক তেমন করেই কেউ আমাকে টানছে। আর ইচ্ছে না থাকলেও আমি সেই টানে একটু-একটু করে এগিয়ে যাচ্ছি।

যে-অভিজ্ঞতা নিয়ে রাতে বাড়ি ফিরলাম সেটা কিছুতেই মাকে বলা যাবে না—কারণ, মা বিশ্বাস করতে পারবে না। ভাববে আমি বানিয়ে একটা গল্প ফেঁদেছি।

অথচ বাপির ডায়েরির কথা মা বিশ্বাস করেছে।

সেটা হয়তো এইজন্যে যে, ডায়েরিটা বাপি এমন এক সময়ে লিখেছিল যখন কেউ মিথ্যে কথা লেখে না—অনেকটা ডাইং ডিক্লেয়ারেশানের মতন। কিন্তু তাই বলে কি আমার ঘটনাটা মিথ্যে!

গতকাল রাতে ঝিমলির ফোন থেকে জানতে পেরেছি ওর এখন এম. সি. এ.-র ফোর্থ সেমেস্টার চলছে। তার জন্যে কী একটা ঘ্যাম প্রজেক্ট করছে। সেটা লিখে কম্পিউটারে টাইপ করে ঝিন্‌চ্যাক স্টাইলে ভালো করে ছাপিয়ে বাঁধিয়ে জমা দিতে হবে। তাই কাল সন্ধেবেলা ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে চায়।

রাত দশটায় আমাকে ও ফোন করেছে এইসব কথা বলার জন্যে। আর আমি ওকে ভয়-দেখানো কোম্পানির কর্মচারী ভেবে কী-না-কী বলে বসেছি। ফলে বেফাঁস কথার মাশুল আমাকে দিতে হয়েছে তৎক্ষণাৎ। শুরু হয়ে গেছে ঝিমলির নাছোড়বান্দা কোশ্চেনমালা।

টেলিফোনে সংক্ষেপে ওকে সামাল দিলাম। কিন্তু আমি জানি ওর সঙ্গে দেখা হলেই আমাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব খোলসা করে বলতে হবে—নইলে ঝিমলি কিছুতেই ছাড়বে না। আগের জন্মে ও নিশ্চয়ই জোঁক ছিল। শুধু জোঁক নয়, ছিনে জোঁক।

পরদিন সন্ধেবেলা ঝিমলি চলে এল আমাদের বাড়িতে। এসেই শুরু হয়ে গেল ওর স্টাইলে কুশল বিনিময়।

ঝিমলি ভীষণ রোগা—ইংরেজিতে এটাকে নাকি স্লিম বলে। তার ওপর ও মাথায় আমার চেয়ে লম্বা। ফলে বেশ চোখে পড়ার মতো। ওর মুখটা ছোট্ট, পানপাতার মতো—দারুণ মিষ্টি। আর যে-রঙেরই ড্রেস পরুক না কেন ওর ফরসা

রঙের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে যায়।

বাটিক প্রিন্টের চুড়িদার এবং কাঁধে একই ঢঙের ঝোলাব্যাগ। কানে পোড়ামাটির দুল, নাকে সরষেদানার মতো একটা চকচকে পাথর—নাকছাবি। আর এই সামান্য সাজগোজের সঙ্গে সবচেয়ে দামি যে-জিনিসটা ওকে দারুণ করে তুলেছে সেটা ওর টগবগে প্রাণ। ওর বোধহয় কখনও মনখারাপ হয় না।

'হাই, আন্টি, কেমন আছ?' সটান রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে মাকে প্রশ্নটা করেছে ঝিমলি।

মা ওকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'আমি তোর মতো অত হাই-টাই তুলতে পারব না—বড্ড ঘুম পেয়ে যাবে। তারচেয়ে তুই কেমন আছিস বল?'

'ফাইন। এখন তোমার হাতে এককাপ টি কিংবা কফি খেয়ে আমি আর অন্তরা রোমিং-এ বেরোব। আমার এম. সি. এ.-র একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট কম্পিউটারে বেশ ভালো করে টাইপ করিয়ে প্রিন্ট করতে হবে। একেবারে মালটিকালার। দেখতে যেন হেভি হয়। আমরা সেরকম একটা সুটেবল কম্পি সেন্টার খুঁজতে বেরোব।'

আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ঝিমলি বলল, 'রাইটার অন্তরা, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। সঙ্গে ছাতা নিস...সফ্‌ট বৃষ্টি পড়ছে।'

সফ্‌ট বৃষ্টি! শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। বুঝলাম, জুতসই বাংলা শব্দটা ও খুঁজে পায়নি। তাই ওকে মাস্টারি ঢঙে বললাম, 'সফ্‌ট নয় রে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি।'

'ঝি-র-ঝি-রে!' ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করল ঝিমলি, 'ওয়ার্ডটা একটু আনকমন লাগছে।'

'তাই? তা হলে এর অলটারনেটিভ আর একটা শব্দ জেনে রাখ—এটা আরও আনকমন, তবে ডিকশনারিতে আছে।'

'কী শুনি...।'

'ঝিমকিনি।'

শব্দটা শোনার পর ওর মুখের চেহারাটা যা হল তা দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল।

চা শেষ করে আমাকে প্রবল তাড়া লাগিয়ে রাস্তায় বের করল ঝিমলি। সত্যিই ঝিমকিনি তখনও চলছে।

আমরা একটা ট্রামে উঠে পড়লাম। ফাঁকা ট্রাম। তাই পাশাপাশি বসে গল্প করতে-করতে দিব্যি খোশমেজাজে পথ পেরোতে লাগলাম।

ঝিমলি খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে আমার কাছ থেকে বাপির গোটা গল্পটা জেনে নিল। তারপর টেলিফোনের হুমকি নিয়ে রাশি-রাশি প্রশ্ন করে চলল।

একসময় আমি হেসে বললাম, 'তুই আগের জন্মে ছিনে জোঁক ছিলি।'

ও চোখ কপালে তুলে বলল, 'ছিনে মানে?'

এই রে! আবার আনকমন শব্দ!

ওকে বললাম যে, ছিনে মানে সরু।

শুনে ও হাসল : 'সরু! ঠিকই বলেছিস—আমি তো সরুই। তবে তোর মতো উইক না। কলেজে পাঞ্জা লড়ার কেস মনে আছে!'

মনে থাকবে না আবার! ঝিমলির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে কোনও মেয়ে পারত না। এমনকী দু-চারজন ছেলেও হেরে ভূত হয়েছিল। তখন কলেজে ওর ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল 'পাঞ্জাবি'।

হঠাৎই ঝিমলি বলে উঠল, 'তোর তা হলে দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে। হেভি থ্রিলিং। একে তো সুপারন্যাচারাল সব ব্যাপার-স্যাপার—তার সঙ্গে হরার। ওঃ, অন্তরা, তোকে আমার হিংসে হচ্ছে।'

'তুই তা হলে আমাদের সঙ্গে চল—মাত্র তো সাত-দশদিনের ব্যাপার। তোর প্রজেক্ট ছাপা-বাঁধাই হতে-হতে তুই ফিরে আসবি। তোর পড়াশোনার খুব একটা ক্ষতি হবে না। কী বলিস?'

কেন যে কথাগুলো বললাম জানি না। বোধহয় ঝিমলির মতো প্রাণবন্ত সাহসী কাউকে আমি পাশে চাইছিলাম।

আমার কথায় ঝিমলি চোখ বড়-বড় করে কয়েকপলক আমার চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর আমার পিঠে এক চাপড় কষিয়ে দিয়ে হইহই করে বলে উঠল, 'য়্যু আর গ্রেট, অন্তরা। আসলে ব্যাপারটা তোর পার্সোনাল বলে আমি ঠিক ইনট্রুড করতে চাইনি। আরে তুই আর আমি একসঙ্গে থাকলে অ্যাডভেঞ্চারটা আরও জমবে। লাইক কলেজ ডেজ। আর তোর ওই মিহিরদা, মানে মিহির আঙ্কল, উনি হচ্ছেন লাইক আমাদের পি. বি.—মানে, আমাদের ইলেকট্রনিক্সের স্যার...ওই যে, আমাদের টুরে নিয়ে গিয়েছিলেন...মনে নেই?'

মনে নেই আবার! 'পুরানো সেই দিনের কথা' কি সহজে ভোলা যায়!

তো এইরকম এলোমেলো কথা বলতে-বলতে কখন যেন কলেজ স্ট্রিট পাড়া চলে এসেছে। ঝিমলি সেটা খেয়াল করে আমার হাত ধরে টান মারল : 'চল, চল, এসে গেছে...কুইক!'

ট্রাম থেকে আমরা নেমে পড়লাম।

এর মধ্যে বৃষ্টির তেজ বেশ বেড়েছে। ফলে আমাদের দুজনকেই ছাতা খুলতে হল।

ট্রাম-রাস্তায় গাড়ি আর লোকজনের বেশ ভিড়। তা ছাড়া, রাস্তার অবস্থা

হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের বেওয়ারিশ রুগির মতন। ক্ষতবিক্ষত শরীরে অবহেলায় পড়ে আছে—দেখার কেউ নেই। রাস্তার যেখানে-সেখানে মিনিপুকুর তৈরি হয়ে গেছে। শুধু ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে না এই যা!

আমি সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছিলাম। লক্ষ করলাম, ঝিমলির সেসব ভ্রূক্ষেপ নেই। সহজ স্বাভাবিক ছন্দে পা চালিয়ে ও ডি. টি. পি.-র দোকান খুঁজতে লাগল।

এইরকম খোঁজাখুঁজির পালা যখন চলছে তখন একটা লোককে আমি হঠাৎই খেয়াল করলাম। হয়তো লোকটা আমার চোখেই পড়ত না, যদি না আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ামাত্রই সে একটা দোকানের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করত।

কোথায় যেন লোকটাকে দেখেছি!

নাঃ, অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না।

লোকটার মুখ লম্বাটে, ফ্যাকাসে। গাল ভাঙা। কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ। গায়ে গাঢ় সবুজ রঙের ফুলহাতা শার্ট, আর পায়ে কালো প্যান্ট। বয়েস কত আর, পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ।

কিন্তু লোকটার চোখদুটো ভারী অদ্ভুত। লম্বা টানা-টানা—তাতে কেমন একটা ঘুম-ঘুম ভাব।

একটা দোকানে ঝিমলি কথা বলছিল। ঝোলা-ব্যাগ থেকে একগাদা কাগজপত্র বের করে মালিককে বোঝাচ্ছিল, কীভাবে টাইপ করতে হবে, কীভাবে ছবি আঁকতে হবে। তারপর জিগ্যেস করছিল, কত খরচ পড়বে।

আমি ঝিমলির ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে নজর করছিলাম। তখনই হঠাৎ মনে পড়ল লোকটাকে আমি কোথায় দেখেছি।

গত শুক্রবার 'ব্যারন' রেস্তরাঁ থেকে যখন আমি আর মিহিরদা বেরিয়ে আসছিলাম তখন এই লোকটাকে আমি ফুটপাথের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। লোকটাকে আরও মনে আছে এই কারণে যে, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও সে বৃষ্টিকে আমল না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভিজছিল।

লোকটা কি তা হলে আমাকে ফলো করছে?

ঝিমলি তখনও ওর প্রজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি ওকে লোকটার কথা বলতে গিয়েও বললাম না। ও যে-টাইপের মেয়ে তাতে হুট করে হয়তো লোকটার মুখোমুখি হাজির হয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। লোকটাও অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎই খেয়াল করলাম, আমি কখন যেন দাঁত দিয়ে নখ কাটতে শুরু করেছি।

কিন্তু মিনিট-পনেরো পর ঝিমলি যখন কাজ সেরে ফ্রি হল তখন তাকিয়ে দেখি লোকটা নেই।

ঝিমলি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী করছিস...কাউকে খুঁজছিস?'

আমি মাথা নাড়লাম : 'না।'

'তা হলে চল, কফিহাউসে গিয়ে একটু বসি। আই নিড আ বাইট। তোর খিদে পাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছে—।'

'তা হলে চল।'

আবার ছাতা মাথায় পথ চলা।

রাস্তার ধারে পরোটা-আলুর দমের দোকান, রাস্তায় পেতে রাখা বেঞ্চিতে বসে লোকেরা খাচ্ছে, তার পাশেই রাজ্যের আবর্জনা, গা-ঘেঁষে দিয়ে চলে যাচ্ছে সাইকেল ভ্যান, বইয়ের প্যাকেট মাথায় ছুটন্ত মুটে। বেশ কসরত করে সাইকেল চালিয়ে দুজন লোক আমাদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। ছোট্ট একটা ওষুধের দোকানে খদ্দের-ঠাসা ভিড়। ব্যস্ত লোকজনের যাতায়াত। তবে সবকিছুর ওপরে বৃষ্টি একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

সাবধানে পা ফেলে-ফেলে বইপাড়ার ভিড় বাঁচিয়ে অবশেষে কফিহাউসে পৌঁছনো গেল। কলেজে পড়ার সময় আমি আর ঝিমলি এখানে বহুবার এসেছি। তারপর আমি আজ প্রথম এলাম। ঝিমলি হয়তো আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ করেনি।

আজ কফিহাউসে বেশি ভিড় নেই। তাই ঢুকে আমাদের পুরোনো বসার জায়গাটার দিকে তাকালাম। বাঁ-দিকের শেষ প্রান্তের কোনার টেবিলটা আমাদের বরাবরের পছন্দ ছিল। দেখলাম টেবিলটা খালি। আমি আর ঝিমলি চটপট পা চালিয়ে টেবিলের কাছে পৌঁছে গেলাম।

মুখ দিয়ে হাঁপ ছাড়ার একটা শব্দ করল ঝিমলি। তারপর 'ছু-ছু' শব্দ করে একজন বেয়ারার নজর কাড়ল—তাকে ডাকল ইশারায়।

ছেলেটি কাছে এল। মুখটা চেনা মনে হল। ওর পোশাক ঝকঝকে তকতকে—মাথায় ঝুঁটিওয়ালা পাগড়ি, গায়ে সাদা কোটের মতো উর্দি, আর মুখে সরল হাসি।

ঝিমলি যেন কলেজ-জীবনটাই কন্‌টিনিউ করছে এই ঢঙে হাত-মুখ নেড়ে দু-প্লেট পকোড়া আর দুটো ইনফিউশান অর্ডার দিল। ইতিমধ্যে নেহরু-টুপি পরা আর-একটি জল-বেয়ারা এসে দু-গ্লাস জল রেখে দিল টেবিলে।

বেয়ারা দুজন চলে যেতেই আমি কফিহাউসটাকে জরিপ করতে লাগলাম। এখন সন্ধেবেলা—তাই কলেজের ছেলেমেয়েদের ভিড় নেই। এইসময়টা যাঁরা আসেন

তাঁরা কোনও-না-কোনওভাবে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে। আমিও জড়িয়ে, তবে গল্প-উপন্যাসের পাঠক হিসেবে। আর ঝিমলি? ও খুব সিনেমা দ্যাখে।

হঠাৎই মনে পড়ল, আরে, শুধু পাঠক কেন, আমি তো একটু-আধটু লেখালিখিও করি! পরিভাষায় যাকে বলে বুদ্ধিজীবী।

এ-কথা ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল আমার। মন এমনই জিনিস! এলোমেলো ভাবতে-ভাবতে কখন যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়!

আমাকে হাসতে দেখে ঝিমলি জিগ্যেস করল, 'কীরে, কী কেস?'

আমি বলতে যাব, তখনই দেখি সেই লোকটা। কফিহাউসের দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে।

না, দেখতে আমার ভুল হয়নি। আর লোকটা যে আমাদের টেবিল লক্ষ করেই এগিয়ে আসছে, সেটাও আমার দেখার ভুল নয়।

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। এই লোকটার উদ্দেশ্য কী? লোকটা কি আমাকে গত ক'দিন ধরেই একটানা ফলো করছে?

আর উপায় না দেখে ঝিমলিকে চাপা গলায় বললাম, 'দেখ, ওই লোকটা...আমাকে মনে হয় ক'দিন ধরে ফলো করছে।'

ঝিমলি সঙ্গে-সঙ্গে দেখল লোকটাকে। তখন সে গোটাতিনেক টেবিলের দূরত্বে—পথে ছড়িয়ে থাকা চেয়ার সরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ঝিমলি লোকটার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই আমার উরুতে হাতের চাপ দিল ঃ 'ডোন্ট উয়ারি, ডিয়ার। এ মনে হয় গায়ে পড়া পাবলিক—তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। দাঁড়া, আসুক, ওকে কফি অফার করে গোটা বিলটা ওকে দিয়েই পেমেন্ট করিয়ে দেব।' বলেই খিলখিল হাসিতে প্রায় গড়িয়ে পড়ল ঝিমলি।

সত্যি, ও পারে বটে!

ততক্ষণে লোকটা আমাদের কাছে এসে পড়েছে। একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসেও পড়েছে তাতে। তারপর ভরাট গলায় সহজ সুরে বলেছে, 'আপনাদের রসিকতাটা শেয়ার করতে পারি, ম্যাডাম?'

লোকটার জামা-প্যান্ট বৃষ্টিতে ভেজা। কিন্তু সে নিয়ে ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং কথা বলার ঢংটা এমন সপ্রতিভ যেন কতদিনের চেনা।

এখন কাছ থেকে ওকে দেখলাম ঃ মুখে কয়েকটা ব্রণর দাগ আর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দেখে বদমাইশগোছের লোক বলে মনে হয় না। টেলিফোনে এর মতন কোনও গলা আমাকে হুমকি দিয়েছিল কি না সেটা মনে করার চেষ্টা করলাম।

ঝিমলি দেখলাম কম যায় না! ও বলল, 'আপনার মতো একজন আননোন লোকের সঙ্গে জোক শেয়ার করতে যাব কেন?'

হাসল লোকটা। দুটো হাত রাখল টেবিলের ওপরে। মোটা-মোটা হাতের আঙুল। আঙুলে দু-হাত মিলিয়ে মোট চারটে রঙিন পাথর—তবে কোনওটাই আমার চেনা জ্যোতিষ-পাথর নয়।

'ম্যাডাম, জোক ছাড়া অন্য আর কী আপনি আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন? হয়তো কিছুই না। সেইজন্যেই শুধু জোকটা শেয়ার করার কথা বলেছি।'

'আপনি কফি খাবেন?'

ঝিমলির প্রশ্নটা শুনেই আমার হাসি পেয়ে গেল। এটা ওর বিল পেমেন্ট প্রজেক্টের প্রথম ধাপ।

'শুধু যে কফি খাব তা নয়...' হাসল লোকটি : 'আপনাদের কফি, পকোড়া, সবকিছুর বিলও মিটিয়ে যাব।'

আমার হাসি থেমে গেল। লোকটা কি টেলিপ্যাথি জানে? ও কী করে জানল আমরা একটু আগে কী-কী অর্ডার দিয়েছি!

আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে ঝিমলি লোকটাকে আমার মনের কথাটাই জিগ্যেস করল, 'আপনি কি টেলিপ্যাথি জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি।' চোয়ালে হাত ঘষল লোকটা। তারপর বলল, 'শুধু টেলিপ্যাথি কেন, আরও অনেক কিছু জানি। যেমন, আপনার নাম ঝিমলি সরকার, আর আপনার বন্ধুর নাম অন্তরা মজুমদার...।'

আমি কেঁপে উঠলাম। লোকটা পুলিশের লোক নয় তো!

ঝিমলির নার্ভ বেশ শক্ত। ও ব্যাপারটা দিব্যি হজম করে নিয়ে **হেসে বলল,** 'আমাদের নাম যখন জানেন তখন আপনার নামটা বলুন—।'

'আমার নাম স্বর্ণভূষণ তরফদার...।'

নামটা শুনেই ঝিমলি আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসতে-হাসতে ওর চোখে জল এসে গেল। হাসির দমক কমে এলে ও হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'হাউ ফানি নেম! এরকম রিডিকিউলাস নাম কখনও শুনিনি...আপনি তো বেশ মজার লোক!'

স্বর্ণভূষণ খুব সিরিয়াস গলায় বলল, 'আপনি কখনও শোনেননি বলে সে-নাম কারও হতে পারে না? আপনি যা দেখেননি সেসবের তা হলে কোনও অস্তিত্ব নেই?'

'কী জানি বাবা!' বলে ঝিমলি প্রশ্ন দুটোর পাশ কাটিয়ে আমাদের টেবিলের বেয়ারাটিকে ইশারায় ডাকল। এককাপ হট কফি দিতে বলল।

স্বর্ণভূষণ এবার আমার দিকে তাকাল। ওর টানা-টানা চোখে কেমন এক ঠান্ডা দৃষ্টি। অনেকটা সেই ধরনের গলায় ও জিগ্যেস করল, 'আপনার বাপির ডায়েরিটা আপনি তা হলে আমাদের ফেরত দেবেন না!'

চোখের পলকে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। একটা শিরশিরে ভয় ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। তারপরই সেটা একটা অদ্ভুত জ্বালার চেহারা নিল। মনে হল, আমার ভেতরে যেন একটা ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। আমার মুখে নিশ্চয়ই একরাশ রক্ত ছুটে এসেছে।

এতদিনে ওদের কাউকে মুখোমুখি পাওয়া গেল!

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ঝিমলি আমার উরু খামচে ধরল। তারপর স্বর্ণভূষণের দিকে অপলকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কথাটা ফ্ল্যাট স্টেটমেন্ট নাকি কোশ্চেন? অর ইজ ইট আ হরিব্‌ল জোক...।'

'সে আপনারা যা মনে করেন,' স্বর্ণভূষণ ঠোঁট বেঁকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বাট আই অ্যাম সিরিয়াস।'

বেয়ারা এসে পকোড়া-কফি রেখে গেল আমাদের সামনে। ঝিমলি স্বর্ণভূষণকে খাওয়ার জন্যে ইশারা করল। লক্ষ করলাম, ঝিমলি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলেও ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আমি তখন বললাম, 'আপনার কি কখনও মনে হয়েছে যে, আমরা সিরিয়াস নই?'

হাসল স্বর্ণভূষণ। হতাশায় মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। ভাবটা এইরকম ঃ অবুঝ একজোড়া মেয়েকে বোঝানো যে কী কষ্ট! তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আপনারা যা কখনও শোনেননি তা অসম্ভব না-ও হতে পারে। আপনারা যা কখনও দেখেননি, তা...।'

আচমকা কথা থামিয়ে স্বর্ণভূষণ ওর ডানহাতটা আমাদের সামনে টেবিলের ওপরে রাখল। ছোট্ট করে বলল, 'এই দেখুন...।'

দেখলাম, ওর হাতটা যেন কাচের তৈরি। কারণ, হাতের পাঞ্জা ভেদ করে টেবিলটা দেখা যাচ্ছে। আর একটা সবুজ আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে ওর চকচকে হাত থেকে।

আরও লক্ষ করলাম, হাতটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে—ঠান্ডা বরফের চাঁই থেকে যেমন বেরোয়।

স্বর্ণভূষণ হাতটা শূন্যে তুলে তর্জনীটা ডুবিয়ে দিল জল ভরতি একটা গ্লাসে। সঙ্গে-সঙ্গে 'ক্র্যাক' করে কাচ ফেটে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। কারণ, চোখের পলকে গ্লাসের জলটা জমে বরফ হয়ে গেছে এবং গ্লাসটা ফেটে গেছে।

গ্লাসের কাচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ল টেবিলে। আর গ্লাসের ছাঁচে তৈরি হয়ে যাওয়া বরফের ডেলাটা ওলটানো কাঠি-আইসক্রিমের মতো স্বর্ণভূষণের আঙুলে ঝুলে রইল।

স্বর্ণভূষণ আঙুলসমেত বরফের ডেলাটা শূন্যে তুলল। তারপর আঙুলটা বাঁকিয়ে দুবার নাড়াতেই ওটা কাত হয়ে পড়ে গেল টেবিলে। তারপর মালাইবরফের ঢঙে এপাশ-ওপাশ গড়াতে লাগল।

গ্লাস ভাঙার শব্দে আশপাশের টেবিল থেকে সবাই আমাদের টেবিলের দিকে তাকিয়েছে। আর স্বর্ণভূষণ পলকে নিজের হাতটাকে আবার স্বাভাবিক করে নিয়েছে।

ঝিমলির মুখ সাদা হয়ে গেছে। হয়তো আমার মুখও তাই। একটা ভয়ের চিৎকার আমার গলার কাছে এসে আটকে গেল। আমি সম্মোহিতের মতো বরফের সিলিন্ডারটাকে দেখতে লাগলাম।

না, এরকম কোনও ঘটনা বাপির ডায়েরিতে লেখা ছিল না।

স্বর্ণভূষণ হঠাৎই সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওর দিক থেকে একটা হিমবাতাসের ঝাপটা ছুটে এল আমার দিকে।

'মিস মজুমদার,' স্বর্ণভূষণ বেশ চাপা গলায় বলল, 'এটাই আপনাকে লাস্ট ওয়ার্নিং। আমরা অনেক কিছু পারি যা আপনি আগে কখনও দেখেননি বা শোনেননি...।'

আমি ওর ডানহাতের পাতার দিকে তাকালাম। একটু আগের ম্যাজিক আর সেখানে নেই। মনেই হয় না, একটু আগে এই হাতটা কীরকম অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিল।

ঝিমলি অবাক হয়ে বরফের ডেলাটাকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখছিল। ওর চোখ-মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, চোখের সামনে ও এক্ষুনি যা দেখল তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমাদের কাছ থেকে একটা টেবিল পরে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ঘন হয়ে বসে গল্প করছিল। গ্লাস ফেটে যাওয়ার শব্দে ছেলেটি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে একপলক তাকিয়ে ছিল। এখনও দেখছি কৌতূহলে তাকিয়ে আছে।

বরফটা ধীরে-ধীরে গলে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে ঝিমলি বিড়বিড় করে বলল, 'ম্যাজিক...।'

স্বর্ণভূষণ আচমকা ঝুঁকে পড়ে ঝিমলির ডানহাতের কবজি চেপে ধরল, বলল, 'ম্যাজিক নয়—ব্ল্যাক ম্যাজিক।'

সঙ্গে-সঙ্গে একঝটকায় কবজিটা ছাড়িয়ে নিল ঝিমলি—যেন হঠাৎই ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। তাকিয়ে দেখি ওর কবজিতে কেমন অদ্ভুত এক কালশিটে পড়ে গেছে।

স্বর্ণভূষণ ঝিমলির হাত ছেড়ে দিয়ে হনহন করে হাঁটা দিল কফিহাউসের দরজার দিকে।

যন্ত্রণায় ঝিমলির মুখ কুঁচকে গিয়েছিল। ডানহাতের কবজিটা চেপে ধরে ও বলে উঠল, 'উঃ! লোকটার হাতটা কী ঠান্ডা!'

আমার ভেতরের জ্বালাটা গলা পর্যন্ত উঠে এল, টগবগ করে ফুটতে লাগল। মনে-মনে বললাম, তোমাদের আরও ব্ল্যাক ম্যাজিক আমি দেখতে চাই।

॥ আট ॥

ঘরের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল—মাঝে-মাঝে আবার কড়াও নাড়ছিল।

ঘুমের গভীর থেকে আমি ভাসতে-ভাসতে ওপরে উঠে আসছিলাম। বাপি আর মা-কে নিয়ে কী একটা যেন স্বপ্ন দেখছিলাম, কিন্তু সেটা ঠিক মনে করতে পারলাম না। স্বপ্নটা কেমন যেন লুকোচুরি খেলে পিছলে পালিয়ে গেল।

ঘুম-জড়ানো গলায় ডেকে উঠলাম, 'কে?'

'আমি—উঠে পড়ো—এরপর বেরোলে দেরি হয়ে যাবে।'

বন্ধ দরজার ওপাশে মিহিরদার গলা।

সঙ্গে-সঙ্গে এক ঝটকায় মনে পড়ে গেল, আমরা এখন পুরুলিয়ায়—'পথিক' হোটেলের মলিন বিছানায় শুয়ে আছি।

'মলিন' শব্দটা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল আজ বিকেলে আমাদের মলিন সামন্তের খোঁজে চাঁদমণি গ্রামে যাওয়ার কথা।

আশ্চর্য! গোটা ব্যাপারটা যেন শব্দ দিয়ে তৈরি এক চেইন রিয়্যাকশন!

'যাচ্ছি, মিহিরদা!' বলে সাড়া দিলাম আমি। চোখে আঙুল ঘষতে-ঘষতে উঠে বসলাম বিছানায়। তারপর হাত বাড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা ঝিমলিকে ধাক্কা মারলাম ঃ 'অ্যাই ঝিমলি, ওঠ-ওঠ...।'

বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়ির দিকে তাকালাম ঃ সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

ঝিমলিকে আরও কয়েকবার ধাক্কা মেরে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম। ঘরের এককোণে দাঁড় করানো জোড়াতালি দেওয়া একটা টেবিলের কাছে গেলাম। টেবিলে হালকা লাল রঙের একটা পলিথিনের জগে জল রাখা ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ঘরের একমাত্র জানলার কাছে গেলাম। চোখে-মুখে সামান্য জল ছিটিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম।

জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল—মেঘলা আকাশ। সেই ছাইরঙা পটভূমিতে কয়েকটা শাল, মহুয়া আর আকাশমণি গাছ। হাওয়ায় গাছের পাতা দুলছে। পাতার

আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা পাখি গলা ফাটিয়ে ডাকছে—কুবো, নাকি মোহনচূড়া? কে জানে!

জগটা টেবিলে রাখতে গিয়ে দেখি কখন উঠে পড়েছে ঝিমলি, এবং একলাফে নেমে পড়েছে বিছানা থেকে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই ও আঁতকে উঠেছে : 'ও মাই গড! দেরি হয়ে গেছে—চারটের সময়ে আমাদের বেরোনোর কথা না? ওঃ অন্তরা, গেট রেডি, ফটাফট!'

আমার তৈরি হতে লাগল সাতমিনিট—আর ঝিমলির দু-মিনিট।

আমি ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে-দিতে বললাম, 'তুই কী করে এত সুইফ্‌ট হলি বল তো?'

ও দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো একটা ফাটল ধরা আয়নায় নজর রেখে কপালে বিন্দির টিপ বসাচ্ছিল, আমার দিকে না তাকিয়ে হেসে জবাব দিল, 'এটা ছিনে—আই মিন সরু এবং লম্বা হওয়ার অ্যাডভানটেজ। নোবডি ক্যান বিট মি।'

তৈরি হয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম দোতলার জীর্ণ বারান্দায়। মিহিরদার চারনম্বর ঘরের দরজায় টোকা দিতে যাওয়ার আগেই মিহিরদা ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে এলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'চলো, চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে...।'

আকাশের আলো নিভতে এখনও অনেক দেরি, অথচ 'পথিক' হোটেলে অন্ধকার ঢুকে পড়েছে। সেটা বেশি করে বোঝা গেল এবড়োখেবড়ো সিঁড়ি ধরে নামার সময়। দুপাশের নোনা-ধরা দেওয়াল সেই অন্ধকারকে গাঢ় করে তার সঙ্গে কেমন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ মিশিয়ে দিয়েছে।

কাউন্টারে ম্যানেজার-কাম-মালিক সুখেন্দু পাল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। ডানহাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। মাথার কাছে ঝুলন্ত বাল্‌বটা এখনও জ্বালানো হয়নি। তবে পেছনদিকের একটা খোলা জানলা দিয়ে মরা আলো ঢুকে পড়েছে।

আমাদের দেখেই সুখেন্দু পাল হাসল। সিগারেটে একটা মরণটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল বহুক্ষণ ধরে। তারপর বলল, 'পাঁচনম্বর রুমে ম্যাডামদের কোনওরকম কষ্ট হচ্ছে না তো?'

ঝিমলি আর মিহিরদা যে সঙ্গে-সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছেন সেটা আমি ওদের দিকে সরাসরি না তাকিয়েও টের পেলাম।

কারণ, পাঁচনম্বর ঘরে বাপি ছিল।

মিহিরদা আর ঝিমলি পাঁচনম্বর ঘরে থাকতে আমাকে বারণ করেছিল। মিহিরদার ইচ্ছে ছিল, আমি আর ঝিমলি চারনম্বর ঘরে থাকি, আর মিহিরদা

পাঁচনম্বরে। কিন্তু আমি আপত্তি করেছি।

ট্রেনে আসার সময়েই আমি মিহিরদার কাছে জেদ ধরেছি যে, আমরা বাঘমুন্ডিতে গিয়ে 'পথিক' হোটেলেই উঠব। আর যদি খালি পাই তা হলে আমি আর ঝিমলি পাঁচনম্বর ঘরেই থাকব।

মিহিরদা বারকয়েক মিনমিনে আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, হোটেলটা খুব বাজে, নোংরা, আমাদের থাকতে কষ্ট হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার জেদের কাছে এঁটে উঠতে পারেননি। আমি আসলে বাপির শেষ সময়ের মনের অবস্থাটা অনুভব করতে চাইছিলাম।

অবশেষে মিহিরদা লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে বলেছেন, 'অন্তরা, তোমার বাপিরও এইরকম জেদ ছিল...কিছুতেই কাবু হত না...।'

আমি চুপ করে রইলাম। কেন জানি না, চোখে জল আসতে চাইছিল। তাই ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে চোখ মেলে দিলাম। ছুটে যাওয়া সবুজ ধানখেত আর সাদা বকের ঝাঁক আমার চোখ জুড়িয়ে দিল।

মিহিরদা তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে কী-একটা বইয়ের পাতায় ডুবে গেছেন।

আমি ঘোর কাটিয়ে সুখেন্দু পালের কথার জবাব দিলাম, 'না, না—একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।'

সুখেন্দু পাল জানে না, আমার বাপি কয়েকমাস আগে দোতলার ওই পাঁচনম্বর ঘরেই মারা গেছে। কারণ, মিহিরদা ওকে আমার পরিচয় দেননি।

মিহিরদা ওকে জিগ্যেস করলেন, 'মধুসূদন কোথায়?'

সুখেন্দু জিভের ডগা দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে বলল, 'দোকানে গেছে। একটু পরেই এসে পড়বে—।'

'রাতে আমাদের হালকা খাবার হলেই চলবে।'

'হালকা ব্যবস্থাই করেছি—বেগুনভাজা, ডাল আর সয়াবিনের ঝাল।'

'ওঃ, দারুণ!' মিহিরদা নকল আগ্রহে বলে উঠলেন, 'আমরা সাত-দশদিন থাকব —একটু দেখবেন।'

'এখন কোথায় বেরোচ্ছেন?'

'দেখি...' ঠোঁট ওলটালেন মিহিরদা : 'গাড়ি যখন সঙ্গে আছে তখন একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াব ভাবছি...।'

'সাবধানে চলাফেরা করবেন—বেশি রাত করবেন না যেন...।' সিগারেটে জবর একটা টান দিয়ে বলল সুখেন্দু।

ওর কথার সুরটা কেমন যেন কানে বাজল। কথাটা অনেকটা গার্জেনের শাসনগোছের ঠেকল।

কিন্তু মিহিরদা ব্যাপারটা আমল দিলেন না, হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না—আমরা সাড়ে আটটা-ন'টার মধ্যেই ফিরে আসব।'

আজ সকালে পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছে সেখান থেকে আমরা বাস টার্মিনালে চলে এসেছিলাম। সেখানে যত রাজ্যের প্রাইভেট বাস আর সাইকেল রিকশোয় গাদাগাদি। তারই ফাঁকফোকর দিয়ে লোকজন জল-কাদা ডিঙিয়ে চলাফেরা করছে। টার্মিনাল ঘিরে অসংখ্য ঝুপড়ি-দোকান। কোনওটা পান-বিড়ি-সিগারেট বিক্রি করছে, আর কোনওটা-বা ভাতের হোটেল। লোকজনের হইচই চিৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। তার ওপর টার্মিনাল বিল্ডিং-এর মাইকে একটার-পর-একটা ঘোষণা চলছে।

সেখানে একটা ট্রান্সপোর্ট অফিসে যোগাযোগ করে আমরা লাল রঙের একটা টাটা সুমো ভাড়া করেছি। আমরা যেদিন ফিরে যাব—যদি সত্যিই ফিরে যেতে পারি—সেদিন গাড়িটা আমাদের পুরুলিয়া স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে তারপর ছুটি নেবে।

সুমোর ড্রাইভারের নাম গণপতি সূত্রধর। বয়েস বড়জোর তেইশ-চব্বিশ। পুরুলিয়া থেকে বাঘমুন্ডি আসার পথে দেখেছি গাড়ির স্টিয়ারিং-এর ওপরে ওর দখল অবাক করে দেওয়ার মতো।

গণপতি গোবিন্দপুরের ছেলে, এখন থাকে পুরুলিয়া টাউনে। গোবিন্দপুর যে বাঘমুন্ডি থেকে খুব একটা দূরে নয় সেটা ওর কাছেই জেনেছি। ফলে অঞ্চলটা ও ভালো করেই চেনে।

'পথিক' থেকে বেরিয়ে আমরা টাটা সুমোয় চড়ে বসলাম। মিহিরদা বসলেন সামনে—গণপতির পাশে। আমি আর ঝিমলি ওদের পেছনের সিটটায় বসলাম।

মিহিরদা একটা সিগারেট ধরালেন। তাতে কয়েকটা টান দেওয়ার পরই কেশে উঠলেন। গলাখাঁকারি দিলেন বারদুয়েক। তারপর কণ্ঠার কাছটায় হাত বুলিয়ে গণপতিকে বললেন, 'চাঁদমণি গ্রামে যাব।'

গণপতি গাড়ি ছেড়ে দিল। বালি-কাঁকরের রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি উঠে পড়ল মেটাল রোডে। কতক্ষণ সময় লাগবে জিগ্যেস করায় গণপতি বলল, 'আধঘণ্টায় পৌঁছে যাব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আমি ওকে জিগ্যেস করলাম, 'চাঁদমণি গ্রামে মলিন সামন্তের নাম শুনেছ?'

গাড়ি চালাতে-চালাতে ও একবার পেছন ফিরে তাকাতে চেষ্টা করল। তারপর সামনের রাস্তায় চোখ রেখে বলল, 'না, দিদি, শুনিনি—।'

মিহিরদা আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'মধুকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে বলেছিলাম, কিন্তু ও বলল সুখেন্দু পাল ওকে ডিউটির সময় ছাড়বে না। দু-একদিনের

মধ্যে ও সময় চুরি করে লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু তাতে তো আমাদের কাজের দেরি হয়ে যাবে।'

ঝিমলি বলল, 'ডোন্ট উয়ারি, আঙ্কল। চাঁদমণিতে মলিন সামন্তের বাড়ি চেনাটা কোনও প্রবলেম নয়। রিইনকারনেশনের কেস—মানে, ওটাকে বাংলায় কী যেন বলে, অন্তরা?'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'পুনর্জন্ম, জাতিস্মর।'

'হ্যাঁ, ওই জাতিস্মর-টাতিস্মর বললে গ্রামের লোকরাই মলিন সামন্তের বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ—সেই ভরসাতেই যাচ্ছি।' সিগারেটে টান দিয়ে মিহিরদা লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়লেন।

আমাদের গাড়ি একটা শাল-জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যতদূর চোখ যায় শুধু শালগাছ আর শালগাছ। জঙ্গলের ভেতরে ছায়াময় আবহাওয়াটা কেমন থমথমে আর শান্ত। জঙ্গলের শুরুতে সরকারি একটা সাইনবোর্ড লাগানো আছে, যার সারমর্ম হল ঃ এই জঙ্গল বনসৃজন প্রকল্পের অংশ।

জঙ্গলটা পেরিয়ে যাওয়ার পরই রাস্তার দুপাশে আবার রুক্ষ বালি, কাঁকর আর পাথরের রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। জায়গায়-জায়গায় ছোট-বড় টিলা মাথাচাড়া দিয়ে জমির নীচের পাথুরে খবর জানিয়ে দিচ্ছে।

কে জানে, এই রাস্তা ধরেই বাপি হয়তো চাঁদমণি গ্রামে গিয়েছিল!

আধঘণ্টা তখনও পুরো হয়নি, হঠাৎই গণপতি বলল, 'চাঁদমণিতে এসে গেছি।' বলেই স্টিয়ারিং বাঁ-দিকে কাটিয়ে মেঠো রাস্তায় ঢুকে পড়ল।

আমি আগে কখনও 'খুব' গ্রাম দেখিনি। তবে চাঁদমণি গ্রামের এলাকায় ঢুকে পড়ার পর মনে হল এটা 'খুব' গ্রাম না হলেও তার কাছাকাছি। রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানো টিমটিমে বাল্‌ব জানিয়ে দিচ্ছে গ্রামে বিজলি ঢুকে পড়েছে। 'খুব' গ্রাম নয় বলতে শুধু এইটুকুই।

যে-ক'টা ঘর-বাড়ি চোখে পড়ছে সবই টালির চাল কিংবা পাতায় ছাওয়া। এ ছাড়া ঘর তৈরি করতে যে-দুটো জিনিস সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছে সেগুলো হল মাটি আর বাঁশ। কোনও-কোনও মাটির বাড়ির দেওয়ালে কিংবা দাওয়ায় চড়া রঙের আলপনা চোখে পড়ছে।

বাড়িগুলো বেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে—সংখ্যায় তেমন বেশি নয়। এ ছাড়া বাড়িপিছু গোটা চার-পাঁচ ঝাঁকড়া গাছগাছালি তো আছেই।

বালি-কাঁকরের পথের ওপরে গণপতির গাড়ির চাকা বেশ ধীরে-ধীরে গড়াচ্ছিল। হঠাৎই পাশাপাশি কয়েকটা দোকানঘর চোখে পড়ে গেল আমাদের।

গাড়ি থামিয়ে গণপতি বলল, 'দোকানদারদের একবার জিগ্যেস করে দেখুন...।'

মিহিরদা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সবে 'মলিন সামন্ত' নামটা উচ্চারণ করেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির কাছে বেশ কয়েকজন লোকের ভিড় জমে গেল।

এলোমেলো কথাবার্তার মাঝে একটি ছেলেকে চোখে ধরে গেল আমার।

ফরসা রোগা চেহারা। গাল সামান্য বসা। চোখ-নাক বেশ চোখা। চোখের চাউনিতে তেজি বেপরোয়া ভাব। কথা বলার সময় কেমন ঘাড় বাঁকিয়ে সামান্য উদ্ধত ঢঙে কথা বলছে।

সবাইকে ঠেলে সরিয়ে ছেলেটি মিহিরদার কাছে এগিয়ে এল, বলল, 'আমি মলিনদের বাড়ি চিনি। ওর বাবা রসময় সামন্ত "মাইনিং অ্যান্ড মিনারেলস" কোম্পানিতে কাজ করে। ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার। আমি আপনাদের বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারি।'

মিহিরদা ভুরু কুঁচকে কয়েক লহমা ছেলেটিকে দেখলেন। বোধহয় সাংবাদিকের চোখে মেপে নিতে চাইলেন। তারপর কী ভেবে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'ওঁকে আমাদের গাড়িতে তুলে নিচ্ছি, অন্তরা। তা হলে খোঁজার কাজটা সহজ হবে।'

আমি আর ঝিমলি ঘাড় নেড়ে মিহিরদার কথায় সায় দিলাম।

মিহিরদা গণপতিকে বলতেই ও গাড়ি থেকে নেমে একেবারে পেছনের দরজাটা খুলে দিল। আর ছেলেটি বেশ সহজ চটপটে ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে বসল গাড়িতে।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল, আর ছেলেটি আমাদের সঙ্গে এমনভাবে গল্প জুড়ে দিল যেন কতকালের চেনা। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে ও গণপতিকে পথ দেখাচ্ছিল।

ওকে এবার ভালো করে দেখলাম।

চেহারায় বা পোশাক-আশাকে বেশ শহুরে ছাপ। বয়েস খুব বেশি হলে উনতিরিশ-তিরিশ। মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল—ছোট করে ছাঁটা। কানের লতি দুটো বেশ লম্বাটে, যেন দুল পরার জন্যে তৈরি। আর নাকের বাঁ-পাশে নতুন দশপয়সার মাপের একটা কালো জড়ুল।

কোনও প্রশ্ন করার আগেই ও সাতকাহন বকবক করে শোনাচ্ছিল।

ছেলেটির নাম প্রিয়বরণ সরকার। জন্ম কলকাতায়, তবে এই অঞ্চলে আছে প্রায় ছ'বছর। 'মাইনিং অ্যান্ড মিনারেল্‌স' কোম্পানিতে ও সামান্য কেরানির কাজ করে। রসময় সামন্তর সঙ্গে আগে ওর তেমন আলাপ ছিল না। রসময়দার ছেলের ওই ফিটের ব্যাপারটা হওয়ার পর থেকেই মুখে-মুখে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ে। তখন ও যেচে গিয়ে রসময় সামন্তের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। মলিনের চিকিৎসার জন্যে অনেক দৌড়-ঝাঁপ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ হয়নি।

প্রিয়র কথায় আমার কেমন খটকা লাগল।

ফিটের রোগ মানে! মলিন সামন্ত তো জাতিস্মর বলে শুনেছিলাম—অন্তত মিহিরদা তাই বলেছিলেন।

প্রিয়বরণকে সে-কথাই জিগ্যেস করলাম।

'মলিন সামন্ত তো জাতিস্মর শুনেছিলাম...তার আবার ফিটের রোগ আছে না কি?'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল প্রিয় ঃ 'জাতিস্মর তো বটেই...তবে তার সঙ্গে অনেক কিছু আছে। যেমন ওই ফিটের ব্যাপারটা...।' একটু চুপ করে থেকে প্রিয় আবার বলল, 'ওকে দেখতে এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে অনেক লোক আসে। আপনারাও কি ওকে দেখতে এসেছেন না কি?'

উত্তর দিলেন মিহিরদা, 'আমরা যে কলকাতা থেকে আসছি সে তো বুঝতেই পারছেন। আমরা রিপোর্টার—"সুপ্রভাত" কাগজের। মলিন সামন্তকে নিয়ে আমরা একটা স্টোরি করতে চাই।'

'সে আমি খানিকটা আঁচ করেছিলাম। আমি মলিনের ব্যাপারটা ডিটেল্সে আপনাদের বলতে পারব। ওদের ফ্যামিলির সঙ্গে আমার খুব ইয়ে আছে।'

আমি ঝিমলির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসলাম। খবরের কাগজে নাম ছাপাতে সবাই চায়। প্রিয়বরণেরও দেখছি সে-ব্যাপারে উৎসাহের ঘাটতি নেই!

মিহিরদা প্রিয়র সঙ্গে আমাদের ফর্মাল ইনট্রোকডাকশন করিয়ে দিলেন। প্রিয় কেমন যেন অপ্রস্তুতভাবে হেসে কোলের কাছে হাত দুটো জড়ো করে নমস্কারগোছের ভঙ্গি করল। লক্ষ করলাম, ঝিমলি কৌতুকের চোখে প্রিয়কে বেশ খুঁটিয়ে দেখছে।

কথা বলতে-বলতে আমরা রসময় সামন্তের বাড়ির কাছে চলে এলাম।

প্রিয় বলল, 'আমাদের কোম্পানির কয়েকজন স্টাফ এখানে থাকে। বাঘমুন্ডি পাহাড়ের কাছে আমাদের প্রজেক্টের খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে। বড়-বড় অফিসারদের সাইটের কাছাকাছি কোয়ার্টার আছে। তবে আমাদের লেভেলের যারা, তারা আশপাশের গ্রামে ছোট-ছোট বাড়ি-ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। কোম্পানি ভাড়ার টাকা দিয়ে দেয়। তা ছাড়া...।'

প্রিয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল বোধহয়, কিন্তু সে-কথা আমাদের আর শোনা হল না।

কারণ, গণপতি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আমরা নামব-নামব করছিলাম। ঠিক তখনই এক তীব্র চিৎকার আমাদের কাঁপিয়ে দিল।

আকাশের আলো মরে এসেছে। মেঘ আর ঝাঁকড়া গাছের ছায়া সেই আলোকে আরও কমজোরি করে দিয়েছে। চারিদিকে কেমন একটা গুমোট ভাব। কোনও একটা

ঘটনার জন্যে যেন সবাই অপেক্ষা করছে।

আমরা তাড়াহুড়ো করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

চিৎকারটা দ্বিতীয়বার শোনা গেল। এমন তীক্ষ্ণ চিৎকার যে, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

প্রিয় আঙুল তুলে একটা বেখাপ্পা চেহারার একতলা বাড়ির দিকে দেখাল। বলল, 'ওই যে রসময় সামন্তের বাড়ি...।'

তৃতীয়বার চিৎকারটা শোনা যেতেই বুঝলাম, ওটা রসময়বাবুর বাড়ি থেকেই ভেসে আসছে।

প্রিয় হঠাৎই বাড়িটার দিকে ছুটতে শুরু করল।

ঝিমলি পেছন থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'কে অমনভাবে চিৎকার করছে?'

ছুটতে-ছুটতে প্রিয়বরণ জবাব দিল, 'রসময়দার ছেলে, মলিন—।'

সঙ্গে-সঙ্গে মিহিরদা কাঁধের ঝোলা-ব্যাগ আঁকড়ে ধরে ছুটতে শুরু করলেন।

আমার আর ঝিমলির পিছিয়ে পড়ার কোনও মানে হয় না। তাই আমরাও মিহিরদার দলে নাম লেখালাম।

তখনই রক্ত হিম-করা চিৎকারটা আরও একবার শোনা গেল।

॥ নয় ॥

অচেনা কারও বাড়িতে কখনও এভাবে ঢুকিনি। কিন্তু ওই চিৎকার আর কৌতূহল আমাকে টানছিল। তবে সে-টান মিহিরদা কিংবা প্রিয়বরণের মতো নয়, এই টানের মধ্যে কেমন একটা অলৌকিক ব্যাপার ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি নয়, আমার বাপি মলিন সামন্তের চিৎকার শুনে পাগলের মতো দৌড়চ্ছে।

ছোট্ট বাগান, উঠোন, আর-একটা টিউবওয়েল পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম একটা ঘরে। সেখান থেকে তার পাশের ঘরে—কারণ, চিৎকারটা আসছিল সেই ঘর থেকেই।

ঘরটা মাপে যে খুব ছোট তা নয়। তবে আমরা চারজন দুদ্দাড় করে ঢুকে পড়তেই ঘরটা প্রায় ভরতি হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকতেই যে-দৃশ্য চোখে পড়ল সেটা ভারী অদ্ভুত।

আট-ন'বছরের একটা রোগা কালো ছেলে—হাফপ্যান্ট পরা, খালি গা—বিছানার ওপরে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য পা-টা ভাঁজ করা। একটা হাত বাড়িয়ে

খাটের ছত্রি আঁকড়ে ধরেছে, আর-একটা হাত মাথার ওপরে তুলে সাপের ফণার মতো দোলাচ্ছে।

ছেলেটার দু-চোখ বোজা। দেখলে মনে হবে যেন নেশা করেছে। আর ওই অবস্থাতেই হাঁ করে প্রবল চিৎকার করে চলেছে।

প্রিয়বরণ সরকারের কাছে এ-দৃশ্য হয়তো চেনা, কিন্তু আমাদের নয়।

আমরা তিনজন একেবারে পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম। সেই অবস্থাতেই বড়-বড় চোখ মেলে হাঁপাচ্ছিলাম। দৌড়ে আসার ধকলটা যাবে কোথায়!

মিহিরদা পোড় খাওয়া সাংবাদিক। ওঁর সাংবাদিক মন মোটেই দিশেহারা হয়নি। কারণ, অবাক চোখে ছেলেটাকে দেখতে-দেখতেই তিনি ব্যাগ হাতড়ে ক্যামেরা বের করে নিলেন। এবং ছেলেটার ফটো তুলতে শুরু করে দিলেন।

ছেলেটা ছাড়াও একজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা ঘরে ছিলেন। দুজনের চোখেই চশমা। ভদ্রলোকের পরনে শুধু লুঙ্গি। আর ভদ্রমহিলার পরনে আটপৌরে শাড়ি আর ব্লাউজ। নিশ্চয়ই রসময় সামন্ত আর ওঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলা খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন আর 'মলিন! মলিন!' বলে ভাঙা গলায় ডাকছিলেন।

রসময় সামন্ত একটা স্টেইনলেস স্টিলের বাটি হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাটিতে খানিকটা জল। তাতে কয়েকটা ফুলের পাপড়ি ভাসছে। তিনি বিড়বিড় করে কীসব বলছিলেন আর ডানহাতে বাটির জল আঁজলা করে তুলে ছেলেটির গায়ে ছুড়ে মারছিলেন।

প্রিয়বরণ নিশ্চয়ই মাথা ঠান্ডা রেখেছিল। ও ঘরে ঢুকেই দু-তিন সেকেন্ড যা থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারপরই হরিণের ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে উঠেছে খাটে এবং হাডুডু খেলার ভঙ্গিতে মলিনের কোমর জাপটে ধরে ওকে একেবারে পেড়ে ফেলেছে খাটের ওপরে।

অবাক হয়ে দেখলাম, খাটে কাত হয়ে পড়ার পরেও রোগাপটকা মলিন প্রিয়বরণের সঙ্গে হিংস্রভাবে ধস্তাধস্তি করছে।

রসময় সামন্ত বাটির জল ছিটিয়ে বিড়বিড় করে ওঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। ওঁর মুখ-চোখ দেখে ভয় পেয়েছেন, বা দুশ্চিন্তা করছেন, এমনটা মোটেই মনে হচ্ছিল না। বরং ওঁর স্ত্রী চিৎকার আর কান্নার মাত্রাটা বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

একটু পরেই মলিন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ওর মুখ দিয়ে কেমন একটা গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল। দেখে মনে হল, এইবার বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

সবচেয়ে যেটা অদ্ভুত মনে হল, প্রিয়বরণের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময়েও মলিন চোখ বুজেই ছিল। শুরু থেকে একটিবারের জন্যেও ও চোখ খোলেনি।

প্রিয়বরণ মলিনকে ছেড়ে উঠে পড়ল। দু-হাতের তালুতে চাপড় মেরে হাত ঝাড়ল। তারপর রসময় সামন্তের স্ত্রীকে লক্ষ করে বলল, 'বউদি, আর প্রবলেম নেই। এখন ও অন্তত ঘণ্টাখানেক চুপচাপ থাকবে।'

লন্ডভন্ড বিছানায় মলিন হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে ছিল। হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে—কে জানে! তবে ওর মুখটা হাঁ করা, দাঁত দেখা যাচ্ছে, বোধহয় মুখ দিয়েই বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল।

রসময় সামন্তের স্ত্রী ছেলেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওকে ঠিকঠাক করে শুইয়ে দিতে লাগলেন। কপালে, মাথায় বারবার হাত বোলাতে লাগলেন।

প্রিয়বরণ রসময়কে বলল, 'রসময়দা, ও-ঘরে চলুন, এনারা কলকাতার একটা বড় খবরের কাগজ থেকে এসেছেন। মলিনের ব্যাপারটা কী করে যেন খোঁজ পেয়েছেন। ওর ব্যাপারে লিখতে চান...।'

মিহিরদা ক্যামেরা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে রসময় সামন্তকে নমস্কার করলেন। তারপর সংক্ষেপে আমাদের পরিচয় দিলেন। পরিচয় বলতে আমরা সবাই 'সুপ্রভাত' কাগজের সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফার। আমরা মলিন সামন্তকে নিয়ে 'স্টোরি' করতে এতদূর এসেছি। ব্যস, এইটুকুই।

রসময়ের গায়ে কোনও জামা বা গেঞ্জি ছিল না। আমাদের সঙ্গে পরিচয় শেষ হওয়ামাত্রই ভদ্রলোক ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একটা ব্র্যাকেট থেকে একটা ছাইরঙা হাফশার্ট টেনে নিয়ে চটপট গায়ে চড়িয়ে নিলেন। তারপর হাতের বাটিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে আমাদের পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বিড়বিড় করে বললেন, 'মাস চার-পাঁচ আগে একজন রিপোর্টার আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তখন ঠা-ঠা গরম...মাঠ-ঘাট আগুনে জ্বলছে...তো তার মধ্যে সে হঠাৎ এসে হাজির। আসুন, এখানে একটু ম্যানেজ করে বসে পড়ুন। দেখছেন তো, আমার বাড়িতে কী অবস্থা!'

ঘরটা অগোছালো, সস্তার আসবাব দিয়ে সাজানো। একটা ছোট তক্তপোশ, দুটো ছোট-ছোট টেবিল আর তিনটে চেয়ার। প্রায় সবকটা জিনিসের গায়েই কাঠ বা লোহার টুকরো দিয়ে কমবেশি রিপেয়ারের ছাপ।

প্রিয়বরণ চেয়ার তিনটে আমাদের কাছে এগিয়ে দিল। তারপর ও আর রসময় সামন্ত তক্তপোশে বসে পড়ল।

'তারপর কী হল?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'কীসের তারপর?' অবাক হয়ে রসময় জানতে চাইলেন।

'ওই যে, চার-পাঁচ মাস আগে একজন রিপোর্টার হঠাৎ এসে হাজির হল আপনার বাড়িতে—।'

'ও, হ্যাঁ। সে দু-দিন এসেছিল। তারপর আসবে বলেও আর আসেনি। কে জানে, হয়তো কাজ মিটে গেছে তাই কেটে পড়েছে। আজকালকার মানুষ তো!'

মিহিরদা বোধহয় আমাকে লক্ষ করছিলেন। এবং রসময় সামন্তের কথায় আমার মুখে হয়তো কোনও অপছন্দের রুক্ষভাব ফুটে উঠেছিল। কারণ, আমি রসময় সামন্তকে বলতে যাচ্ছিলাম যে, ওই সাংবাদিক ভদ্রলোক আমার বাপি। তিনি যে আর আসতে পারেননি তার কারণ তিনি অপঘাতে মারা গিয়েছিলেন—এই পুরুলিয়াতেই।

কিন্তু আমি মুখ খোলামাত্রই মিহিরদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা কিন্তু সেরকম নই, রসময়বাবু। যদি "আসব" বলেও আমরা না আসি তা হলে জানবেন...' একটু থামলেন মিহিরদা, আমার দিকে একপলক তাকালেন। তারপর ঃ 'তা হলে জানবেন, আমরা...আমরা আর বেঁচে নেই।'

প্রিয়বরণের ভুরু কুঁচকে গেল।

রসময় সামন্ত চমকে উঠে বললেন, 'কেন, এ-কথা বলছেন কেন?'

মিহিরদা অপ্রস্তুতভাবে হাত নেড়ে বললেন, 'বিপদ-আপদ কখন আসে কিছু বলা যায়! নিন, সিগারেট নিন...।'

আমি জানি, মিহিরদা সুরঞ্জন মজুমদারের অসম্মান মেনে নিতে পারেননি বলেই ওরকম অদ্ভুত আলটপকা মন্তব্য করে বসেছেন। তবে মিহিরদা এও চাননি, আমি রসময় সামন্তের বিরক্তিকর কথার জবাবে আবেগের মাথায় রূঢ় কিছু বলে বসি।

মিহিরদা পকেট থেকে সিগারেট বের করে রসময়কে দিলেন। প্রিয়বরণ নিজেই হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট চেয়ে নিল। মিহিরদা ওদের সিগারেটে আগুন দিয়ে সবশেষে নিজেরটা ধরালেন।

সিগারেট-টিগারেট অফার করাটা সাংবাদিকদের পুরোনো অস্ত্র। মিহিরদা বলেন, এতে খবর আদায়ের কাজটা নাকি সহজ হয়ে যায়।

মিহিরদা সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর রসময়কে বললেন, 'আপনার ছেলের ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন। আজকালকার দিনে জাতিস্মর তো প্রায় দেখাই যায় না! আমরা মলিনের কথা লেখার পর দেখবেন কত টিভি চ্যানেল থেকে আপনার কাছে লোক আসবে। এমনকী বিবিসি, সিএনএন-ও চলে আসতে পারে।'

রসময় সামন্তকে দেখে মনে হল না মিহিরদার কথায় তেমন একটা উৎসাহ পেয়েছেন। ভদ্রলোক বিবিসি বা সিএনএন-এর নাম শুনেছেন কি না কে জানে!

হতে পারে মলিনের সমস্যাটা ওঁকে সবসময় এত কুরে-কুরে খায় যে, ওঁর সব উৎসাহ নিভে গেছে। লক্ষ করলাম, উনি চুপচাপ সিগারেটে টান দিয়ে চলেছেন। হয়তো কিছু একটা ভাবছেন।

মিহিরদা ঝিমলিকে একটা রাইটিং প্যাড আর পেন এগিয়ে দিলেন। নিচু গলায় বললেন, 'রেলিভ্যান্ট ফ্যাক্ট্‌সগুলো নোট করে নেবে।'

ঝিমলি আমার দিকে প্যাড আর পেন বাড়িয়ে দিল ঃ 'অন্তরা, য়ু ডু ইট। আমি তো অ্যামেচার—য়ু আর আ প্রফেশনাল।'

আমি হেসে বললাম, 'উহুঁ, তুই লেখ। তুই লিখলে নোটগুলো আনবায়াস্‌ড হবে—ইমোশন বা সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে থাকবে না।'

ঘরে দুটো বাল্‌ব জ্বলছিল, কিন্তু তাতে অন্ধকারকে ঠিকমতো ম্যানেজ করা যাচ্ছিল না। ঘরের এককোণে দুটো দড়িতে জামাকাপড় টাল হয়ে ঝুলছে। তার পাশেই কয়েকটা ঠাকুরের ফটো।

রসময় ক্লান্ত ভঙ্গিতে তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। ওঁর বয়েস বড়জোর আটচল্লিশ কি পঞ্চাশ হবে, কিন্তু মাথাজোড়া টাক ব্যাপারটাকে পাঁচ-সাতবছর এগিয়ে দিয়েছে।

রসময়ের রং কালো, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। শরীরের তুলনায় গালদুটো একটু বেশি ফোলা। হাতের আঙুলে রুপো বাঁধানো দুটো পাথরের আংটি—তার মধ্যে একটাকে পলা বলে চেনা যায়।

ভদ্রলোক সামান্য পা দোলাতে-দোলাতে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। তারপর অদ্ভুত এক বিভোর গলায় বললেন, 'মলিনের জন্মের পর থেকেই কেমন সব অদ্ভুত-অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল। অবিশ্যি প্রথমদিকে সেগুলো ঠিক-ঠিক আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। ও জাতিস্মর কি না জানি না, তবে অনেকে তাই বলছে। আবার কেউ-কেউ বলছে, ওর ওপরে দেবতার ভর হচ্ছে—কেউ বা বলছে অপদেবতা। কী জানি! আমার তো অত ঠাকুর-দেবতার জ্ঞান নেই। আমার ছেলে সেরে উঠলেই আমি খুশি। ওর জন্যে চিন্তায়-চিন্তায় আমরা শেষ হয়ে গেলাম। আমার ওয়াইফ সবিতা নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে শুধু সাধুসন্ত আর জড়িবুটির খোঁজ করে চলেছে। কবে কখন যে ব্যাপারটা শেষ হবে জানি না। রোজ মনে হয় আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে...।'

এরপর রসময় মলিনের কথা আমাদের বললেন।

মলিনের জন্ম হয়েছিল পুরুলিয়া টাউনে। জন্মের সময় সব শিশুই কাঁদে, মলিনও কেঁদেছিল। কিন্তু সে-কান্নাটা কোনও বয়স্ক লোকের কান্নার মতো। ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে রসময়কে এ-কথা জানিয়েছিলেন।

এরপর ধীরে-ধীরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করা গিয়েছিল। মলিনের শরীর বেশ ঠান্ডা। থার্মোমিটার দিয়ে মেপে রসময় আর সবিতা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। স্বাভাবিক মানুষের দেহের উষ্ণতা মোটামুটিভাবে ৯৭.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকে, অথচ মলিনের বেলায় সেটা মেপে পাওয়া গেল মাত্র ৯০.৫ ডিগ্রি। শরীরের উষ্ণতা এত কমে গেলে মানুষের বোধহয় বেঁচে থাকার কথা নয়। কিন্তু মলিন সত্যিই ভারী অদ্ভুত। ওই উষ্ণতা নিয়েও ও দিব্যি হেসে-খেলে কাটাতে লাগল। শরীরে কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, মাথা ঘোরা নেই, পেট ব্যথা কি বমি-বমি ভাব নেই, কিচ্ছু নেই।

রসময় আর সবিতা আতঙ্কে ডাক্তার-বদ্যির কাছে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। ডাক্তাররা সবাই বেশ অবাক হয়ে গেলেও যেহেতু ছেলেটা সুস্থ-স্বাভাবিক রয়েছে তাই তাঁরা ভয় পেলেন না। বললেন, এ প্রকৃতির খেয়াল, নিয়মের ব্যতিক্রম। হয়তো ওই ৯০.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটই ওর নরমাল টেম্পারেচার।

এইভাবে মলিন সামন্ত বড় হয়ে উঠতে লাগল। আর-পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলো করে ওর দিন কাটতে লাগল। রসময় আর সবিতা স্বস্তি পেলেন। ওঁদের দুশ্চিন্তা ধীরে-ধীরে কমে আসতে লাগল। কিন্তু হঠাৎই একদিন মলিনের একটা কথায় ওঁরা চমকে উঠলেন। মলিনের বয়েস তখন পাঁচ বছর।

স্কুল থেকে ফিরে মলিন ওর মা-কে বলল, 'মা, মা, আজ একটা খুন হতে দেখলাম।'

সবিতা ছেলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

'কী সব উলটোপালটা বকছিস! শিগগির মুখ-হাত ধুয়ে নে—তারপর দুধ-মুড়ি দিচ্ছি, খা।'

'না, মা, সত্যি-সত্যি!' চোখ বড়-বড় করে বলল মলিন, 'একটা মোটামতন লোককে তিনটে ছেলে টাঙ্গি-বল্লম দিয়ে একেবারে শেষ করে দিল। মাঠটা রক্তে ভেসে গেল।'

'কোথায়? কোন মাঠে?' সবিতা কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে এলেন ছেলের কাছে। ঝুঁকে পড়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন : 'বল, কোথায় তুই খুন হতে দেখলি?'

মলিন সরল চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'থার্মালের পেছনের মাঠটায়...।'

এই অঞ্চলে তখন ছোট্ট একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছিল। ক্যাপাসিটি দশ মেগাওয়াট। সেই প্ল্যান্টটাকে সবাই চলতি কথায় 'থার্মাল' বলত। তার পেছনের মাঠেই নাকি মার্ডারটা হয়েছে।

সবিতা বারবার ছেলেকে জেরা করতে লাগলেন, কিন্তু ছেলের সেই এক কথা।

রসময় বাড়িতে ফেরার পর সবিতা স্বামীকে সব বললেন। শুনে রসময় গুম হয়ে গেলেন। ছেলেকে আর কিছু জিগ্যেস করলেন না। স্ত্রীকেও বললেন, এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে আর কোনও কথা না বলতে।

খুনের ঘটনাটা কিন্তু পাড়ায় কারও মুখে শোনা যায়নি। রসময় নানান জায়গায় বিস্তর খোঁজ করলেন। অফিসে কেউ কিছু বলতে পারল না। এমনকী থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের স্টাফেরাও 'খবর'টা শুনে অবাক হয়ে গেল, আবার কেউ-কেউ মুখ টিপে হাসতে লাগল।

রসময় বেশ অপ্রস্তুত আর অপদস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন এবং ছেলেকে আর-একদফা জেরা শুরু করলেন।

আশ্চর্য। মলিন সামন্ত ওর বক্তব্য থেকে এতটুকুও নড়ল না! ও বারবার সেই একই কথা বলে চলল।

এমনিতে মলিনের মিথ্যে কথা বলার বদভ্যাস নেই। তা ছাড়া, ওর বড়-বড় সরল চোখ, নিষ্পাপ মুখ দেখে কখনওই মনে হয় না ও মিথ্যে কথা বলছে।

তখন রসময় একটু তলিয়ে খোঁজখবর করতে শুরু করলেন।

খোঁজ করে জানতে পারলেন, মলিনের কথা সত্যি—শুধু সময়ের একটু গন্ডগোল আছে। থার্মালের পেছনের ওই মাঠটায় খুন একটা হয়েছে বটে, তবে সেটা ১৯২৭ সালে। মহাবীর গাঁতাইত নামে ব্রিটিশের এক চরকে বিপ্লবীরা খুন করেছিল। সেটা ছিল অক্টোবর মাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে নেতাজী সুভাষ দু-দিনের জন্যে পুরুলিয়াতে এসেছিলেন। খুনটা তখনই হয়েছিল। এখানকার পুরোনো লোকেরা ব্যাপারটা জানে।

রসময় ভীষণ নাড়া খেয়ে গেলেন। পঁচাত্তর বছর আগের খুনের খবর মলিন জানল কেমন করে!

এমন তো নয় যে, ও কারও কাছে পুরোনো গল্পটা শুনে সেটা নিজের চোখে 'দেখেছে' বলে চালাচ্ছে! বাচ্চারা অনেক সময় বড়দের তাক লাগিয়ে দেওয়ার লোভে এরকম উদ্ভট অলৌকিক গল্প ফেঁদে বসে। তা ছাড়া, এমনও হতে পারে, মলিন হয়তো পঁচাত্তর বছর আগের সেই খুনটার কথা শোনেনি, কেরামতি দেখানোর লোভে একটা মনগড়া খুনের গল্প মা-কে শুনিয়ে দিয়েছে।

রসময় ব্যাপারটা নিয়ে সবিতার সঙ্গে অনেক আলোচনা করলেন। চিন্তায়-চিন্তায় রাত জেগে কাটালেন। মলিনকে সকাল-বিকেল জেরা করতে লাগলেন। ওই মাঠটার কাছে কয়েকবার নিয়েও গেলেন।

কিন্তু রসময়ের মনের মতো কোনও সমাধান পাওয়া গেল না।

বরং শেষ যেদিন ওকে মাঠটা দেখিয়ে নানান জিজ্ঞাসাবাদ করে রসময় বাড়ি ফিরছেন, তখন মলিন ফস করে বলে বসল, 'বাবা, এতদিন কিছুতেই লোকটার নাম মনে করতে পারছিলাম না। এখন মনে পড়েছে।'

'কার নাম?'

'ওই যে, যে-লোকটা ওই মাঠে খুন হল—।'

'কী নাম তার?'

'মহাবীর গাঁতাইত। লোকটা ইংরেজের চর ছিল। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ওকে খুন করেছে। তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এখানে এসেছিলেন—এই পুরুলিয়ায়।'

রসময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাঁ করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারণ, এসব খবরের এককণাও তিনি মলিনকে কখনও বলেননি।

॥ দশ ॥

এরপর থেকে মলিনকে নিয়ে ছোটখাটো অবাক-করা ঘটনা ঘটতেই থাকল।

যেমন, একদিন ও মন্তব্য করল, 'আগে যখন এখানে আমি এসেছিলাম তখন এত টিউকল ছিল না। মানভূমে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।' তারপর ও সুর করে গাইতে লাগল, 'তেরোশো চব্বিশ সালে / ভেঁখু ফুটে গেল জলে...।'

এইভাবে মলিন নিয়মিত পুরোনো কথাবার্তা বলে চলেছে। ওর চেনা নদী, চেনা রাস্তা, চেনা জঙ্গল, এমনকী কয়েকটা চেনা খাদানের কথা পর্যন্ত বলেছে। তারপর, প্রায় বছরখানেক হল, ওর এই ফিটের রোগ শুরু হয়েছে। তখন ও যেন কেমন ঘোরের মধ্যে ডুবে যায়, আর দু-চোখ বুজে কেমন যেন নাচের ভঙ্গিতে শরীর দোলাতে থাকে।

কথা বলতে-বলতে আচমকাই চুপ করে গেলেন রসময়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাকগে, কত আর বলব। তবে এই আশায় সকলকে বলি যদি কেউ ছেলেটাকে সুস্থ করে তোলার কোনও পথ বাতলে দিতে পারে। ওই যে চার-পাঁচ মাস আগে একজন রিপোর্টার এসেছিল, তাকে দেখে আমার মনে খুব আশা জেগেছিল।'

'কেন? আশা জেগেছিল কেন?' মিহিরদা জিগ্যেস করলেন।

মাথা নামালেন রসময়। কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে মিনমিনে গলায় বললেন, 'মলিনকে নিয়ে পুরুল্যের খবরের কাগজে কয়েকবার লেখা-টেখা বেরিয়েছে। তাতে আমার কোনও উপকার হয়নি। ভেবেছিলাম, কলকাতা বড় জায়গা —সেখানকার কাগজ-টাগজে আমার ছেলেটার আশ্চর্য রোগের বিবরণ বেরোলে নিশ্চয়ই সব বড় ডাক্তারদের চোখে পড়বে। তখন আমার ছেলের প্রবলেমটা সল্‌ভ হবে। সেটা আর হল না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশায় মাথা নাড়লেন রসময়।

মিহিরদা ঝিমলির দিকে তাকালেন। ঝিমলি প্যাড আর পেন নিয়ে মাথা নিচু করে ওর কাজ করে যাচ্ছিল।

খেয়ালই করিনি কখন যেন আমি দাঁত দিয়ে নখ কাটতে শুরু করে দিয়েছি। সেটা টের পেতেই চট করে মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিলাম। রসময়বাবুকে লক্ষ করে বললাম, 'আপনার তো হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আপনার ছেলেকে নিয়ে স্টোরি করে আমরা খবরের কাগজে ছাপাব। তখন নিশ্চয়ই সেরকম কোনও ডাক্তারের খোঁজ-টোজ পেয়ে যাব। তখন দেখবেন, মলিন ভালো হয়ে যাবে।'

হাসলেন রসময়—বিষণ্ণ হাসি—সমাধান হবে না এমন কোনও বিপদে কেউ আশ্বাস দিলে যে-ধরনের হাসি ফুটে ওঠে অনেকটা সেইরকম। তারপর তক্তপোশ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ঃ 'আপনারা বসুন, সবিতাকে একটু চা-টা করতে বলি,...আর দেখে আসি ছেলেটা কেমন আছে...।'

মিহিরদা বললেন যে, চায়ের ব্যবস্থা করার কোনও দরকার নেই, কিন্তু রসময় শুনলেন না।

'তা কী করে হয়! আমার বাড়িতে আপনারা প্রথম এলেন...।'

রসময় ঘর ছেড়ে চলে যেতেই প্রিয়বরণ বলল, 'মোটামুটি শুনলেন তো, ছেলেটাকে নিয়ে রসময়দা কী প্রবলেমে আছে...।'

আমি ওকে জিগ্যেস করলাম, 'চার-পাঁচ মাস আগে সেই রিপোর্টার ভদ্রলোক যখন এ-বাড়িতে এসেছিলেন তখন আপনি এখানে ছিলেন?'

মাথা নাড়ল প্রিয়বরণ ঃ 'না, ছিলাম না। তবে রসময়দার কাছে পরে শুনেছি।'

রসময় সামন্ত ঘরে ঢুকলেন আবার। বললেন, 'মলিন এখনও ঘুমিয়ে আছে।'

আমি ওঁকে লক্ষ করে বললাম, 'রসময়বাবু, এবারে ওই রিপোর্টার ভদ্রলোকের কথা একটু বলুন...যিনি মলিনের কথা জানার জন্যে আপনার বাড়িতে দু-দিন এসেছিলেন...।'

তক্তপোশের ওপরে বসে পড়লেন রসময় সামন্ত। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে কান চুলকোলেন। তারপর ভুরু কুঁচকে তাকালেন ঘরের সিলিং-এর দিকে।

আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'হুঁ...কী যেন নাম ছিল লোকটার... কী যেন মজুমদার...। একটু ভারী চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল...একইরকম গোঁফ...।'

আমি কেমন পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুতেই আর তর সইছিল না। বাপির কথা আমি জানতে চাই। রসময় বাপির কথা বলতে এত দেরি করছেন কেন?

রসময় সামন্ত বাপির কথা বলতে শুরু করলেন—টুকরো-টুকরো ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে।

বাপি নাকি মলিনের অনেকগুলো ফটোও তুলেছিলেন। কিন্তু বাপির ক্যামেরাটা আমরা পাইনি। মলিনের জন্যে বাপি লজেন্স-চকোলেট নিয়ে এসেছিলেন। ওকে খেলনাও কিনে দিয়েছিলেন কয়েকটা। মলিনের সঙ্গে দু-দিনেই বাপির বেশ ভাবসাব হয়ে গিয়েছিল। রসময়কে বলেছিলেন, মলিনকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন—সবাইকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেবেন। মলিনও ভদ্রলোককে পছন্দ করে ফেলেছিল। অনেক কথাবার্তা বলত ওনার সঙ্গে। কিন্তু পরে মলিনকে হাজারবার প্রশ্ন করেও রসময় একটি কথাও বের করতে পারেননি।

রসময় সামন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে থামলেন। আমার বুকের ভেতর থেকেও একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

কল্পনায় দৃশ্যটা দেখতে চাইলাম। মলিনের সঙ্গে বাপি গল্প করছে, ওকে লজেন্স কি চকোলেট দিচ্ছে, আর নানান গুপ্তকথা জানতে চাইছে।

বাপির কথা শুনতে-শুনতে মনটা হঠাৎই খারাপ হয়ে গেল।

মাত্র দুবার এ-বাড়িতে এসেই মলিন সম্পর্কে কী এমন কথা জানতে পেরেছিল বাপি!

মিহিরদা একের পর এক প্রশ্ন করছিলেন রসময় সামন্তকে। নিচু গলায় রসময় সেসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। আমার কানে কোনও কথাই ঢুকছিল না। মলিনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমার মনটা ছটফট করছিল।

ঝিমলি আমার পাশেই বসেছিল। বোধহয় আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষও করছিল। হঠাৎই চাপা গলায় বলে উঠল, 'হোয়াট্‌স আপ! মনে হচ্ছে তোর মধ্যে একটা টুইস্টার চলছে!'

'টুইস্টার?' আমি অবাক হয়ে ঝিমলির দিকে তাকালাম।

'টুইস্টার—মানে, স্টর্ম।' হাসল ঝিমলি : 'সিনেমাটা দেখিসনি?'

'দেখেছি' বলতে-না-বলতেই চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন রসময়ের স্ত্রী সবিতা।

সবিতার রং ময়লা। সাদামাটা গৃহবধূ বলতে যা বোঝায় তাই। চোখে চশমা।

মেঝেতে চায়ের ট্রে নামিয়ে সবিতা আমাদের হাতে চায়ের কাপ আর বিস্কুট তুলে দিতে লাগলেন। রসময়কে চা দেওয়ার সময় চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'ওঁদের কাকের ব্যাপারটা বলেছ?'

রসময় সঙ্গে-সঙ্গে জিভ কাটলেন, বললেন, 'ওঃ হো, ওটা বলতে একদম ভুলে গেছি।'

মিহিরদার ভুরু কুঁচকে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সরাসরি তাকালেন রসময়ের দিকে ঃ 'কাকের ব্যাপার মানে!'

আমি প্রিয়বরণকে লক্ষ করছিলাম। মুখ নামিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না মোটেই।

একটু পরে প্রিয়বরণ আড়চোখে রসময়ের দিকে তাকাল। রসময় চায়ে ঘন-ঘন দুবার চুমুক দিয়ে আমতা-আমতা করে বললেন, 'হ্যাঁ, মানে, ব্যাপারটা একটু পিকিউলিয়ার। জানি না, এর সঙ্গে মলিনের অসুখের কোনও কানেকশান আছে কি না...।' জোরে শ্বাস টানলেন রসময় ঃ 'জানেন, মাসে একবার করে মলিনের গা থেকে কেমন একটা গন্ধ বেরোয়...।'

'তার মানে!' আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম।

সবিতা একপাশে মনমরা মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আলতো গলায় বললেন, 'সত্যি, কীরকম একটা যেন গন্ধ বেরোয়। আর...।'

রসময় সবিতার কথার খেই ধরে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মাসের প্রথমদিকটায় ওরকম হয়। এই তো, দেখুন না, আজ তো একতিরিশ তারিখ—আর দু-চারদিন পরেই গন্ধটা এল বলে!'

'কীরকম গন্ধ বেরোয়?' মিহিরদা কৌতূহলে টগবগ করছেন।

'গন্ধের নাম বলতে পারব না।' ঠোঁট ওলটালেন রসময় ঃ 'কেমন একটা অদ্ভুত টাইপের গন্ধ। তবে গন্ধটা যখন বেরোয়, তখন মলিনকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দিই না। বেরোলেই ওর ওপরে কাকের অত্যাচার শুরু হয়ে যায়।'

'কাকের অত্যাচার!'

'হ্যাঁ, অত্যাচার ছাড়া আর কী!' লম্বা চুমুকে চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখলেন রসময় ঃ 'প্রথমদিকে ব্যাপারটা যখন ভালো করে বুঝতে পারিনি তখন মলিন রাস্তায় বেরোলেই দাঁড়কাকের দল কোথা থেকে উড়ে এসে ওকে ঘিরে ধরত, কানফাটানো চিৎকার করে ডানা ঝাপটাত, ওকে ঠোকরাতে চাইত। অনেকদিন এমন হয়েছে যে, ওর গাল-গলা থেকে রক্ত বেরিয়ে গেছে। আর ছেলেটা চিৎকার করতে-করতে পাগলের মতো ছুটে এসে ঢুকে পড়ত বাড়িতে—ওর মাকে জাপটে

ধরে থরথর করে কাঁপত।'

শুনতে-শুনতে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। মলিন সামন্ত সম্পর্কে প্রায় কোনও কথাই বাপির ডায়েরিতে ছিল না। আমার ধারণা, ডায়েরিতে লেখার মতো সেরকম কিছু বাপি জানতে পারেনি। যেমন, এই গন্ধ আর কাকের ব্যাপারটা।

কিন্তু কাক মলিনকে তাড়া করবে কেন? মলিনের গায়ের গন্ধটাই কি একমাত্র কারণ?

রসময়বাবুকে জিগ্যেস করলাম, 'এখনও কাকের ব্যাপারটা আছে?'

ঠোঁটে হাত বোলালেন রসময়। সবিতার দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর ঃ 'কী করে বলব! এখন তো ও-সময়ে ওকে বাইরে বেরোতে দিই না।'

প্রিয়বরণ হঠাৎ হাত নেড়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—কাকের ব্যাপারটা এখনও আছে। এই তো, লাস্ট মাসে—' রসময়ের দিকে মুখ ফেরাল প্রিয় ঃ 'রসময়দা, আপনার মনে নেই? মলিনকে নিয়ে আমি মিষ্টি কিনতে বেরিয়েছিলাম...তখন প্রায় সন্ধে...কোথা থেকে সাত-আটটা কাক উড়ে এসে মলিনকে একরকম ঘিরে ধরেছিল। তো আমি মলিনের হাত ধরে টান মেরে ছুটতে শুরু করি। ছুটতে-ছুটতে জীবনদার মিষ্টির দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়ি।' একটু থেমে মাথা নাড়ল প্রিয়বরণ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বলব আপনাকে, ম্যাডাম, মলিন বেচারা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমাকে বারবার জিগ্যেস করছিল, "কাকু, ওরা আমাকে সবসময় ঠোকরাতে আসে কেন? আমাকে দেখলেই ওরা সবসময় তেড়ে আসে...।" এসব কথার আমি আর কী জবাব দেব বলুন, ম্যাডাম...।'

প্রিয়বরণের মুখে 'ম্যাডাম' শুনে আমার বেশ মজা লাগছিল। মনে পড়ল, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে স্বর্ণভূষণ তরফদার আমাকে 'ম্যাডাম' বলে কথা শুরু করেছিল।

আমি হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় পৌনে আটটা বাজে। আর বেশি রাত করা ঠিক হবে না। ঝিমলি আমার পাশেই বসেছিল। ওকে ইশারা করে বললাম মিহিরদাকে তাড়া দেওয়ার জন্যে। ও মিহিরদাকে আলতো করে খোঁচা দিল। মিহিরদা ফিরে তাকাতেই চাপা গলায় বলল, 'আজকের মতো ক্লোজ ডাউন করা যাক, মিহিরদা। আবার নেক্সট্ ডে। নইলে হোটেলে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।'

কথাটা বলে ঝিমলি ওর প্যাড আর পেন বন্ধ করে ফেলল।

মিহিরদাও উঠে দাঁড়ালেন। কাঁধের ব্যাগ হাতড়ে ক্যামেরাটা বের করে নিলেন। রসময়কে বললেন, 'মিস্টার সামন্ত, আমরা পরশুদিন সন্ধেবেলা আবার আসব। মলিন যদি সুস্থ থাকে তা হলে ওর সঙ্গে একটু কথা বলব। আর এখন

আপনাদের কয়েকটা ফটো তুলব।'

সবিতা একটু যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন। সেটা দেখে রসময়ও কেমন ইতস্তত করতে লাগলেন।

মিহিরদা সেসবে আমল দিলেন না। পটাপট শাটার টিপতে লাগলেন।

রসময় আর সবিতার ছবি তোলা হয়ে গেলে মিহিরদা প্রিয়বরণের দিকে ক্যামেরা তাক করলেন।

প্রিয়বরণ সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি করে উঠল। হাত নেড়ে বলল, 'না, না, দাদা, আমার ছবি-টবি তুলবেন না—ওসব দরকার নেই।'

মিহিরদা বারণ শোনার পাত্র নন। প্রিয় হাত তুলে নিজের মুখ আড়াল করার চেষ্টা করলেও মিহিরদা সেই অবস্থাতেই ছবি তুলতে লাগলেন।

প্রিয়বরণের আপত্তির ধরন দেখে আমার কেমন যেন খটকা লাগছিল। এমনিতে সাধারণ মানুষজন তো খবরের কাগজে ছবি ছাপাতেই চায়। তা হলে কি ওর অন্য কোনও প্রবলেম আছে? এমনিতে প্রিয়কে যতটুকু দেখেছি তাতে ওকে লাজুক বলে মোটেই মনে হয়নি—বরং বেশ সপ্রতিভ বলেই মনে হয়েছে। ওর এখনকার এই প্রবল আপত্তি যেন এ পর্যন্ত দেখা প্রিয়বরণের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

প্রিয়বরণ মুখটা গোমড়া করে বসেছিল,—ঠিক যেন খেলনা কেড়ে নেওয়া কোনও বাচ্চা ছেলে।

আমরা যখন রসময় সামন্তের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসছি, রসময় আর প্রিয় আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এল।

প্রিয় আমার পাশাপাশি হাঁটছিল। আমি ওর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলাম, 'কী ব্যাপার, মুড অফ হয়ে গেল নাকি?'

ও বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল—চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল ঃ 'অ্যাঁ, কী বললেন?'

'বলছি, আপনাকে হঠাৎ গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?'

প্রিয়বরণ একগাল হেসে বলল, 'এখনও তাই দেখাচ্ছে?'

আমিও হেসে ফেললাম ঃ 'না, এখন ঠিক আছে।'

প্রিয়বরণ হঠাৎই ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমরা সবাই তো সবসময় হাসতেই চাই, ম্যাডাম। কিন্তু হয়ে ওঠে না...।'

আমি ওর কথার কোনও মানে বুঝলাম না। ফটো তোলার সঙ্গে হাসি-কান্নার সম্পর্কটা কোথায়!

আমি প্রসঙ্গ বদলাতে বলে উঠলাম, 'মলিনের জন্যে খুব খারাপ লাগছে।

ওর কত কষ্ট বলুন তো!'

হাসল প্রিয়বরণ ঃ 'কপালের লিখন, ম্যাডাম। কষ্ট পেয়েই ওকে এগোতে হবে।'

এগোবে? কোনদিকে এগোবে?

সে-কথাই জিগ্যেস করলাম প্রিয়কে। উত্তরে ও বলল, মলিন সামন্তের যা পরিণাম সেদিকেই ওকে এগোতে হবে। এটা ভবিতব্য। এটা কেউ কোনওভাবেই রুখতে পারবে না।

প্রিয়র কথা আমার কেমন হেঁয়ালি মাখানো মনে হচ্ছিল। আমি ওকে নজর করে দেখলাম। ওর চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছিল।

রসময়ের বাড়ির উঠোন পেরিয়ে আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

রাতের আকাশে চাঁদ আছে—সেইসঙ্গে অল্পবিস্তর মেঘও। হালকা বাতাস বইছিল। সেই বাতাসে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক ভেসে আসছিল। আশপাশে কোনও লোকজন চোখে পড়ল না। এর মধ্যেই রাতের চেহারা নিশুতি হয়ে গেছে।

গাড়ির কাছে এসে প্রিয় জানলার কাছে দাঁড়াল, আমাকে জিগ্যেস করল, 'আপনারা কোথায় উঠেছেন, ম্যাডাম?'

আমি কিছু বলার আগেই ঝিমলি জবাব দিল, 'বাঘমুন্ডির "পথিক" হোটেলে...।'

উত্তরটা শুনেই প্রিয় কেমন যেন দমে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমি কাল আপনাদের হোটেলে যাব...যদি বলেন তো এই অঞ্চলের চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখাব...আমার সব চেনা।'

ঝিমলি আমার দিকে ঘুরে তাকাল, হেসে নীচু গলায় বলল, 'অন্তরা, রিকোয়েস্টটা বড্ড বেশি আর্নেস্ট। ডু য়ু স্মেল এনিথিং ফিশি?'

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে প্রিয়কে বললাম, 'অবশ্যই আসতে পারেন। পুরুলিয়ায় এসেছি যখন, তখন চারপাশটা ঘুরে দেখতে ক্ষতি কী!'

প্রিয়বরণ বোধহয় ঝিমলির কথার ইঙ্গিতটা ধরতে পারেনি। কারণ, ও নিপাট ভালোমানুষের মতো বলল, 'তিনটে-সাড়ে তিনটেয় যাব, ম্যাডাম...।'

গণপতি সূত্রধর গাড়ি ছেড়ে দিল। রসময় সামন্ত আর প্রিয় আমাদের চলে যাওয়া দেখতে লাগল।

কাঁচা সড়ক ছেড়ে আমাদের গাড়ি পিচের রাস্তায় উঠে এল। তারপর অন্ধকারে হেডলাইটের বর্শা বিঁধিয়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগল বাঘমুন্ডির দিকে।

তখনও বুঝতে পারিনি পথে আমাদের জন্যে কী সাংঘাতিক ঘটনা অপেক্ষা করছে।

॥ এগারো ॥

রাস্তা ফাঁকা থাকায় গণপতি বেশ আরামে গাড়ি চালাচ্ছিল। আর আমরা মলিনের ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বলছিলাম।

মিহিরদা হঠাৎই বললেন, 'রসময় সামন্তের একটা কথা খুব কানে বাজছে, অন্তরা।'

'কী কথা?'

'না, সেরকম কিছু নয়...ওই "পুরুল্যে" শব্দটা।'

আমি অবাক হলাম, জিগ্যেস করলাম, 'কেন?'

মিহিরদা শব্দ করে হাসলেন ঃ 'আসলে কী জানো? এই গ্রাম্য অথচ মিষ্টি শব্দটা একজন পুরোদস্তুর সাহেব অথচ বাঙালি কবি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছিলেন। ছোট্ট কবিতাটা—কবিতাটার নাম "পুরুলিয়া"...।'

আমি কবিকে আঁচ করতে পারছিলাম, কিন্তু এরকম কোনও কবিতার কথা মনে পড়ছিল না।

ঝিমলি হাত-পা নেড়ে আবদারের সুরে বলে উঠল, 'মিহিরদা, প্লিজ, একটু রিসাইট করে শোনান...।'

মিহিরদা বোধহয় মুডে ছিলেন। দুবার কেশে নিয়ে বললেন ঃ

' "পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;..."

...বুঝতেই পারছ, মাইকেলের লেখা—।' একটু হেসে কথা শেষ করলেন মিহিরদা।

'বাব্বাঃ, কী শক্ত কবিতা!' ঝিমলি বলে উঠল।

মিহিরদা হেসে বললেন, 'যা বলেছ! তোমার কাছে তো আরও শক্ত লাগবে। কবিতাটার প্রতি লাইনে চোদ্দোটা করে অক্ষর—আর মোট চোদ্দো লাইন—যাকে সনেট বলে। ১৮৭২-এ লেখা। তখন মাইকেল মধুসূদন মামলা-মোকদ্দমার কাজে পুরুলিয়ায় এসেছিলেন।'

আমি মিহিরদাকে বললাম, 'আপনি দেখছি পুরুলিয়া নিয়ে বেশ মাথা ঘামিয়েছেন!'

'হ্যাঁ, অন্তরা, মাথা ঘামিয়েছি।' ভারী গলায় মিহিরদা বললেন, 'কারণ, আমার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু এখানে অ্যাসাইনমেন্টে এসে অপঘাতে মারা গেছে।'

মুহূর্তে আবহাওয়া বদলে গেল। আবছা আলোয় মিহিরদার প্রোফাইলটাকে কেমন যেন অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল। আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি, গাড়ি তখন একটা শাল-জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটছে।

ঝিমলি আমাকে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'অন্তরা, ''অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন'' মানে কী রে?'

আমি জানলা দিয়ে বাইরে চোখ মেলে ছিলাম। ঝিমলির দিকে না তাকিয়েই বললাম, 'এই বাইরেটার মতন। সেন্সলেস। কাভার্ড ইন ডার্কনেস।'

কথাটা শেষ হতে-না-হতেই অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আমার চোখ আটকে গেল।

সেখানে একটা সবুজ আলোর আভা কেমন অদ্ভুতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যেন।

আমি চাপা গলায় প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলাম, 'গণপতি, গাড়ি থামাও!'

গণপতি ব্রেক কষল সহসা। রাস্তার পিচে টায়ারের রবার সাংঘাতিকভাবে ঘষটে গেল। গাড়ি-চাপা-পড়া কুকুরের আর্তনাদ উঠল চাকার নীচ থেকে। আমরা ঝাঁকুনিতে ছিটকে গেলাম সামনের দিকে।

গাড়ি থামিয়ে গণপতি ঘুরে তাকাল আমার দিকে : 'গাড়ি থামাতে বললেন কেন, দিদি?'

আমি আঙুল তুলে জঙ্গলের দিকে দেখালাম : 'ওই দ্যাখো—।'

ওরা তিনজন অবাক হয়ে চেয়ে রইল সবুজ আলোটার দিকে।

ভোরবেলা সূর্য ওঠার সময় পুবদিক যেমন লাল হয়ে ওঠে—আকাশটা লালচে আভায় ছেয়ে যায়, এ অনেকটা সেরকম। শুধু আভার রংটা সবুজ এই যা। ঠিক যেন জঙ্গলের পেছন থেকে এক্ষুনি একটা সবুজ রঙের সূর্য উঠবে।

আমি মিহিরদাকে বললাম, 'মিহিরদা, আমাদের নামা দরকার। চলুন, দেখে আসি ওই সবুজ আলোটা কীসের।'

মিহিরদা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বললেন, 'সাড়ে আটটা প্রায় বাজে। চারপাশটা ফাঁকা—কেউ নেই। এ অবস্থায়...।'

আমি ততক্ষণে সুমোর দরজা খুলে নেমে পড়েছি। আর আমার দেখাদেখি ঝিমলিও।

গণপতি বলল, 'দিদি, রাতবিরেতে এসব জায়গা...খারাপ হতে পারে। মানে,

অপদেবতারা...নেমে আসে বলে শুনেছি...।'

আমার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল, 'অপদেবতাদের খোঁজেই আমরা এখানে এসেছি—এত তাড়াতাড়ি তাদের দেখা পেয়ে যাব ভাবিনি।' কিন্তু কিছু বললাম না।

মিহিরদাও নেমে পড়েছেন গাড়ি থেকে। তিনি গণপতিকে বললেন, 'গাড়িটা একপাশে চেপে সাইড করে রাখো, আমরা তাড়াতাড়িই ফিরে আসছি।'

মিহিরদা ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন। আমার আর ঝিমলির দিকে ফিরে বললেন, 'চলো, একটু এগিয়ে কাছ থেকে ব্যাপারটা দেখা যাক। এরকম সবুজ আলো তো কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না...।'

অন্ধকারে এবড়োখেবড়ো জমির ওপর দিয়ে আমরা তিনজনে হাঁটতে শুরু করলাম। হঠাৎই খেয়াল করলাম, আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়ে গেছে।

রাস্তার ধার থেকে খানিকটা উঁচু হয়ে তারপর জঙ্গলের জমির ঢাল শুরু হয়েছে। তবে ঢাল এতই কম যে, বহুদূর পর্যন্ত অনায়াসে নজর চলে। প্রায় দশ-পনেরো ফুট ফাঁকা জমির পর শালগাছ শুরু হয়েছে। শুরুর খানিকটা গাছগুলো বেশ ফাঁকা-ফাঁকাভাবে লাগানো হয়েছে। তারপর যতই এগোনো যায় ততই ঘন হয়েছে শালের জঙ্গল।

সবটাই ছায়া-ছায়াভাবে বুঝতে পারছিলাম। কারণ, নেলকাটারে কাটা নখের টুকরোর মতো সরু একচিলতে চাঁদটা কখন যেন পাতলা মেঘে আড়াল হয়ে গেছে।

ঝিঁঝিপোকা ডাকছিল। তার সঙ্গে অন্য কোনও পাখি অথবা প্রাণী 'কট-কট-কট' করে শব্দ করছিল। মেটাল রোড দিয়ে ছুটে যাওয়া একটা গাড়ির শব্দ পেলাম।

অন্ধকারে পা ফেলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। আমি মিহিরদার জামা খামচে ধরে হাঁটছিলাম, আর পেছন থেকে ঝিমলি আমার চুড়িদার আঁকড়ে ধরেছিল।

শালগাছগুলোর নীচের দিকে তেমন পাতা না থাকায় দূরের সবুজ আভাটা ভালোরকমই চোখে পড়ছিল। ঠিক যেন কেউ সবুজ টর্চ জ্বেলে আকাশের দিকে তাক করে রেখেছে।

ঝিমলি ছোটমাপের একটা হোঁচট খেয়ে আমাকে ধরে সামলে নিল। তারপর জিগ্যেস করল, 'ওই গ্রিনিশ গ্রো-টা কীসের হতে পারে বলে তোর মনে হয়?'

আমি মনে-মনে অনেকক্ষণ ধরে এই প্রশ্নটারই উত্তর খুঁজছিলাম। তাই বললাম, 'এরকম আগে কখনও দেখিনি—তাই কাছে গিয়ে বুঝতে চাইছি।'

হঠাৎই একটু জোরে বাতাস বইতে শুরু করল। শালগাছের পাতাগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব টের পাচ্ছিলাম। সেইসঙ্গে একটা জংলি গন্ধও নাকে আসছিল।

নিশি পাওয়া মানুষের মতো আমরা তিনজনে সেই সবুজ আলোটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

মাঝে-মাঝে হোঁচট খাচ্ছিলাম, শালগাছের গুঁড়িতে গা ঘষে যাচ্ছিল। ডানহাতের কনুইয়ের ওপরদিকটায় জ্বালা করছিল—বোধহয় ছড়ে গেছে।

হঠাৎই কোথায় যেন একটা শেয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে দূর থেকে আরও দুটো ডাক শোনা গেল।

ঝিমলি আমার জামাটা আরও জোরে খামচে ধরল।

আমি হেসে ওকে বললাম, 'বাঘ নয় রে, অর্ডিনারি শেয়াল।'

ঝিমলি হাসল, তবে হাসিটা কেমন যেন বেসুরো শোনাল। ও বলল, 'এখন অর্ডিনারি আর এক্সট্রর্ডিনারি কমপেয়ার করার মতো মনের অবস্থা নেই।'

সত্যিই বোধহয় তাই। বেশ বুঝতে পারছিলাম, একটা জেদ আমার মনের ভেতরে হাডুডু খেলছে। টেলিফোনের হুমকি, স্বর্ণভূষণের ব্ল্যাক ম্যাজিক, কোনওটাই বাপির অসহায় মৃত্যুর চেয়ে বড় নয়। হয়তো সেইজন্যেই 'অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে' আমি অনায়াসে বেপরোয়াভাবে পা ফেলে এগিয়ে চলেছি। জেদ অনেক সময় মানুষকে দিয়ে নানারকম অসম্ভব কাজ করিয়ে নেয়।

মিহিরদা হঠাৎই বললেন, 'টর্চটা সঙ্গে নিয়ে এলে ভালো হত। আজকেই যে ওটা কাজে লাগবে তা বুঝতে পারিনি। আজ ফিরে গেলে হয়—কাল দিনের বেলায় এসে...।'

'আপনারা ফিরতে পারেন, মিহিরদা—কিন্তু আমি ব্যাপারটা না দেখে যাব না।'

আমার কথা বলার ঢংটা যে বেশ বিচ্ছিরিরকম রূঢ় শোনাল সেটা বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়ে গেলাম। মিহিরদাকে বললাম, 'সরি, মিহিরদা, আমি ঠিক এভাবে বলতে চাইনি। আমার ইমোশন্যাল ব্যালান্স বোধহয় ঠিকঠাক নেই। আপনি কিছু মাইন্ড করবেন না। আসলে বাপির ব্যাপারটা...।'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মিহিরদা বলে উঠলেন, 'না, না, আমি মোটেই মাইন্ড করিনি। আমি তোমাদের সেফটির কথা ভেবেই ও-কথা বলেছিলাম।'

মিহিরদার কথা শেষ হতে-না-হতেই অস্পষ্টভাবে মন্ত্রপাঠের সুর শোনা গেল।

মন্ত্রপাঠ বলছি এই কারণে যে, পাঠের ধরনটা অন্তত সেইরকম—যদিও মন্ত্রের একটি বর্ণও আমরা বুঝতে পারছিলাম না।

অনেকটা হেঁটে এসে আমরা খানিকটা হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কারণ, তিনজনেরই শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ বেশ স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল।

মিহিরদা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেইসঙ্গে আমরাও।

'ওই দ্যাখো...!' মিহিরদা আঙুল তুলে দেখালেন।

শাল-জঙ্গলটা অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মতো। শুরুতে যে-ঢাল ওপরদিকে ছিল, বেশ খানিকটা পথ পেরোনোর পর সেটা আবার নীচের দিকে টাল খেয়েছে। তাই কচ্ছপের পিঠের ঠিক ওপরটায় এসে পৌঁছতেই সবুজ আলোর আভাটা কোথা থেকে বেরোচ্ছে তার খানিকটা হদিস পাওয়া গেল।

অনেকটা দূরে জনা-দশ-বারো লোক যেন একটা ধুনি ঘিরে বসে রয়েছে। ধুনির আগুনটা চোখে না পড়লেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার রং সবুজ।

প্রতিটি মানুষের পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা, মাথায় গামছা অথবা চাদরের ঘোমটা। মন্ত্রপাঠের অদ্ভুত সুরের তালে-তালে তারা মাথা দোলাচ্ছে।

এরকম একটা দৃশ্যের জন্যে মোটেই তৈরি ছিলাম না।

আমরা সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগলাম।

ঝিমলি জিগ্যেস করল, 'কেসটা কী?'

আমি বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, পুজো-টুজো টাইপের কিছু।'

মিহিরদা বললেন, 'মন্ত্রটা যে কী ভাষায় কে জানে!'

ঝিমলি চাপা গলায় বলল, 'হয়তো ট্রাইবাল কোনও ল্যাঙ্গুয়েজ হবে।'

আমরা শালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওই অদ্ভুত পুজো লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখতে লাগলাম। আর মিহিরদা ক্যামেরা তাক করে পটাপট শাটার টিপতে লাগলেন।

ঠিক তখনই হালকা শিসের শব্দ আমাদের কানে এল।

মিহিরদার কাছে এই শিসের গল্প শুনেছি। কিন্তু এখন বুঝলাম, গল্প শোনা এক জিনিস, আর নিজের কানে শোনা অন্য জিনিস।

শিসের শব্দটা কেমন এক হিমশীতল অনুভব আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

মনে পড়ে গেল, বাপিও এই শিসের শব্দ শুনতে পেয়েছিল।

শিসটা কেমন যেন কাটা-কাটা, তার মধ্যে কেমন একটা অধৈর্য ভাব ফুটে বেরোচ্ছিল। আর তার সঙ্গে একটা ঝোড়ো নিশ্বাসের শব্দ মিশে ছিল।

মিহিরদা প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আরও একটু এগিয়ে চলো...সাবধানে... যেন কোনওরকম শব্দ না হয়।'

অর্জুনের পাখির চোখ দেখার মতো মনোযোগে আমরা সেই অপার্থিব দৃশ্যটার দিকে নজর রেখে সামনে পা ফেলতে লাগলাম। অন্ধকারে ভুলভাল পা ফেলে হোঁচট খেতে-খেতে এগিয়ে গেলাম ওদের আরও কাছে।

তখনই আমরা চোদ্দো-পনেরো বছরের কিশোরী মেয়েটিকে দেখতে পেলাম।

লোকজনের জটলা থেকে একটু দূরে মেয়েটি একটা শালগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। একজন দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষ মেয়েটিকে আড়াল করে রেখেছিল। তার মুখে ঘোমটা, কপালে লাল তিলক, বড়-বড় দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে মুখের প্রায় সবটাই ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু ধবধবে সাদা গোল-গোল দুটো চোখ অমানুষের মতো চেয়ে আছে।

সেই লোকটা সরে যেতেই মেয়েটিকে আমরা দেখতে পেয়েছি।

দূর থেকে মেয়েটির গায়ের রং ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপরে সবুজ আলোর আভা অদ্ভুত এক মায়াজাল তৈরি করেছে।

মেয়েটি চোখ বুজে মাথা হেলিয়ে রেখেছে একপাশে। মনে হয় বেহুঁশ হয়ে আছে। ওর গায়ে একটা ফিনফিনে সাদা কাপড় জড়ানো—অনেকটা ওড়নার মতো। এ ছাড়া আর কোনও পোশাক আছে বলে মনে হল না। কালো রঙের একটা দড়ি ওর গায়ে কেটে-কেটে বসেছে। দেখে মনে হচ্ছে, দড়ির বাঁধন খুলে দিলেই মেয়েটি এলিয়ে পড়বে।

সুর করে পাঠ চলছিল—সেইসঙ্গে মাথা দোলানো।

হঠাৎই দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা মেয়েটির কাছে গিয়ে ওর বাঁধন খুলতে শুরু করল। মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছিল ওর কোনওরকম সাড় নেই। কারণ, বাঁধন ঢিলে হতেই মেয়েটি লোকটার গায়ের ওপরে এলিয়ে পড়ল।

এরপর আমাদের চোখের সামনে যা ঘটে গেল তা সিনেমাকেও হার মানায়।

দাড়ি-গোঁফওয়ালা বদখত চেহারার লোকটা অনায়াসে মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিল। সহজভাবে হেঁটে চলে এল দশ-বারোজন মানুষের জটলার ঠিক মধ্যিখানে।

সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রের রোল তিনগুণ বেড়ে গেল। তার তালে-তালে লোকগুলো পাগলের মতো মাথা দোলাতে লাগল। শিসের শব্দটা আরও অনেক তীব্র হয়ে উঠল। আমাদের চারপাশের বাতাস কেমন যেন ভারী হয়ে গেল। বাঁকা চাঁদ পুরোপুরি লুকিয়ে পড়ল ঘন মেঘের আড়ালে। শালের জঙ্গলে অন্ধকার একপরত বেড়ে গেল।

একপলকের জন্যে ওপরে মুখ তুলে তাকালাম।

আকাশের অনেকটা লালচে কালো গাঢ় মেঘে ছেয়ে গেছে। কোথা থেকে হঠাৎ উড়ে এল এত মেঘ?

ওপর থেকে চোখ নামাতেই টের পেলাম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

ঝরে পড়া শালপাতার ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে টপটপ শব্দ হচ্ছিল। আমার চোখে-মুখেও বৃষ্টির ফোঁটা টের পেলাম।

মিহিরদা ক্যামেরা নিয়ে ফটো তুলছিলেন, হঠাৎই বলে উঠলেন, 'চলো, চলে যাই—।'

আমি উত্তর দেওয়ার বদলে প্রশ্ন করলাম, 'মেয়েটাকে নিয়ে ওরা কী করছে?'

ঝিমলি আমার জামা ধরে টান মারল ঃ 'অন্তরা, লেট্স গো ব্যাক।'

আমার কেমন যেন ভয় করছিল। ওই কিশোরী মেয়েটির জন্যে। আর আমার নিজের জন্যেও। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামনের ওই অলৌকিক দৃশ্যটা আমাকে চুম্বকের মতো টানছিল। একটা অচেনা ভয় অজস্র শুঁয়োপোকার মতো আমার শরীরের ভেতরে কিলবিল করছিল। একটা ঠান্ডা হিম ভাব আমার ধমনির ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে সমস্ত অনুভূতি অসাড় করে দিতে চাইছিল।

'অন্তরা!' পেছন থেকে আবার ডাকল ঝিমলি। ওর গলাটা কেমন খসখসে শোনাল, 'লেট্স গো ব্যাক। ওরা যদি আমাদের দেখতে পায়!'

আমি যেন ইলেকট্রিক শক খেলাম।

আতঙ্কে এতই অবশ এবং বিভোর হয়ে গেছি যে, এই সম্ভাবনাটার কথা মনে আসেনি। বরং মনে প্রশ্ন জাগছিল, বাপি যা-যা দেখেছিল আমি কি তাই-তাই দেখতে পাচ্ছি?

মনটা অদ্ভুতভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে অনেক চেষ্টা করেও মনে পড়ল না ডায়েরিতে বাপি এসব কথা লিখেছিল কি না।

ঠিক তখনই দু-হাত উঁচিয়ে মেয়েটিকে শূন্যে তুলে ধরল লোকটা। তারপর সেই অবস্থাতেই পায়ে তাল ঠুকে নাচতে লাগল।

মন্ত্রপাঠ, শিসের শব্দ, আর মাথা-দোলানো দশ-বারোজন মানুষ আমাকে সম্মোহিত করে রাখল। কারণ, আমার ভেতরে ভয় আর কৌতূহলের একটা লড়াই চলছিল। শেষ পর্যন্ত কে জিতবে সেটা তখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। আর বৃষ্টির ফোঁটা যে আমাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে সেটা একটুও টের পাচ্ছিলাম না।

এমনসময় দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষটি মেয়েটিকে নীচে ফেলে দিল। না, ডব্লিউ ডব্লিউ ই-র পালোয়ানদের আছাড় মারার মতো নয়। কাউকে উঁচুতে তুলে ধরে আলতো করে ছেড়ে দিলে যেমন হয় সেইরকম।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা গাঢ় কালো ছায়া সবুজ আলোর আভাটাকে এক ঝাপটায় আড়াল করে দিল...আবার সরে গেল...তারপর আবার আড়াল করে দিল।

এইভাবে সবুজ আলো আর কালো ছায়ার লুকোচুরি চলতে লাগল। কেমন এক অদ্ভুত তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। আর পাগল করা শিসের শব্দটা আচমকা থেমে গেল।

আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস্-ধড়াস্ করতে লাগল।

বসে থাকা লোকগুলো এবার উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপরে দু-হাত তুলে বেশ জোরে-জোরে সুর করে ওদের হিজিবিজি মন্ত্র আওড়ে চলল। আর সেই সুরের তালে-তালে ওরা সবাই এপাশ-ওপাশ শরীর দোলাতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পেছন থেকে ভয়ে চিৎকার করে উঠল ঝিমলি। তারপর হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

মিহিরদা 'শ্-শ্-শ্...আস্তে...আস্তে' বলে ঝিমলিকে সামলাতে চাইলেন।

আমিও ওর দিকে তাকাতে যাব...তখনই দেখলাম, ওই জটলার দুজন লোক ঝট করে আমাদের দিকে ঘুরে তাকিয়েছে।

ওরা নিশ্চয়ই ঝিমলির চিৎকার শুনতে পেয়েছে।

'শিগগির!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মিহিরদা, ওরা আমাদের বোধহয় দেখতে পেয়েছে।'

আর দেরি না করে আমরা ছুটতে শুরু করলাম।

আমি ঝিমলির হাত ধরে টান মারলাম : 'কুইক! ছোট্ শিগগিরই!'

ঝিমলি তখনও শব্দ করে ডুকরে উঠছিল বারবার। ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছিল, 'মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলল...মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলল।'

সেই অবস্থাতেই আমরা তিনজনে ছুটে চললাম।

বৃষ্টি আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। অন্ধকারে এবড়োখেবড়ো জমিতে শালপাতা মাড়িয়ে অন্ধের মতো ছুটতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছিলাম বারবার। শালগাছের গুঁড়িতেও ধাক্কা খাচ্ছিলাম।

ওই অন্ধকারেও যে লোকগুলো আমাদের ঠাহর করতে পেরেছে সেটা বোঝা গেল পেছনদিকে তাকিয়ে।

দেখি প্রায় চার-পাঁচজন লোক আমাদের তাড়া করে ছুটে আসছে।

একটা ঠান্ডা ভয় আমাদের গিলে ফেলতে চাইল। আমরা তিনজন বলতে গেলে মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগলাম।

বুকের ভেতর যেন হাপর চলছিল। নাক-মুখ দিয়ে স্টিম ইঞ্জিনের মতো শব্দ বেরোচ্ছিল। কিন্তু পা আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলল। শুনতে পাচ্ছিলাম, পেছনে পায়ের শব্দ ক্রমশ আরও স্পষ্ট হচ্ছে। মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ক্রমেই কমছে।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, নেকড়ের তাড়া খাওয়া খরগোশ কী করে অত জোরে ছোটে। প্রাণভয় এমনই জিনিস!

দূরে টিমটিমে রাস্তার আলোগুলো চোখে পড়ছিল। সেইদিক লক্ষ্য করে আমরা পাগলের মতো ছুটছিলাম।

যে করে হোক গাড়ির কাছে আমাদের পৌঁছতেই হবে।

॥ বারো ॥

কেন যে আমি মৃত্যু-ভয় পাচ্ছিলাম সেটা ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হচ্ছিল, ওই মানুষগুলোর হাতে পড়লে আর নিস্তার নেই।

ওই ফুটফুটে কিশোরী মেয়েটি—শেষ পর্যন্ত কী হল ওর? ওকে কোন পাতালে ফেলে দিল ওই ভয়ংকর লোকটা? ওই সবুজ আলোটাই বা কীসের? মেয়েটা কি ডুবে গেল ওই সবুজ আগুনে? মেয়েটিকে ফেলে দেওয়ার পর সবুজ আলোর আভাটা অমন ছটফট করছিল কেন?

মনের মধ্যে নানান ভাবনার তুমুল আলোড়ন চলছিল। আর একইসঙ্গে আমার পা প্রাণপণে ছুটে চলছিল। পেছনে তাড়া করে আসা মানুষগুলো আর কতদূরে জানি না। সেটা দেখারও কোনও উপায় নেই—কারণ, দেখতে গেলেই কয়েক লহমা দেরি হয়ে যাবে।

আমরা তিনজনে ছুটছিলাম ঠিকই, তবে পাশাপাশি নয়—একজনের পেছনে আর-এক জন। ঘন-ঘন শালগাছ থাকায় এক লাইনে ছোটার কোনও উপায় ছিল না।

সবার আগে মিহিরদা। তারপর ঝিমলি। আর সবশেষে আমি।

জমির ঢালটা নীচের দিকে। তাই বেশ সামাল দিয়ে ছুটতে হচ্ছিল। একবার হোঁচট খেয়ে পড়লেই শেষ—উঠে দাঁড়ানোর আর সময় পাব না।

শুকনো শালপাতার ওপরে আমাদের পায়ের শব্দ বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল। তবে গায়ে-মুখে-মাথায় ঠিকরে পড়া জলের ফোঁটা দিব্যি টের পাচ্ছিলাম।

এমনসময় মিহিরদা হাঁপাতে-হাঁপাতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই যে গাড়ি!'

গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে গণপতির গাড়িটা আমারও চোখে পড়েছিল। আর-একটু কাছাকাছি হতেই দেখি গণপতি সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে দরজা খুলে দু-পা ঝুলিয়ে দিয়েছে গাড়ির বাইরে। সামনে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে জানলার খাঁজে ডানহাতের ভর রেখেছে। ওর মুখের কাছে আগুনের বিন্দু—বোধহয় বিড়ি বা সিগারেট খাচ্ছে।

শাল-জঙ্গল পেরিয়ে এসে আমরা লাফিয়ে নামলাম রাস্তায়।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম। রাস্তার পাশের মাটি-কাঁকরে গড়িয়ে গেলাম কয়েক পাক।

মিহিরদা চেঁচিয়ে গণপতিকে বললেন, 'গণপতি, জলদি গাড়ি স্টার্ট দাও—জলদি!'

আমি রাস্তায় পড়ে থাকা অবস্থাতেই দেখলাম, গণপতি যেন ইলেকট্রিক শক

খেয়ে কেঁপে উঠল। হাতের বিড়ি কিংবা সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছিটকে গিয়ে বসে পড়ল ড্রাইভারের সিটে।

ঠিক তখনই ঝিমলি আর মিহিরদা আমার দু-হাত ধরে এক ঝটকায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর একরকম টানতে-টানতে নিয়ে গেল গাড়ির কাছে।

ঝটপট দরজা খুলে আমরা উঠে পড়লাম গাড়িতে। আমি সামনে, মিহিরদা আর ঝিমলি পেছনে। তাড়াহুড়োতে আমরা যে যেমন পেরেছি গাড়িতে উঠে বসেছি। শব্দ করে দরজা বন্ধ হতে-না-হতেই এক হ্যাঁচকা দিয়ে গাড়িটা সামনে এগিয়ে গেল। আর একটা বড় পাথর বিকট ঝনঝন শব্দে পেছনের জানলার কাচ চৌচির করে গাড়ির ভেতরে এসে ঠিকরে পড়ল।

ঝিমলি ভয়ে চিৎকার করে উঠল। চেঁচিয়ে উঠলাম আমিও।

তখনই দেখি শাল-জঙ্গলের দিক থেকে তিন-চারজন খালি গা, খাটো ধুতি পরা লোক পড়িমরি করে ছুটে এসে আমাদের চলন্ত টাটা সুমো লক্ষ করে চিতাবাঘের মতো লাফ দিল।

একটা লোক গাড়ির বনেটের ওপরে এসে আছড়ে পড়ল। আর-একজন সুমোর সামনের দরজায় এসে বাড়ি খেল। দুটো হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল খোলা জানলার খাঁজ। আর তিন নম্বর লোকটা পেছনের দরজায় আছড়ে পড়ে কোনও কিছু আঁকড়ে ধরতে না পারায় ছিটকে গড়িয়ে গেল পিচের রাস্তায়।

গণপতি গাড়ির গতি ক্রমশ বাড়াচ্ছিল। শুধু সামনে বনেটের ওপরে উপুড় হয়ে থাকা লোকটা মাঝে-মাঝে ওর দৃষ্টি আড়াল করায় স্টিয়ারিং এদিক-ওদিক হয়ে যাচ্ছিল। আর লোকটার ভারী শরীর গাড়ির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এপাশ-ওপাশ নড়ছিল।

আমার পাশে জানলা আঁকড়ে ধরা লোকটা কী করে যে তখনও ওইভাবে টিকে থাকতে পেরেছে কে জানে! ওর দেহের খানিকটা ওপরে, আর বাকিটা নিশ্চয়ই রাস্তায় ঘষটে-হেঁচড়ে চলেছে। আমি জানলা দিয়ে ওর মুখ-চোখ যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে যন্ত্রণার কোনও ছাপ নেই—বরং অদ্ভুত এক জান্তব আক্রোশ আর হিংসেয় মুখটা বিকৃত হয়ে রয়েছে। ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে।

পরমুহূর্তেই লোকটা জানলা দিয়ে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। আর কী করে যেন ওর হাতটা আমার চুলের নাগাল পেয়ে গেল।

তারপর ঠিক কী যে হল ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারব না।

আমার মাথাটা টান মেরে কে যেন ঠুকে দিল গাড়ির দরজায়। চোখের সামনে রাশি-রাশি হলুদ ফুল ঝিলিক মেরে গেল। মাথাটা অবশ হয়ে গেল যন্ত্রণায়। একটা গোঙানি বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

ঝিমলি কেমন যেন হেঁচকি তুলে কাঁদছিল। আর মিহিরদা উত্তেজিতভাবে গণপতিকে বারবার বলছিলেন, 'জোরে চালাও! জোরে চালাও!'

আমি বোধহয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। মাথার বাঁ-দিকটা কেমন ভার-ভার লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাব।

কিন্তু তার আগেই ঝিমলি হাড়-কাঁপানো এক চিৎকার করে উঠল। সে-চিৎকারে ভয়ের পাশাপাশি খানিকটা হিংস্র আক্রোশও মিশে ছিল যেন। এরকম ধারালো তীক্ষ্ণ চিৎকার আমি কখনও শুনিনি।

আর শুধু চিৎকার নয়—সেইসঙ্গে আরও একটা কাজ করল ঝিমলি। এ-কাজ যে ও কখনও করতে পারে তা আমি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমার মাথাটা দরজায় ঠুকে যেতে দেখে ও যেন পাগল হয়ে গেল। লোকটার যে-হাত আমার চুল খামচে ধরেছিল সেই হাতের ওপরে খ্যাপা নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝিমলি এবং ভয়ংকর এক কামড় বসিয়ে দিল।

লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। আর একইসঙ্গে ওর হাতের বাঁধন ছেড়ে গেল গাড়ির জানলা থেকে।

ঝিমলি ওর হাতটা কামড়ে ধরে থাকায় ওর মাথাটা ঠুকে গেল জানলার পাশটায়।

ও পেছনের সিট থেকে ঝুঁকে পড়ে জাপটে ধরল আমাকে। 'অন্তরা! অন্তরা!' বলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মিহিরদা হাত বাড়িয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আর বারবার জিগ্যেস করছিলেন, 'অন্তরা, লাগেনি তো?'

আমার অদ্ভুত আরাম লাগছিল। ঝিমলির হাতের ছোঁয়াটা আমাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিল। ও আমাকে এত ভালোবাসে! এই রোগা-সোগা মেয়েটার ভেতরে এত তীব্র জোর! মা-শালিখের মতো চিলের সঙ্গে মোকাবিলা করে ছানাকে বাঁচাতে চায়!

মিহিরদার হাতের ছোঁয়াটা বাপির আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছিল আমার। সমস্ত ভয় উবে যাচ্ছিল হুউশ করে। ভেতরে একটা মোলায়েম ঠান্ডা প্রলেপ লাগিয়ে দিচ্ছিল কেউ।

খুব তাড়াতাড়ি এইসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও দেখি বনেটের ওপরে হুমড়ি খেয়ে থাকা লোকটা তখনও ছিটকে পড়ে যায়নি। শুধু ওর মাথায় জড়ানো গামছার ঘোমটা সরে গিয়ে ওটা গলার মাফলার হয়ে গেছে।

বৃষ্টি একইভাবে পড়ছিল। গাড়ির ওয়াইপার চালিয়ে দিয়েছিল গণপতি—কিন্তু তার বোধহয় তেমন একটা দরকার ছিল না।

আমরা অবাক হয়ে দেখছিলাম, খালি গায়ে লোকটা কী এক অলৌকিক

কৌশলে টাটা সুমোর বনেটের ওপরে লেপটে রয়েছে। নিজেকে সামলাতে লোকটা ডানহাতে একটা ওয়াইপারের গোড়া চেপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে ওয়াইপারের নড়াচড়া থেমে গেল।

মিহিরদা চেঁচিয়ে বললেন, 'লোকটাকে ছিটকে ফেলে দাও, গণপতি! কুইক! যেভাবে হোক শয়তানটাকে ছিটকে ফেলে দাও!'

এতসব ঘটনা দেখে গণপতি দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। শুধু গাড়িটা সামনে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এখন মিহিরদার সঙ্গে-সঙ্গে আমি আর ঝিমলিও গলা মেলালাম। আমরা তিনজনে চেঁচিয়ে একই কথা বলতে লাগলাম ওকে।

গণপতি সূত্রধর আমাদের কথা শুনল।

হঠাৎ করে ও এমন ব্রেক কষল যে, আমরা সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। রাস্তা ভিজে থাকায় ব্রেক কষার শব্দ তেমন জোরালো হল না। গাড়ির চাকা বেশ খানিকটা পিছলে সামনে এগিয়ে তারপর থামল।

একইসঙ্গে বনেটের ওপরে লেপটে থাকা মুসকো লোকটা ছিটকে পড়ল রাস্তায়। একটা ওয়াইপার ও আঁকড়ে ধরেছিল। কিন্তু নিউটনের গতিজাড্যের নীতি মেনে ও ছিটকে গেল। ওয়াইপারটা গাড়ি থেকে উপড়ে গিয়ে ওর হাতেই ধরা রইল।

দাঁতে দাঁত চেপে গিয়ার বদলাল গণপতি। গাড়িটাকে বেশ খানিকটা ব্যাক করে নিল। তখনই দেখা গেল, রাস্তায় ছিটকে পড়া লোকটা উঠে দাঁড়াচ্ছে।

ওত পাতা শিকারি জন্তুর মতো সামনে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল লোকটা। যেন এখনই আমাদের গাড়িটার ওপরে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

গাড়ির হেডলাইটের আলোয় হালকা বৃষ্টির পরদা ডিঙিয়ে লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এই প্রথম ওদের কাউকে আমরা ভালো করে দেখতে পেলাম।

গায়ের রং কালো। পেটানো ভারী স্বাস্থ্য। মাথায় কদমছাঁট চুল। বেশ পুরু গোঁফ। গালে, থুতনিতে, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গোল-গোল তীব্র চোখ—তার ওপরে মোটা ভুরু। মুখটা সামান্য হাঁ করা—ঝকঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে। আর ঠোঁটের কোণ বেয়ে সরু রক্তের রেখা গড়িয়ে পড়ছে। বোধহয় গাড়ির ওপরে লাফিয়ে পড়ার সময় চোট পেয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, লোকটার মুখে কোনও ভয়-ডর নেই। যেন অনায়াসে ও একটা টাটা সুমোর সঙ্গে টক্কর নিতে পারে।

আর নিলও তাই।

গাড়িটা ব্যাক করার পর আবার ব্রেক কষল গণপতি। গিয়ার বদলাল। তারপর

এক হ্যাঁচকায় গাড়িটাকে সামনে নিয়ে গেল।

লোকটাকে এড়িয়ে সাপের মতো বাঁক নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল গণপতি। গাড়িটা ওকে পাশ কাটিয়ে পিছলে পালানোর সময় লোকটা গাড়ি লক্ষ করে পাগলের মতো ঝাঁপ দিল।

গতিবেগে গণপতি ওকে হারিয়ে দিল বটে, কিন্তু বেপরোয়া লোকটার দেহ উড়ে এসে টাটা সুমোর গায়ে আছড়ে পড়ল। বেশ জোরে ভোঁতা শব্দ হল একটা।

আমাদের গাড়ি হু-হু করে ছুটে চলল।

পেছনের ভাঙা জানলা দিয়ে ফেলে আসা রাস্তার দিকে তাকালাম। কিন্তু বৃষ্টি আর অন্ধকারে লোকটাকে ভালো করে ঠাহর করতে পারলাম না।

অনেকটা পথ চুপচাপ পেরিয়ে গেলাম আমরা। ঝিমলি নিজেকে এখন সামলে নিলেও আমার কাঁধের কাছটা খামচে ধরে আছে। মিহিরদা বড়-বড় শ্বাস ফেলছিলেন। আর আমার বুকের ভেতরে তোলপাড় চলছিল।

'পথিক'-এর কাছাকাছি পৌঁছে গণপতি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। মিহিরদাকে লক্ষ করে ও প্রশ্ন ছুড়ে দিল, 'লোকগুলো কে, দাদা?'

মিহিরদা দুবার কেশে নিয়ে বললেন, 'কী করে জানব! তোমাকেই সে-কথা জিগ্যেস করব ভাবছিলাম।'

গণপতি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ওর চোখ সামনের দিকে চেয়ে থাকলেও চোয়াল যে কিছুটা শক্ত হয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

একটু পরে ও বলল, 'ওরা কারা বলতে পারব না—তবে মাঝে-মাঝে রাত-বিরেতে ওরকম সবুজ আলো আমি দেখেছি। আমরা ওটাকে অপদেবতার আলো বলে জানি। সেইজন্যেই দিদিকে তখন বারণ করেছিলাম।'

মিহিরদা জিগ্যেস করলেন, 'তুমি এদিকটায় প্রায়ই আসো নাকি?'

'সপ্তায় দু-একবার তো আসি। তবে গোবিন্দপুরের দিকেও আমি একবার এরকম আলো দেখেছি। আমার মা বলে, এসব তাল-বেতাল ডান-যকের আলো। আলো জ্বেলে ওরা মানুষকে ডাকে—নিশির ডাকের মতো।'

ঝিমলি বলতে যাচ্ছিল, 'তা হলে ওই মেয়েটাকে—।'

চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, মিহিরদা ওর হাত চেপে ধরলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝিমলি চুপ করে গেল।

ভালোই করেছেন মিহিরদা। গণপতির সামনে ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা না করাই ভালো।

কাঁচা রাস্তায় গাড়ি ঢুকে পড়েছিল। এবড়োখেবড়ো কাঁকুরে মাটির রাস্তায় টাল খেতে-খেতে আমাদের গাড়ি পৌঁছে গেল 'পথিক'-এর কাছে।

বৃষ্টি কিছুটা কমে এসেছিল, কিন্তু থামার সেরকম লক্ষণ আছে বলে মনে হল না।

মিহিরদা গণপতিকে পরদিন দুপুরে আসতে বললেন। তারপর গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন।

আমি গণপতিকে বললাম, 'গণপতি, আমরা কোথায় যাই-না-যাই, কী করি-না-করি, এসব কথা আগ বাড়িয়ে কাউকে বলতে যেয়ো না যেন।'

'না, না, দিদি—কী যে বলেন!' জিভ কেটে বলল গণপতি।

আমি আর ঝিমলি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। চটপটে পায়ে এগিয়ে গেলাম হোটেলের সদর দরজার দিকে।

তখনই দেখলাম, সদরের আবছা আঁধারে সুখেন্দু পাল দাঁড়িয়ে আছে। ওর আঙুলে ধরা সিগারেট জ্বলছে।

আমাদের দেখেই সুখেন্দু পাল বলে উঠল, 'আপনারা এত রাত করে ফেললেন! আমি এদিকে চিন্তায়-চিন্তায় মরছি। কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?'

মিহিরদা আমার দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন, 'তেমন কোথাও নয়...এই একটু এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়েছিলাম।'

'হুঁ—।' বলে সুখেন্দু পাল সিগারেটে জবর টান দিল। ওর 'হুঁ'-এর টানটা এমন ছিল যে, মিহিরদার কথায় যে তেমন খুশি হয়নি সেটা স্পষ্ট ধরা দিল।

ঝিমলি সদর দরজার বাইরে মাথা বাড়িয়ে শব্দ করে থুতু ফেলল। গাড়ির জানলা দিয়েও ওকে বারকয়েক থুতু ফেলতে দেখেছি। আমায় চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরা লোকটার হাত কামড়ে ওর নিশ্চয়ই গা ঘিনঘিন করছিল। মুখে রক্তও হয়তো গিয়ে থাকবে। কিন্তু গাড়িতে জলের বোতল নিয়ে ও মুখ ধোয়নি। হয়তো সেরকম মনের অবস্থা ছিল না। তাই বারবার শুধু থুতু ফেলেছে। আর বলেছে, ওর গা গুলোচ্ছে।

আমার মাথা ব্যথা করছিল। শরীরটাও কেমন টাল খেয়ে যেতে চাইছিল। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে মোটেই ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, কতক্ষণে স্নান-টান করে বিছানায় কাত হয়ে পড়ব। কিন্তু এই ম্যানেজার লোকটা এমনভাবে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ হচ্ছিল। সেইসঙ্গে বাতাস খেলছিল এলোমেলো। 'পথিক'-এর বাইরে দাঁড়ানো ছোট-বড় গাছগুলো বাতাসের তালে-তালে খেলা করছিল।

সুখেন্দু পাল চোখ ছোট করে সিগারেটে টান দিল। তারপর একরকম নির্লজ্জভাবে আমাদের ভেজা পোশাক-আশাক জরিপ করতে শুরু করল।

আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটাকে ধাক্কা মেরে হটিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাই। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁই জায়গা—এখানে হঠকারী কিছু করে বসলে আমরাই অসুবিধেয় পড়ব। তা ছাড়া, এখানে আমরা একটা জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি।

আমি অসহায় চোখে মিহিরদার দিকে তাকালাম।

সুখেন্দু পাল বলল, 'সঙ্গে গাড়ি ছিল...তা সত্ত্বেও এরকম কাক-ভেজা ভিজলেন কী করে? তা ছাড়া...' আমার দিকে সিগারেট উঁচিয়ে বলল, 'ম্যাডামের জামাকাপড়ে কাদার দাগ...আপনারা সত্যি-সত্যি কোথায় গিয়েছিলেন বলুন দেখি!'

মিহিরদা আমার আর ঝিমলির মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে নিলেন। তারপর সুখেন্দু পালের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি এত করে জানতে চাইছেন, তাই বলছি। আমরা সবাই খবরের কাগজের লোক। একটা স্টোরি করতে এখানে এসেছি।'

সিগারেটে টান দিয়ে ঠোঁট বেঁকাল সুখেন্দু পাল ঃ 'তিন-চার মাস আগে আর-একজন রিপোর্টার যেমন এসেছিল? কী যেন নাম ছিল? সুরঞ্জন...সুরঞ্জন মুখার্জি না কী যেন?'

'সুরঞ্জন মজুমদার।' মিহিরদা চাপা গলায় বললেন।

'হ্যাঁ, মজুমদার।' ধোঁয়া ছাড়ল সুখেন্দু পাল ঃ 'তা স্টোরি করতে গিয়ে কী হল? সব শেষ। আপনি তো তার ডেডবডি নিতে এসেছিলেন—তাই না? তা এত রিস্ক নিয়ে স্টোরি করতে যাওয়ার কী দরকার বলুন তো! বেশ তো কলকাতায় খাচ্ছিলেন-দাচ্ছিলেন...শুধু-শুধু ঝুটঝামেলা...।'

আমার লোকটাকে ঠাস করে এক থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করছিল। দেখলাম, মিহিরদা ঠিক সেই কাজটাই করলেন—তবে কথা দিয়ে।

মাথা ঝুঁকিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন মিহিরদা, তারপর সুখেন্দু পালের মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'পালমশাই, আপনি বোধহয় রিপোর্টারদের ঠিকমতো চেনেন না। তারা যখন কবর খুঁড়ে খবর বের করে তখন তাদের কোনও ভয়ডর থাকে না। কারণ, এটাই তাদের পেশা। আপনি আমাকে বলেছিলেন, এখানে অনেক পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়। ধরে নিন, সেগুলো নিয়েই আমরা স্টোরি করতে এসেছি। যদি আমাদের ভালো-মন্দ কিছু হয়, তা হলে দেখবেন, কলকাতা থেকে আবার একডজন রিপোর্টার এসে হাজির হবে। তারপর তাদের যদি কিছু হয়...' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন মিহিরদা ঃ 'তখন এত লোক আসতে থাকবে যে, কোনওভাবেই আর সামাল দিতে পারবেন না। আপনাদের মতো পাবলিকদের মিডিয়া একেবারে গুঁড়িয়ে দেবে। তারচেয়ে বেটার, আপনি আপনার হোটেল নিয়ে মাথা ঘামান। নিন,

এখন সরুন—আমাদের যেতে দিন—।'

মিহিরদার রুক্ষ কথায় সুখেন্দু পাল কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সরে গেল একপাশে।

ওকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মিহিরদা বললেন, 'পালমশাই, নিজের চরকায় তেল দেওয়ার চেয়ে ভালো কাজ আর নেই। দিয়ে দেখুন, ভালো লাগবে। আমাদের খাবারটা আধঘণ্টা পর চারনম্বর রুমে পাঠাবেন।'

একদমে কথাগুলো বলে মিহিরদা এগিয়ে গেলেন। আমি আর ঝিমলি মিহিরদার পিছু নিলাম।

মিহিরদার সাহসী কথায় ভালো যেমন লাগছিল, তেমনই একটু-আধটু ভয়ও করছিল। সুখেন্দু পাল আমাদের নতুন কোনও সর্বনাশের ফন্দি আঁটবে কি না কে জানে!

॥ তেরো ॥

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে মিহিরদার ঘরে তিনজনে জড়ো হয়ে বসলাম। ঘড়ির কাঁটা সবে সাড়ে দশটা পেরিয়েছে, তবে চারপাশের হালচাল দেখে অনায়াসেই মনে হতে পারে, এখন নিঝুম রাত।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। বৃষ্টি আধঘণ্টা আগে থেমে গেছে। বাতাসের মাতলামিও আর নেই। ঘরের একটিমাত্র খোলা জানলায় শুধু অন্ধকার রাত আর অন্ধকার গাছপালা।

শাল-জঙ্গলের ঘটনাটা নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম।

বাপির ডায়েরিতে এরকম কোনও ঘটনার কথা আমি পাইনি। তবে সবুজ আলোর একটা ব্যাপার বোধহয় কোথাও লেখা ছিল।

ঝিমলি জিগ্যেস করল, 'জঙ্গলের মধ্যে ওই লোকগুলো কী করছিল, মিহিরদা?'

মিহিরদা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। ছোট্ট করে কেশে বললেন, 'যা করছিল বলে মনে হয়েছে সেটা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না—হয়তো তোমরাও করবে না।'

'কেন, কী মনে হয়েছে আপনার?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওটা স্যাক্রিফাইস।'

'স্যাক্রিফাইস! তার মানে?' ঝিমলি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'স্যাক্রিফাইস...মানে, বলি। পুজো-টুজোর সময়ে যেমন অনেকে পশুবলি দেয়...অনেকটা সেইরকম। ধরো...' সিগারেটে দুবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন মিহিরদা। তারপর চিন্তায় ডুবে যাওয়া গলায় বললেন, 'ধরো, ওই লোকগুলো ওই মেয়েটাকে বলি দিয়েছে—।'

'কিন্তু বলি তো দেয়নি।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ—' মাথা নাড়লেন মিহিরদা ঃ 'ঠিক বলি নয়—তবে তার কাছাকাছি। ওরা নাচছিল, সুর করে মন্ত্রও একটা পড়ছিল বোধহয়। তারপর মেয়েটাকে নিয়ে...যদ্দূর মনে হয়...একটা গর্ত কিংবা ওরকম একটা কিছুর মধ্যে ফেলে দিল। হয়তো কোনও দেবতার নামে ওকে উৎসর্গ করল।'

'দেবতা, না অপদেবতা?' আমি বলে উঠলাম।

ঝিমলি আমার দিকে তাকাল ঃ 'অপদেবতা মানে?'

'ইভ্‌ল স্পিরিট। লর্ড অফ ডার্কনেস। ডেমন। এর যে-**কোনও একটা হতে পারে**।'

'মাই গড!' ঝিমলি যেন ভয় পেয়ে শিউরে উঠল।

মিহিরদা সিগারেটে কয়েকটা ছোট-ছোট টান দিলেন, হেসে বললেন, 'অপদেবতা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে কোন অপদেবতা মাটির নীচে বাস করেন তা বলতে পারব না। আমার শুধু মনে হয়েছে, মেয়েটাকে বোধহয় স্যাক্রিফাইসই করা হল। ও আর বেঁচে নেই।'

মিহিরদার শেষ কথাটা খট করে কানে বাজল ঃ 'ও আর বেঁচে নেই।'

ব্যাপারটা কি এতই সহজ! আর কেউ কখনও মেয়েটার খোঁজখবর করবে না? ওর মা, বাবা, ভাই, বোন—তারা কেউ কি পুলিশে গিয়ে মিসিং ডায়েরি লেখাবে না? একটা জলজ্যান্ত মেয়েকে উধাও করে দেওয়াটা এতই সাদামাটা ঘটনা!

'আর ওই শিসের শব্দটা?' আমি জানতে চাইলাম।

'কী জানি! ওটা শুনলেই রক্ত কেমন হিম হয়ে আসতে চায়।' কথা বলতে-বলতে মিহিরদা যেন কেঁপে উঠলেন।

মনে পড়ল, সুখেন্দু পাল মিহিরদাকে বলেছিল, এখানে অনেক পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়। আজ রাতের ঘটনাটা কি তারই একটি নমুনা?

মিহিরদা বারকয়েক মাথা নেড়ে বললেন, 'অন্তরা, আজ আমরা বোধহয় আচমকা একটা গোপন ব্যাপার দেখে ফেলেছি। মানে, ওই গোপন পুজো-আর্চা আর বলির ব্যাপারটা। সেইজন্যেই ওই লোকগুলো ওরকম হিংস্রভাবে আমাদের দিকে তেড়ে এল।'

ঝিমলি বলে উঠল, 'লোকগুলো যেভাবে ছুটে এসে আমাদের গাড়ির ওপরে

বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাতে মনে হল ওদের প্রাণের কোনও ভয়ডর নেই। ঠিক যেন সুইসাইড স্কোয়াড।'

ঝিমলির কথাটা আমার মনে ধরল। আমাদের তাড়া করে আসা লোকগুলোর ধরন-ধারণ ঠিক এই দুটো শব্দেই ব্যাখ্যা করা যায় ঃ সুইসাইড স্কোয়াড।

কিন্তু এতটা মনের জোর ওরা পেল কোত্থেকে যে, ওদের গোপন পুজো গোপন রাখতে মরতেও ওদের ভয় নেই!

আমার মাথা দপদপ করছিল, ভীষণ ক্লান্তও লাগছিল। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল দুশ্চিন্তা।

মিহিরদাকে জিগ্যেস করলাম এরপর কী করা যায়।

মিহিরদা বললেন, 'দ্যাখো অন্তরা, আমরা যা আজ দেখেছি সুরঞ্জনের ডায়েরিতে সেরকম কোনও ঘটনার কথা লেখা ছিল না—তবে এক জায়গায় সবুজ আলোর আভার কথা বলা ছিল। আমরা আজ সবুজ আভার চেয়েও বেশি কিছু দেখে ফেলেছি। শুনেও ফেলেছি। এটা আমাদের সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য জানি না। ভাবছি...' মিহিরদার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঝুঁকে পড়ে সেটা মেঝেতে ঘষে নিভিয়ে দিলেন। তারপর চিবুক সামান্য উঁচু করে ভাবতে লাগলেন।

আমি বাপির এই অন্তরঙ্গ বন্ধুটিকে দেখছিলাম।

ঘরের টিমটিমে বাল্‌বের আলো ওপর থেকে এসে মিহিরদার কপালে, নাকে, গালে হাইলাইট তৈরি করেছে। ফলে কপাল আর গালের ভাঁজগুলো বড্ড বেশি চোখে পড়ছে। এখানে এসে এই একটা বেলাতেই মিহিরদার বয়েস যেন বেড়ে গেছে। কোথায় যেন একটা চাপা কাবু ভাব ছাপ ফেলেছে। অথচ মলিনের বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় মিহিরদাকে আমার তেজি আর সাহসী মনে হয়েছিল। এমনকী ঘণ্টাখানেক আগেও সুখেন্দু পালকে যে-ধাতানি তিনি দিয়েছেন, তাতেও নির্ভীক রিপোর্টার মিহির গাঙ্গুলির দেখা পেয়েছিলাম।

কিন্তু এখন...।

আমার মনে হল, ঝিমলির সর্বনেশে কথাটাই মিহিরদাকে নড়িয়ে দিয়েছে।

সুইসাইড স্কোয়াড।

ওদের কী এমন গোপন কথা যা প্রাণ দিয়েও গোপন রাখতে হবে!

প্রাণ দিতে যেমন ওরা পেছপা নয়, তেমন প্রাণ নিতেও।

মিহিরদা গাল চুলকোতে-চুলকোতে থেমে-থেমে বললেন, 'অন্তরা, ঝিমলি—আমাদের এখন থেকে খুব সাবধানে চলতে হবে। বুঝতেই পারছ, নিজেদের গোপন কথা গোপন রাখতে ওদের চেষ্টার কোনও শেষ নেই। এজন্যে ওরা প্রাণ দিতেও পারে...নিতেও পারে। কাল থেকে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে।'

আমি বললাম, 'এই কারণেই বোধহয় ওরা বাপির ডায়েরিটা ফেরত চাইছিল, যাতে বাপির ডায়েরির ব্যাপারগুলো জানাজানি না হয়। তো এখন কী করবেন, মিহিরদা?'

'মলিনের ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ আমরা চালিয়ে যাব। পাশাপাশি সুরঞ্জনের ব্যাপারটাও। হয়তো সুরঞ্জন এমন অনেক কিছু দেখেছে যা ও ডায়েরিতে লিখে যেতে পারেনি। সেগুলোরও খোঁজ করতে হবে আমাদের। যেমন, কাল ওই শাল-জঙ্গলে গিয়ে দিনের আলোয় পুজোর জায়গাটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে আসতে হবে। আর...' গালে হাত বোলালেন মিহিরদা ঃ 'আর মধুসূদনের সঙ্গেও একবার কথা বলতে হবে।'

'সুখেন্দু পাল বোধহয় সেটা চায় না।'

'হতে পারে, সুখেন্দু পাল হয়তো ওই লোকগুলোর সঙ্গে আছে। কে বলতে পারে!'

ঝিমলি বলে উঠল, 'তা হলে আঙ্কল, ওঁর সঙ্গে টেমপোরারিলি কমপ্রোমাইজ করে নিন। যাতে মিস্টার পাল ভাবেন যে, আমরা কিছুই দেখিনি। অথবা দেখলেও সেটা আর কাউকে বলব না, কাগজেও পাবলিশ করব না।'

ঝিমলির কথাটা আমার মনে ধরল। মিহিরদারও।

সেটা বোঝা গেল মিহিরদার পরের কথায়।

'কাল সকালেই আমি সুখেন্দু পালের সঙ্গে মিটমাট করে নিচ্ছি। তারপর দেখি কী হয়।'

এরপর আমরা শুতে চলে গেলাম।

ঝিমলি আমাকে ভয় পাওয়া বাচ্চা মেয়ের মতো আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। মিথ্যে বলব না, ও আমাকে আঁকড়ে থাকায় আমিও যেন খানিকটা ভরসা পাচ্ছিলাম।

অনেক দেরি করে ঘুম এল আমার। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন এল।

আর স্বপ্নের মধ্যে এল বাপি।

রবিবার দুপুর।

মাথার ওপরে সূর্য আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। মনেই হচ্ছিল না কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে।

গতরাতের শাল-জঙ্গলের কাছে এসে গণপতি জিপটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এমনভাবে রাখল যেন গতকাল রাতের পার্কিং-এর জায়গাটাই ও খুঁজে নিতে চাইছে।

গাড়ি থামতেই আমি, ঝিমলি আর মিহিরদা নেমে পড়লাম। মিহিরদার কাঁধের

ঝোলা-ব্যাগে প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়া জলের বোতল আর ক্যামেরা।

গনগনে রোদ্দুরে জায়গাটা কেমন যেন ম্যাজিকের মতো ভোল পালটে ফেলেছে। যে-শালগাছগুলো কাল রাতের অন্ধকারে গা-ছমছমে ঢঙে দাঁড়িয়েছিল, হাতছানি দেওয়ার ভঙ্গিতে বড়-বড় পাতা দোলাচ্ছিল, এখন সেগুলোকে কী নিরীহই না দেখাচ্ছে! যেন সব ভোলাভালা শিশু—কাল রাতের ব্যাপার-স্যাপার ওরা কিচ্ছুটি জানে না।

আমরা শাল-জঙ্গলের এবড়োখেবড়ো জমিতে উঠে পড়লাম।

মিহিরদা ক্যামেরা বের করে গোটাদুয়েক ছবি তুললেন।

শুকনো শালপাতা মাড়িয়ে এগোতে-এগোতে ঝিমলি আমাকে জিগ্যেস করল, 'কালকের ইনসিডেন্টটা ঠিক কোথায় হয়েছিল বল তো?'

আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে চোখ বুলিয়ে খানিকটা আন্দাজে ভর করেই একদিকে আঙুল দেখালাম ঃ 'মনে হয় ওই জায়গাটায়—।'

মিহিরদা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে গোয়েন্দার চোখে সবকিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলেন। হয়তো কাল রাতের কোনও চিহ্ন কিংবা সূত্র খুঁজে পেতে চাইছিলেন।

হঠাৎই একটা শালগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিমলি। মাটির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই দেখ! এটা কী বল তো—!'

আমি আর মিহিরদা ওর দিকে ঘুরে তাকালাম। পায়ে-পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। আমাদের নজর মাটিতে পড়ে থাকা তালগোল পাকানো একটা জিনিসের দিকে।

কাছে গিয়ে জিনিসটাকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বলে মনে হল। হালকা গোলাপি রং, জলে ভেজা।

জিনিসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে পারলে ভালো হত। আমি মিহিরদার দিকে তাকালাম—অর্থাৎ, 'মিহিরদা, কিছু একটা করুন।' কিন্তু লক্ষ করলাম, মিহিরদা একটু ইতস্তত করছেন।

তাই আমি আর দেরি করলাম না। ঝুঁকে পড়ে জলে ভেজা পুঁটলিটা তুলে নিলাম।

সামান্য পরীক্ষাতেই বোঝা গেল, পুঁটলিটা আসলে একটা গোলাপি রঙের ফ্রক, একটা ইজের, আর একটা টেপজামা।

কোনও কিশোরী মেয়ের পোশাক।

আমার মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এগুলো কাল রাতের মেয়েটার পোশাক নয় তো!

মিহিরদাকে সে-কথা বললাম।

ঝিমলি জামাকাপড়গুলো দেখতে-দেখতে বলল, 'হোয়াট ডাজ ইট মিন, অন্তরা?'

আমি মনে-মনে কাল রাতের দৃশ্যটা আবার দেখতে পাচ্ছিলাম। কী বিচিত্র অথচ করুণ দৃশ্য!

সেই দৃশ্যটা যখন চোখের সামনে সিনেমার মতন ভেসে উঠছিল তখনই হঠাৎ আমার মনে পড়ল মিহিরদার বলা কথাটা ঃ '...ধরো, ওই লোকগুলো ওই মেয়েটাকে বলি দিয়েছে।'

যদি তাই হয়, তা হলে...।

আমি মিহিরদাকে লক্ষ করে বললাম, 'মিহিরদা, আমার মনে হয়, কাল রাতের ওই মেয়েটাকে লোকগুলো...ইয়ে...মানে...মেরে ফেলার আগে...।'

'ওর জামাকাপড় খুলে ওই সাদা থানটা পরিয়ে দিয়েছে।' আমার কথা শেষ করলেন মিহিরদা ঃ 'আর শুধু তাই নয়—হয়তো গায়ে-মাথায় জল ঢেলে ওকে স্নানও করিয়েছে। বলির আগে যেমন করায়।'

'কী হরিব্‌ল!' বলে উঠল ঝিমলি।

দিনের বেলায় ঝকঝকে রোদে দাঁড়িয়েও আমার ভেতরটা কেঁপে উঠল ভয়ে। কাল রাতের বেচারি মেয়েটা এখন কোথায়? আমরা এখানে কীসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে এসেছি? শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারব তো! বাপি কিন্তু পারেনি।

মিহিরদা কী যেন বলছিলেন। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় ওঁর কথা খেয়াল করিনি। ফলে কথার শেষটুকু শুধু শুনতে পেলাম।

'...এগুলো বৃষ্টিতে ভেজা নয়, বুঝলে, অন্তরা।'

'কোনগুলো?' আমি চমকে উঠে জিগ্যেস করলাম।

'এই যে, এই জামাকাপড়গুলো।' আমার হাতে ধরা পোশাকগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন মিহিরদা ঃ 'কারণ, এগুলো শালগাছের গোড়ায় ছিল, শালগাছের পাতার ছাতা ছিল মাথার ওপরে—তাই বৃষ্টিতে ভিজে দলা পাকিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আগে থেকেই এগুলো ভেজা ছিল।'

আমি কেমন একটা ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মিহিরদা জামাকাপড়গুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে ঠেলেঠুলে ঝোলা-ব্যাগে ঢোকালেন। তারপর আমরা আবার সামনে এগোতে লাগলাম।

আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই আসল জায়গাটা বোধহয় খুঁজে পেলাম।

শাল-জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বোঝাই যায়, জায়গাটা ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। লক্ষ করলাম, মিহিরদা মেটাল রেডের দিকে বারবার তাকিয়ে কাল রাতের দৃশ্যটার ঠিকঠাক কো-অর্ডিনেট বের করার চেষ্টা করছেন।

আর ঝিমলি শিকারি কুকুরের মতো জমিটার প্রতিটি ইঞ্চি জরিপ করে দেখছে। দিনের আলোয় কাল রাতের ভিতু মেয়েটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

জমিতে স্পষ্ট কতকগুলো দাগ আমাদের চোখে পড়ল ঃ লম্বা-লম্বা ফাটলের দাগ। ঠিক যেন মনে হচ্ছে, এই ফাটল বরাবর জমিটা ফাঁক হয়ে গিয়েছিল—পরে আবার কাছাকাছি চলে এসে গহ্বরটা বুজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ঝিমলি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'অন্তরা, এই দেখ—।'

আমি আর মিহিরদা তখন জমিতে উবু হয়ে বসে পড়েছি, ফাটলের জোড়গুলো পরীক্ষা করছি।

আমরা উঠে দাঁড়ানোর আগেই ঝিমলি ছুটে এল আমাদের কাছে—জিনিসটা আমাদের দেখাল।

ময়লা কালচে ছোট একটা লকেট। তামা কিংবা ব্রোঞ্জের তৈরি। অন্তত রংটা সেইরকম। আর সাইজ প্রায় একটাকার কয়েনের মতো।

লকেটের সঙ্গে ঝালাই করা যে-আংটা থাকে, দেখলাম সেটা ক্ষয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। হয়তো সেইজন্যেই লকেটটা চেন বা সুতো থেকে খুলে পড়ে গেছে।

আমরা তিনজনে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে লকেটের ছবিটা বোঝার চেষ্টা করলাম।

লকেট এবং তার ছবিটা বেশ কাঁচা হাতে তৈরি। তবে দুটো চোখের ছবি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার নীচে একটা আড়াআড়ি দাগ। সেই দাগের মাঝ-বরাবর দুটো শুঁড়-মতন কী যেন বেরিয়ে এসেছে। এ ছাড়া গোটা লকেটেই চাকা-চাকা দাগ—অনেকটা মাছের আঁশের মতো।

অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা আমরা দেখলাম। তারপর আমি জিগ্যেস করলাম, 'মিহিরদা, কীসের ছবি এটা?'

'জানি না, তবে এদিককার অনেক লৌকিক দেব-দেবী আছেন—যেমন, বাণেশ্বর, কালভৈরব, রায়বাঘিনী, জাহিরা টাড়। এঁরা সব গ্রামঠাকুর আর গ্রামদেবী। এঁদের থানে গাঁয়ের লোকেরা পুজো-টুজো দেয়। এটা হয়তো সেরকমই কোনও দেব-দেবীর লকেট...মানে, আন্দাজে বলছি আর কি।'

'লৌকিক দেব-দেবী মানে?' ঝিমলি জানতে চাইল।

আমি বললাম, 'লোকাল লোকেরা যেসব গড-টড তৈরি করে পুজো করে। সামথিং লাইক দ্যাট।'

মিহিরদা উঠে দাঁড়িয়ে লকেটটা পকেটে ভরলেন ঃ 'অন্তরা, হয়তো এই জায়গাটা সেই দেবতার থান। কাল রাতে হয়তো ওঁরই পুজো হচ্ছিল।'

'থান মানে?'

ঝিমলির প্রশ্নে আমি মোটেই বিরক্ত হলাম না। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ব্যাপারটার মধ্যে ও ঢুকে পড়েছে। তাই এখন যা-কিছু হোক সবই ও আতিপাতি করে জানতে চায়।

ওর প্রশ্নের উত্তর দিলেন মিহিরদা। বললেন, 'থান মানে প্লেস অফ ওয়ারশিপ —অথচ যেখানে জেনারালি মন্দিরের মতো কোনও স্ট্রাকচার নেই।'

আমরা আবার এদিক-ওদিক পায়চারি করতে শুরু করেছিলাম। প্রত্যেকের অনুসন্ধানী নজর মাটির দিকে।

হঠাৎই একজায়গায় শুকনো শালপাতা পা দিয়ে সরাতেই একটা চওড়া ফাটলের দেখা পেলাম।

একটা সরু ফাটল আঁকাবাঁকাভাবে পথ চলতে-চলতে আচমকা যেন চওড়া হয়ে গেছে।

ফাটলটা ভালো করে দেখছি, তখনই নজরে পড়ল শালপাতার ফাঁকে-ফাঁকে সবুজ রঙের কী যেন।

আমি 'মিহিরদা!' বলে ডেকে উঠলাম।

মিহিরদা তদন্ত মুলতুবি রেখে ছুটে এলেন আমার কাছে। সেইসঙ্গে ঝিমলিও।

সবুজ জিনিসগুলো মিহিরদাকে দেখালাম। দেখামাত্রই মিহিরদা চমকে উঠলেন। ওঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'সেই সবুজ শ্যাওলা মনে হচ্ছে...।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই মিহিরদা ক্যামেরা বের করে ওই শ্যাওলার ছবি তুলতে শুরু করেছেন।

জিনিসটাকে মিহিরদা শ্যাওলা বলছেন বটে, তবে শ্যাওলা না বলে জেলি বললেই মানাত ভালো।

জিনিসটার রং গাঢ় ময়লা সবুজ, তবে চকচকে। গায়ে জল পড়লে মনে হয় পিছলে যাবে। হয়তো সেইজন্যেই গতরাতের বৃষ্টিতে ধুয়ে-মুছে যায়নি।

মিহিরদা কোন সবুজ শ্যাওলার কথা বলছেন বুঝতে পেরেছি। বাপির ডেডবডি নিতে আসার সময়ে মিহিরদা বাপির গায়ে, বরফের টুকরোয়, ঘরের দেওয়ালে এই শ্যাওলা দেখেছিলেন। মধুসূদন বলেছিল, ও জানে অনেক কিছু, কিন্তু কিছু বলতে পারবে না। কারণ, তখন ভয়ের সময়...।

আর এখন? এই ঝকঝকে দিনের আলো, নীল আকাশ, উষ্ণ বাতাস, চারপাশে সজীব গাছের জঙ্গল—এখনও কি ভয়ের সময়?

আমি উবু হয়ে বসে পড়লাম মাটিতে। আঙুলে করে একটু শ্যাওলা তুলে নিলাম। তারপর দু-আঙুলে ঘষে দেখলাম, নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলাম।

সত্যিই জিনিসটা একটু আঠালো—অনেকটা গঁদের আঠার মতো, চটচটে।

আর হালকা গন্ধ যে একটা আছে সেটাও স্পষ্ট বোঝা গেল। চিনি জ্বাল দেওয়ার সময় অনেকটা এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। হাওয়া-মিঠাই তৈরির কথা মনে পড়ে গেল আমার।

হঠাৎই কী যে হল! সটান শুয়ে পড়লাম মাটিতে এবং এক চোখ বুজে অন্য চোখের নজর ধারালো করে মাটির চওড়া ফাটলের ভেতরে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম।

মিহিরদা তখন ব্যাগ থেকে বোতল বের করে সবুজ শ্যাওলার ওপরে ধীরে-ধীরে খানিকটা জল ফেলছিলেন—দেখছিলেন ওটা জলে ধুয়ে যায় কি না।

আমাকে হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি জলের পরীক্ষা থামিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে, কী করছ, কী করছ! জামাকাপড় নোংরা হয়ে যাবে যে!'

মিহিরদার কথা আমার কানে ঢুকলেও কিছু করার ছিল না। আমি তখন প্রাণপণে অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা করছি।

ভেতরে যে একটা গহ্বরের মতো আছে সেটা আন্দাজ করতে পারছিলাম, কিন্তু অন্ধকারে নজর চলছিল না। তবে সবুজ জেলির হালকা মিষ্টি গন্ধটা অন্ধকার গহ্বর থেকে ভেসে আসছিল আমার দিকে।

ফাটলে মুখ রেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কু-উ-উ-উ!'

একবার নয়, পরপর তিনবার আমি ডেকে উঠলাম। ডাকটা আমার নিজের কানে অনেকটা যুদ্ধের ডাকের মতো শোনাল। যেন বাপির অদৃশ্য শত্রুকে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি—ডব্লিউ ডব্লিউ ই-র মতন।

ঝিমলি আমার মাথার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। কোমরে হাত রেখে সামান্য ঝুঁকে আমার কাণ্ড দেখছিল। ও বলে উঠল, 'কী করছিস কী, অন্তরা! মাটির তলায় কে তোর ডাক শুনতে বসে আছে!'

ঠিক তখনই আমি একটা আলোড়ন টের পেলাম।

যে-মাটিতে আমি হাত রেখেছি সেই মাটি যেন থরথর করে কাঁপছে। আর একটা চাপা গুড়গুড় শব্দ—অনেকটা মেঘের ডাকের মতো—বুদবুদের মতো বুড়বুড়ি কেটে ধীরে-ধীরে উঠে আসছে ওপর দিকে।

বুদবুদ যখন জলের তলা থেকে গম্ভীর চালে ওপরে উঠে আসে তখন সেটা মাপে বাড়তে থাকে। আমার মনে হচ্ছিল, ভয়ের সূক্ষ্ম কণা কোন পাতাল থেকে স্লো-মোশান সিনেমার মতো গদাইলশকরি ঢঙে উঠে আসছিল ওপরে। আর একইসঙ্গে সেই কণাটা মাপে বাড়ছিল।

মাটির কাঁপুনি, চাপা গুড়গুড় শব্দ, আর হালকা মিষ্টি গন্ধ আমাকে যেন

অবশ করে দিল।

তারপর...তারপর আমি শিসের শব্দ শুনতে পেলাম। খুব হালকা এবং মোলায়েম সুরে শিস দিচ্ছে কেউ—যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসা মোহনবাঁশি।

আমি ফাটলে মুখ রেখে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম ঃ 'কু-উ-উ-উ!'

তারপর মুখ সরিয়ে কান পাততেই পালটা শিস শুনতে পেলাম। তবে শব্দটা আরও হালকা শোনাল—যেন ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে।

মাথাটা কাত করে মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করছিলাম আমি। খেয়ালই করিনি যে, মিহিরদা অনেকক্ষণ ধরে কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সেটা খেয়াল হতেই বলে উঠলাম, 'মিহিরদা, শিসের শব্দ!'

'কোথায়? কোথায়?' বলে মিহিরদা আর দেরি করলেন না। ঝোলা-ব্যাগ মাটিতে নামিয়ে আমারই মতো উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। কান পাতলেন ফাটলে।

শিসের শব্দটা ততক্ষণে ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। মিহিরদা বোধহয় তার রেশটুকু শুনতে পেলেন।

শিসের শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাপা গুড়গুড় শব্দটাও থেমে গিয়েছিল—মাটির কাঁপুনিও আর টের পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে ওগুলো যে ছিল, তার আভাস দিচ্ছিল মিষ্টি গন্ধটা।

আমরা দুজনে প্রায় একইসঙ্গে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—তাকালাম চোখে-চোখে।

ঝিমলি আমার কাছে এসে জামা ধরে টান মারল ঃ 'কী রে, কোনও ক্লু পেলি?'

আমি কেমন নেশা-ধরা গলায় আনমনাভাবে ওকে বললাম, 'হ্-হ্যাঁ...না...মানে, শিসের শব্দ শুনতে পেলাম...সেইসঙ্গে চাপা মেঘের ডাক, আর...আর...মাটিটা কাঁপছিল। মিষ্টি...মিষ্টি গন্ধও ছিল একটা...।'

ঝিমলি বোধহয় ভালো করে কিছু বুঝতে পারল না। তাই একবার আমাকে একবার মিহিরদাকে দেখতে লাগল।

আমি শালগাছগুলোর রুক্ষ কালো গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওরা সবকিছু জানে। কাল রাতে যা হয়েছে সবই ওদের চোখের সামনে হয়েছে।

মিহিরদা আবার ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন—বড় ফাটলটার ছবি তুলছিলেন। চড়া রোদের আঁচ বাঁচাতে ঝিমলি ওড়নাটা মাথায় তুলে দিয়েছিল। আর চোখ ছোট করে আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল।

জায়গাটায় আরও কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা ফেরার তোড়জোড় করতে শুরু করলাম।

মিহিরদা বললেন, 'চলো, এবারে ব্যাক করা যাক।'

খুব জল তেষ্টা পাচ্ছিল বলে মিহিরদার কাছ থেকে জলের বোতল চেয়ে নিয়ে ঢকঢক করে জল খেলাম। ঝিমলি আর মিহিরদাও গলা ভিজিয়ে নিল।

জায়গাটা ছেড়ে খানিকটা পথ চলে আসার পর মিহিরদা পেটে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, অন্তরা—খিদেয় পেট একেবারে চুঁইচুঁই করছে।'

ঝিমলি বলল, 'আমারও একই অবস্থা। তোর?'

আমি কিছু একটা বলতে যাব, তখনই দেখি একটা লোক শালপাতায় মোড়া কীসব নিয়ে দূর থেকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা ডানদিক থেকে এগিয়ে আসছিল। পরনে শুধু একটা ময়লা ধুতি। প্রখর রোদে গায়ের কালো রং চকচক করছে। শালগাছের কালো-কালো গুঁড়ির মাঝে হেঁটে আসা মানুষটাকে ঠিক যেন চলমান শালগাছ বলে মনে হচ্ছিল।

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমার দেখাদেখি মিহিরদা আর ঝিমলিও। এই অদ্ভুত জায়গায় এই অসময়ে এই মানুষটা নিশ্চয়ই বেড়াতে আসেনি!

লক্ষ করলাম, লোকটা ইতি-উতি তাকাচ্ছে—যেন কোনও নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজছে। মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখছে, দেখছে গাছের গুঁড়ির দিকে।

লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তার হাবভাবে সেটা বিন্দুমাত্রও বোঝা গেল না। সে যেরকম উতলাভাবে এ-গাছ থেকে ও-গাছের কাছে যাচ্ছিল, তাতে মনে হল তার কাজটা খুবই জরুরি।

একটু পরেই আমাদের অবাক করে দিয়ে সে দেবতা কিংবা অপদেবতার থানে পৌঁছে গেল—মানে, এইমাত্র যে-জায়গাটা আমরা ছেড়ে এসেছি।

দূর থেকে দেখতে পেলাম, লোকটা উবু হয়ে বসে পড়ল—তারপর শালপাতার ঢাকনা খুলে কীসব করতে লাগল।

আমি ঝিমলির পোশাক ধরে টান মারলাম ঃ 'চল, দেখে আসি।'

মিহিরদা পকেট থেকে রুমাল বের করে বারবার ঘাম মুছছিলেন—যদিও এখানকার গরমে ঘাম-টাম হয় কম। ওঁকে দেখে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল আমার। তাই বললাম, 'মিহিরদা, আপনি না হয় গাড়ির দিকে এগোন—আমি আর ঝিমলি একটু ব্যাপারটা দেখে আসি।'

মিহিরদা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'নাঃ, চলো। এক যাত্রায় আর পৃথক ফল কেন।'

সুতরাং, আমরা তিনজনে আবার ফিরে চললাম 'অকুস্থলে'।

লোকটার কাছাকাছি পৌঁছতেই তার কান্না আমরা শুনতে পেলাম—ইনিয়ে-

বিনিয়ে কাঁদছে। সামনের শালপাতায় ভাত, ডাল, তরকারি সাজানো রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বসে সে কেঁদে চলেছে। আর মাঝে-মাঝে হাত দিয়ে ভাত-ডাল মেখে সাজিয়ে দিচ্ছে।

লোকটার মাথায় কদমছাঁট সাদা চুল। গায়ে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। গলায় কালো সুতোর মালা। তাতে কয়েকটা কড়ি আর মাদুলি ঝুলছে।

আমরা যখন তার বেশ কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি তখনও সে কান্নায় মগ্ন—আমাদের খেয়ালই করেনি।

হঠাৎই সে নিচু গলায় ছড়া কেটে মন্ত্র গোছের কিছু একটা আওড়াতে শুরু করল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শুনতে লাগলাম।

'সাবন মাসে কৈ ঝাঁকটি ঘিচি ঘিচি করে
ডাউকার বৌড়ি ঘাটে পানি ভরে
পানি ভরে পানি সরে পানি কোল্লাম সার
উঠরে ডঙ্খের মড়া বিশ নাই তোর গায়।
এই মন্ত্রে যদি মড়া নাই লাড় গা
আর মন্ত্রে চিয়াইবে বিশহরি মা।।'

এইটুকু ছড়া সে অনেকবার আওড়াল। তারপর ছড়া কাটতে-কাটতে কান্নায় ভেঙে পড়ল। হাঁটুতে ভর দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে হাত দিয়ে জমি চাপড়াতে লাগল পাগলের মতো। আর একইসঙ্গে বুকফাটা চিৎকারে হাহাকার করে উঠতে লাগল : 'ময়না গো, আমার ময়না! পালাঁই আলি ভালো করলি—এবার ফিরে আয়। তুকে যে সিথিঁভরা সিঁদুর দিতম, দশহাতের শাড়ি দিতম। আয় মা, এইটুকুন ভাত খ্যেয়ে নে রে।'

আছাড়িপিছাড়ি খেতে লাগল লোকটা। তারই মাঝে হঠাৎ আমাদের দিকে চোখ পড়তেই একেবারে পাথর হয়ে গেল।

তার ডানহাতটা ফ্রিজশটের মতো শূন্যে স্থির। করুণ কালো মুখটি উপরপানে তোলা, চোখ আমাদের দিকে তাকিয়ে। চোখের কোল বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

এরকম 'আহা রে!' মুখ আমি বহুদিন দেখিনি।

আমরা তিনজনে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম তার কাছে। কথা বলতে লাগলাম, সান্ত্বনা দিতে লাগলাম।

কান্না থামিয়ে সে তার গল্পটা ধীরে-ধীরে শোনাল।

তার নাম সারথি সরেন, মেয়ের নাম ময়না সরেন। ময়নাকে কাল রাতে দেবতা নিয়েছে। সেসময়ে মা-বাপের আসা মানা ছিল, তাই কেউ আসেনি। আজ তার মন কাঁদছে। সেইজন্যে মেয়ের খাবার নিয়ে এসেছে। যদি দেবতা মেয়েকে ফিরিয়ে দেয়...তখন যদি ময়না দুটি ভাত খায়...তা হলে মেয়েকে খাইয়ে-দাইয়ে সারথি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ময়নার মা মেয়ের বিয়ে দেবে বলে তোড়জোড় করছিল—ওকে ফিরে পেলে সেসব আয়োজন আবার শুরু হবে।

শালগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সারথিকে আমরা অনেক প্রশ্ন করলাম। সে সাধ্যমতো উত্তর দিল। তার কান্না মেশানো এলোমেলো কথাগুলো গুছিয়ে নিলে দাঁড়ায় এইরকম ঃ

এই অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে একটি দেবতা বা অপদেবতার কিংবদন্তি চালু আছে। পাতালনিবাসী এই দেবতা সর্বত্রগামী—কখনও সে শরীরী, কখনও সে অশরীরী। এই অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ এই দেবতার গোপন পূজারি—তারাই কোনও-কোনও রাতে জড়ো হয়ে দেবতার পুজো করে। সেই পুজোয় ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ উৎসর্গ করা হয়। দেবতার ভক্তরা বলে, যে-ঘরের মানুষকে নিয়ে এসে উৎসর্গ করা হয়, তার সংসারে যদি কোনও পাপ না থাকে তা হলে দেবতা তাকে ফিরিয়ে দেয়। আর যদি দেবতা তাকে ফিরিয়ে না দেয়, তা হলে বুঝতে হবে তার পরিবারের লোকেরা পাপী।

ময়না যখন এখনও ফিরে আসছে না, তখন ধরে নিতে হবে সারথির পরিবারের লোকজন পাপ করেছে। সারথি কিছুতেই বুঝতে পারছে না, সে, তার বউ, কিংবা দু-ছেলে, দেবতাকে অসন্তুষ্ট করার মতো ওরা কোন পাপ করেছে। কিন্তু কারও কাছে তার মুখ খোলার উপায় নেই, মন খুলে কথা বলার উপায় নেই। কারণ, তাতে হয়তো পাপের বোঝা আরও বাড়বে—দেবতা রুষ্ট হবে—আবার হয়তো পরিবারের কারও ডাক পড়বে পুজোয় 'বলি' হওয়ার জন্যে।

এরপর সারথিকে আমরা জিগ্যেস করলাম, বিড়বিড় করে সে কীসের মন্ত্র পড়ছিল।

উত্তরে সারথি বলল, 'দেবতার মন্ত্র—পাতালদেবতার মন্ত্র। দেবতা যদি খুশি হয় তো ময়নাকে ফিরায়ে দেবে।'

সারথি সরেন কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে কথা বলছিল। শোকে-ভেঙে-পড়া মেয়ে-হারা বাপ বলে তার হয়তো তেমন হুঁশ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার যেন খেয়াল হল। কাদের কাছে এসব সে কী বলছে!

তারপরই সে মুখে কুলুপ এঁটে বসল। হাজার প্রশ্ন করেও আর কোনও জবাব

পাওয়া গেল না তার কাছ থেকে।

মিহিরদা বারবার জিগ্যেস করলেন, 'তোমার মেয়েকে ঘর থেকে কারা নিয়ে এল? তোমার ময়নাকেই বা ওরা বেছে নিল কেন?'

কিন্তু সারথি সরেন কোনও জবাব দিল না। ধবধবে সাদা দুটো ভয়ার্ত চোখ মেলে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। তারপর হঠাৎই ঝুঁকে পড়ে সে সটান মিহিরদার পা জড়িয়ে ধরল। হাউমাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'আমাকে বাঁচান গো, বাবু! কী বইলতে কী বল্লেছি। দোষ নিয়ো না গো, পাতালদেবতা...!'

আমরা সারথিকে অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তারপর ফেরার পথ ধরলাম।

চাঁদি-ফাটা গরমে রুক্ষ জমিতে পা ফেলে এগোতে-এগোতে বুকের ভেতরটা তেষ্টায় কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মিহিরদার কাছ থেকে জল চেয়ে নিয়ে খাওয়ার পরেও কিন্তু সেই গলা-শুকিয়ে-যাওয়া ভাবটা গেল না।

তখন বুঝলাম, তেষ্টা ছাড়া অন্য কোনও কারণেও গলা শুকিয়ে কাঠ হতে পারে।

॥ চোদ্দো ॥

দুপুরে আর আমাদের ঘুম-টুম হয়নি। বেলায় ফিরে স্নান-টান সেরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকোতে গিয়েই দুটো বেজে গেছে। তারপর মিহিরদার ঘরে বসে তিনজনে গল্প জুড়ে দিয়েছি।

এমনি বেড়াতে এলে কত না বিষয় নিয়ে আমরা আড্ডা মারতে পারতাম! কিন্তু এমনই কপাল যে, আমাদের কথাবার্তা সবসময় একই বিষয় নিয়ে।

বাপির ডায়েরি থেকে যে-ব্যাপারটার শুরু হয়েছিল, এখন সেটা কত না জটিল পথ ধরে আঁকাবাঁকাভাবে এগিয়ে চলেছে!

আজ সকালের ঘটনাগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম।

মিহিরদা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। তাতে ঘন-ঘন টান দিচ্ছিলেন আর কাশছিলেন।

তাই দেখে ঝিমলি বলে উঠল, 'এত কষ্ট করে স্মোক করার কী দরকার আপনার! বারবার শুধু কাশছেন!'

মিহিরদা হেসে বললেন, 'তুমি এর মর্ম কী বুঝবে, ঝিমলি! একে বলে আসক্তি।'

ঝিমলির ভুরু কুঁচকে গেল ঃ 'আসক্তি মানে? স্ট্রেংথ টাইপের কিছু?'

আমি আর মিহিরদা হেসে ফেললাম। বুঝলাম, আসক্তিকে ঝিমলি শক্তি টাইপের কিছু ভেবেছে।

আমি ওকে হেল্‌প করার জন্যে বললাম, 'দূর, স্ট্রেংথ তো শক্তি—এটা আসক্তি—অ্যাডিক্‌শান।'

'ও—' বলল ঝিমলি। তারপর মিহিরদার দিকে তাকিয়ে ঃ 'তো আপনার আসক্তি ছাড়ার শক্তি নেই?'

ওর কথায় আমরা তো অবাক! ইংরেজি অভ্যাস করা মেয়েটা এরকম মজার বাংলা বলল কেমন করে?

মিহিরদা ঠোঁটে সিগারেট চেপে ছোট করে হাততালি দিয়ে বললেন, 'সাধু! সাধু! তুমি তো দেখছি অলঙ্কারও শিখে গেছ!'

সর্বনাশ করেছে! একে 'সাধু', তার ওপরে আবার 'অলঙ্কার'!

যা ভাবা তাই! ঝিমলি আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু উঁচিয়ে ঠিক ওই দুটো শব্দের মানে জিগ্যেস করল।

আমিও আর না পেরে উঠে বিরক্ত হয়ে বলে দিলাম, 'সেইন্ট আর অরনামেন্ট ধরে নে।'

ব্যস! শুনে মিহিরদার কী হাসি! আমিও সে-হাসিতে যোগ দিলাম। তবে ঝিমলি বেচারা কাঁচুমাচু মুখ করে একবার আমার দিকে একবার মিহিরদার দিকে দেখতে লাগল।

সত্যি, ঝিমলি না এলে আমরা এটুকু হাসিও হাসতে পারতাম না।

মিহিরদা সিগারেট শেষ করে গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'যাক্‌গে, শোনো—কাজের কথায় আসি। সাড়ে তিনটে নাগাদ তো আবার প্রিয়বরণ আসবে—তার আগে একটু আলোচনা করে নেওয়া ভালো।'

আমি আর ঝিমলি সিরিয়াসভাবে মিহিরদার দিকে মনোযোগ দিলাম।

'সারথি সরেনের কাছে আমরা যা শুনেছি তাতে কতকগুলো প্রশ্ন জাগছে। গোপনে যারা অপদেবতার পুজো করছে তারা হঠাৎ ময়নাকে বেছে নিল কেমন করে? গতকাল আগস্ট মাসের শেষ শনিবার ছিল—ওদের পুজো কি প্রতি শনিবারে হয়, নাকি মাসের শেষ শনিবারে? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, এরকমভাবে এলাকার মানুষজন মাঝে-মাঝে উধাও হয়ে যাচ্ছে—যেমন, ময়না কাল রাত থেকে উধাও হল—অথচ পুলিশ কি প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই!'

আমি বললাম, 'হয়তো অনেকেই জানে, কিন্তু ঠোঁটে তালা এঁটে আছে। সারথি সরেন শোকে পাগল বাপ—তাই হয়তো দুর্বল মুহূর্তে আমাদের কাছে মুখ খুলে

ফেলেছে। আমার মনে হয়, মিহিরদা, এলাকার কাউকে জিগ্যেস করে আপনি সেরকম কোনও ইরফরমেশান পাবেন না।'

মিহিরদা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

'তোমার কথাই ঠিক। যারা এ-পুজো করে, তারা তো ব্যাপারটা গোপন রাখেই—আবার যারা পুজো করে না, কিন্তু পুজোর কথা জানে—তারাও ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খুলতে চায় না—বরং চায় যে, ব্যাপারটা গোপনই থাকুক। যেমন ধরো, আমাদের এই হোটেলের সুখেন্দু পাল...কিংবা সারথি সরেন...।'

ঝিমলি হাত-মুখ নেড়ে বলে উঠল, 'এ কী স্ট্রেঞ্জ অ্যাটিটিউড, মিহিরদা! কাল ওরকমভাবে একটা মেয়ে মারা গেল, অথচ তাও সবাই চুপ করে থাকবে! সারথি সরেন বা তার ওয়াইফ পুলিশকে কিছু বলবে না!'

'হয়তো বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না।'

'কেন পারছে না?'

'কেন আবার—ভয়ে।' গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন মিহিরদা।

আমার মনে পড়ে গেল, বাপি মুখ খুলতে চেয়েছিল। মনে পড়ে গেল, বাপির ডায়েরিটা ফেরত পাওয়ার জন্যে কতরকম হুমকিই না আমাকে আর মিহিরদাকে সহ্য করতে হয়েছে!

'কীসের ভয়?' ঝিমলি নাছোড়বান্দার মতো জিগ্যেস করল।

'সেটাই তো আমরা স্পষ্ট করে এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।' মিহিরদা নিচু গলায় বললেন।

এরপর মিহিরদা একটা প্যাড বের করে কীসব নোট করতে লাগলেন। আমি আর ঝিমলি আমাদের ঘরে ফিরে গেলাম।

মনে বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কারণ, এখন আমাদের সামনে দুটো সমস্যা ঃ জাতিস্মর মলিন সামন্ত, আর কাল রাতে উধাও হয়ে যাওয়া ময়না সরেন। এই দুটো সমস্যার মধ্যে কোনও যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে।

বাপিও হয়তো ময়নার মতো কাউকে রাতের অন্ধকারে সবুজ আলোর আভার মধ্যে উধাও হতে দেখেছিল। তারপর মলিন সামন্তের সঙ্গে সেই 'বলি'র ঘটনাটার যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল। হয়তো খুঁজেও পেয়েছিল খানিকটা।

জানলার পাশে বসে বাইরের বিকেলের দিকে তাকিয়ে মায়ের কথা খুব মনে পড়ছিল। বর্ধমানে মাসির বাড়িতে মা কী করছে এখন? গতকাল পুরুলিয়া পৌঁছে মাকে ফোন করেছিলাম। আজ বিকেলে যখন বেরোব, তখন কোনও একটা ফোন বুথ থেকে মাকে ফোন করব। তবে গতকালের ঘটনা কিছুই মা-কে বলা যাবে না। মা-কে তো আমি জানি!

পুরুলিয়ায় এসে মাত্র একটা দিন কাটিয়েছি আমরা। অথচ মনে হচ্ছে যেন কতগুলো দিন কেটে গেছে। বাইরে কোথাও গেলে বোধহয় এরকমটাই হয়।

ঝিমলি হঠাৎই আমাকে ঠেলা মেরে জিগ্যেস করল, 'কী রে, কী ভাবছিস?'

আমি চমকে উঠলাম। জানলার বাইরে গাছের পাতায় ঠিকরে পড়া রোদ্দুরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঝিমলির দিকে তাকাতেই ওর মুখটা কয়েক লহমার জন্যে কেমন ঝাপসা ঠেকল। ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, 'মায়ের কথা ভাবছি...।'

ও বলল, 'আজকে যখন আন্টিকে ফোন করবি তখন আমিও একটু কথা বলব।'

'বলিস—তোর কথা শুনলে মা একটু ভরসা পাবে।'

'কেন?'

'মা বলে, তোর কনফিডেন্স আমার চেয়ে অনেক বেশি।' ঝিমলিকে বিভ্রান্ত করতে চাইনি বলেই 'আত্মবিশ্বাস' শব্দটা বললাম না।

'অ্যাই, শোন—এই প্রিয়বরণ পাবলিকটাকে তোর কীরকম মনে হয় বল তো?'

'হি সিম্‌স টু বি ও. কে.।'

'মনে হয়, আমাদের দুজনকে দেখে একটু ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছে।'

'সেটা কি খুব দোষের? কলকাতা ছেড়ে এত দূরে রয়েছে...এত বছর ধরে। তা আমাদের দেখে একটু গায়ে-পড়া হতেই পারে।'

'আমাদের একটু অ্যালার্ট থাকা দরকার, অন্তরা।'

'হ্যাঁ—তবে আমার ইন্টারেস্ট হল, ওর কাছ থেকে মলিনের আরও খবর পাওয়া। তা ছাড়া, যদি এলাকার আর কোনও খবর ওর কাছে থাকে...।'

'কাল রাতের ব্যাপারটা ওকে বলবি নাকি?'

'খেপেছিস! ও-ব্যাপারে কোনও কথাই নয়। ওর কাছ থেকে খবর জানাই হবে আমাদের কাজ।'

এমন সময় মোটরবাইকের শব্দ পেলাম। মোটরবাইক চালিয়ে কেউ যেন আমাদের হোটেলের কাছে এসে থামল।

তার কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ঘরের দরজায় টোকা মারার শব্দ হল।

ঝিমলি উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল, কালো চেহারার একজন রোগা মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। পরনের খাটো ধুতির নীচে কাঠের ডান পা-টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মধুসূদন।

এখানে আসার পর এই প্রথম ওকে দেখলাম।

মধুসূদন খসখসে গলায় বলল, 'আপনাদের সাথে একজন দেখা করতে এসেচেন।'

মধুসূদনকে অনুসরণ করে আমি, ঝিমলি আর মিহিরদা, ধীরে-ধীরে নেমে এলাম নীচে।

দেখলাম, কাউন্টারের সামনে প্রিয়বরণ দাঁড়িয়ে।

আমাদের দেখেই একগাল হাসল প্রিয়, বলল, 'সময়ের আগেই বোধহয় চলে এসেছি, ম্যাডাম, তবে আমার কোনও দোষ নেই। আমার বাইকটা—' আঙুল তুলে 'পথিক'-এর সদর দরজার দিকে দেখাল প্রিয় ঃ 'ওটা সবসময় রাস্তায় বিগড়ে যায়। তাতে আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগে যায়। আজ যে ওটার কী হল— বিনা অসুখ-বিসুখে টাটকা জোয়ানের মতো গোঁ-গোঁ করতে-করতে ছুটে চলে এল এখানে।'

কথা শেষ করে ঠোঁট ওলটাল প্রিয়বরণ। সরলভাবে হাসল।

ঝিমলি আমাকে পেছন থেকে খোঁচা মেরে চাপা গলায় বলল, 'ড্রেসটা দেখেছিস!'

অবশ্যই দেখেছি। কারণ, প্রিয়বরণ আজ চোখে পড়ার মতো সেজে এসেছে।

গোলাপি আর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া একটা শার্ট। তার সঙ্গে গাঢ় ছাই রঙের প্যান্ট। জামা গুঁজে দিয়ে কোমরে সুদৃশ্য বেল্ট পরেছে।

এ ছাড়া মাথার ঘন কোঁকড়া চুলে তেল-টেল মেখে সুন্দর করে আঁচড়েছে। আর বেশ কড়া একটা ডিওডোরান্ট বা ওই জাতীয় সুগন্ধী কিছু গায়ে আর জামায় কষে মেখে এসেছে।

ঝিমলি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'সাবধান থাকিস, অন্তরা। আজ একেবারে টিভির অ্যাডের অ্যাক্স এফেক্ট।'

আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না।

এমনিতেই প্রিয়বরণের নাকের বাঁ-পাশের কালো জড়ুলটা কেমন একটা কমিক্যাল এফেক্ট তৈরি করে, তার ওপর ঝিমলির ওই 'অ্যাক্স এফেক্ট'।

ঝিমলিও হাসছিল। ফলে আমাদের দুজনের হাসিতে প্রিয় কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

মিহিরদা অভিজ্ঞ লোক। বোধহয় হাসাহাসির কারণটা আঁচ করেছিলেন। তাই বললেন, 'কী হচ্ছে, অন্তরা! চলো, আমাদের বেরোতে দেরি হয়ে যাবে।'

ঠিক তখনই কাউন্টারের পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুখেন্দু পাল। গায়ে একটা গামছা জড়ানো। ডানহাতে মুঠো করে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট।

'কী ম্যাডাম, এত হাসি কীসের?' সিগারেটে টান দিয়ে সুখেন্দু পাল

জিগ্যেস করল।

আমি বেশ বিরক্ত হলাম। লোকটার মধ্যে কেমন যেন একটা গায়ে পড়া গার্জেনগিরি আছে। তাই ছোট্ট করে জবাব দিলাম, 'এমনি হাসছিলাম।'

তারপর মিহিরদার দিকে ফিরে তাগাদা করলাম ঃ 'চলুন, মিহিরদা—।'

সুখেন্দু পাল সিগারেটে জম্পেশ টান দিয়েছিল। তারই রেজাল্ট হিসেবে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। সে-ধোঁয়া যেন আর ফুরোতেই চায় না! ধোঁয়ায় ওর মুখটা আবছা হয়ে গেল।

হাত নেড়ে ধোঁয়া তাড়িয়ে সুখেন্দু পাল খুকখুক করে হেসে বলল, 'এমনি-এমনি কেউ কি আর হাসে! তুমিই বলো, প্রিয়বাবু!' প্রিয়বরণের দিকে তাকাল সুখেন্দু ঃ 'বিনা কারণে কি আর কেউ হাসে!'

আমি বিদ্রুপের খোঁচা দিয়ে বললাম, 'কেন হাসবে না! এখানে অনেক পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়।'

বাপির ডেডবডি নিতে মিহিরদা যখন 'পথিক'-এ এসেছিলেন, তখন সুখেন্দু পাল এই কথাই মিহিরদাকে শুনিয়েছিল ঃ 'এখানে অনেক পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়...।'

আমার কথায় সুখেন্দু পাল থতমত খেয়ে চুপ করে গেল বটে, কিন্তু আমার মাথায় অন্য ব্যাপার ঘুরছিল।

সুখেন্দু পাল কি প্রিয়বরণকে চেনে? কই, প্রিয় তো সেটা আগে বলেনি!

তবে ওর কথায় বুঝেছিলাম 'পথিক' হোটেলটা ওর অচেনা নয়। তা ছাড়া, হোটেলের নামটা শোনামাত্রই ও কেমন দমে গিয়েছিল।

মিহিরদার তাড়ায় আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

হিসেবমতো এখন বিকেল হলেও রুক্ষ মাটিতে রোদ আর ছায়া দুটোই গাঢ় কটকটে। প্রিয়বরণের বাইকের চকচকে গা থেকে সূর্য ঠিকরে পড়ছে। হাওয়ায় গাছের পাতা এপাশ-ওপাশ দুলছে। পাতার খসখস ঠিক যেন ম্যারাকাসের শব্দের মতো শোনাচ্ছে।

আমরা ঠিক করলাম, প্রিয়বরণের বাইক এখানেই থাকবে। আমরা টাটা সুমো নিয়ে বেরোব। তারপর, হোটেলে যখন ফিরব, প্রিয় বাইক নিয়ে ওর বাড়ি চলে যাবে।

সুমোটা একটা প্রকাণ্ড শালগাছের নীচে দাঁড় করানো ছিল। গণপতি সামনের সিটে শরীর ছেড়ে দিয়ে মুখটা সামান্য হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু মিহিরদা একবার ডাকতেই ও তড়াক করে উঠে বসে একেবারে স্টিয়ারিং বাগিয়ে ধরল। হাতের ডানা দিয়ে ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া লালা মুছে নিল।

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। বসার ব্যবস্থাটা দাঁড়াল গতকালের মতোই। গণপতির পাশে মিহিরদা। আর পেছনে আমি, ঝিমলি, আর প্রিয়বরণ। ওর কড়া ডিওডোরান্টের গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। লক্ষ করলাম, ঝিমলি কৌতুকের চোখে প্রিয়কে জরিপ করছে।

॥ পনেরো ॥

গণপতি গাড়ি স্টার্ট দিতে-না-দিতেই মিহিরদা সিগারেট বের করলেন। পেছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রিয়বরণকে একটা সিগারেট দিলেন, আর নিজেও একটা নিলেন। প্রিয়র সঙ্গে দেশলাই বা লাইটার না থাকায় ও সলজ্জভাবে সিট ছেড়ে উঠে মিহিরদার দিকে ঝুঁকে পড়ল। মিহিরদা লাইটার জ্বেলে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন—তারপর নিজেরটা ধরালেন।

প্রিয়বরণ সিটে বসে সিগারেটে ভালো করে টান দেওয়ার আগে কাঁচুমাচু মুখে আমার দিকে তাকাল, বলল, 'আপনারা যদি কিছু মাইন্ড না করেন তা হলে একটু স্মোক করছি।'

আমি হেসে বললাম, 'নো প্রবলেম। আপনি স্মোক করলে বরং ভালোই হবে। মানে...।'

আমি যেটা ওকে বলতে পারছিলাম না সেটা হল, ওর সিগারেটের গন্ধ ওই সর্বনেশে ডিওডোরান্টের ঝাঁজালো গন্ধের হাত থেকে আমাদের বাঁচাবে।

ঠারেঠোরে কথাটা বলে ফেলল ঝিমলি।

'আপনি স্মোক করলে অ্যাক্স এফেক্টের হাত থেকে আমরা বাঁচব।'

'অ্যাক্স এফেক্ট!' মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গেল প্রিয়।

আর আমি হেসে ফেললাম আবার।

মিহিরদা অ্যাক্স এফেক্টের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলেন না। পেছন ফিরে ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে।

আমি হাসি চেপে প্রিয়কে জিগ্যেস করলাম, ' "পথিক"-এর সুখেন্দুবাবুর সঙ্গে আপনার কীরকম আলাপ?'

'একটু-আধটু।' সিগারেটে টান দিয়ে প্রিয়বরণ বলল, 'ছোট জায়গা—আলাপ তো হবেই। তবে সেরকম কিছু নয়।'

আমাদের গাড়ি কাঁচা রাস্তা ছেড়ে অ্যাসফাল্টের রাস্তায় উঠে পড়ল। রোদ-

জ্বলা রাস্তার দিকে চোখ রেখেই গণপতি বলল, 'আমরা কোনদিকে যাব, স্যার?'

প্রশ্নটা মিহিরদাকে করেছিল গণপতি। মিহিরদা কোনও জবাব না দিয়ে ঘুরে তাকালেন প্রিয়বরণের দিকে।

প্রিয় বলল, 'কাঁসাই নদীর দিকে চলুন—।'

মিহিরদা বললেন, 'ঝালদা স্টেশন ঘুরে গেলে অনেকটা সময় লাগবে কিন্তু।'

'না, আমরা বাঘমুন্ডি পাহাড় ঘুরে হারবা হয়ে যাব...বড়জোর সতেরো-আঠেরো মাইল। রাস্তা ভালো। আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট লাগবে। কী বলেন?'

প্রিয়বরণের শেষ প্রশ্নটা গণপতিকে লক্ষ করে।

গণপতি একটু দেরিতে সেটা বুঝতে পেরে মাথা হেলিয়ে ছোট্ট করে শুধু 'হুঁ' বলল।

মিহিরদা বললেন 'কাঁসাই...কংসাবতী...কপিশা...। এখানকার সবচেয়ে ইমপরট্যান্ট নদী। এটা থেকে অনেকগুলো ছোট-ছোট ব্রাঞ্চ নদী বেরিয়েছে।'

আমি বললাম, 'কাঁসাইয়ের ভালো নাম না হয় কংসাবতী। কিন্তু কপিশাটা কী?'

মিহিরদা একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'ওটা আরও ভালো নাম—যদিও নামটা ঠিক এই নদীরই কি না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে কালিদাস তাঁর "রঘুবংশ" নাটকে কপিশা নদীর কথা লিখেছেন...।'

'বাব্বাঃ, আপনি পারেনও বটে!' আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'এত খবর রাখাটা বড্ড বাড়াবাড়ি!'

মিহিরদা হেসে বললেন, 'বড় সাংবাদিক হতে গেলে তোমাকে এই বাড়াবাড়িটা করতেই হবে, অন্তরা।'

তারপর হঠাৎই প্রিয়বরণের দিকে ঘুরে তাকিয়ে মিহিরদা আচমকা একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'মিস্টার সরকার, আপনি তো অনেক খবর রাখেন—বলতে পারেন, এই অঞ্চলে রিসেন্টলি কেউ কি মিস্টিরিয়াসলি মারা গেছে?'

আমার ময়না সরেনের কথা মনে পড়ে গেল। ওর বাবার কথামতন পাতাল-দেবতা ওকে টেনে নিয়েছে—আর ফিরিয়ে দেয়নি।

প্রিয়বরণের সিগারেট খাওয়া থেমে গেল। কপালে ভাঁজ ফেলে ও মিহিরদার দিকে তাকাল। তবে চোখাচোখি হল না। কারণ, মিহিরদা সামনের রাস্তায় চোখ মেলে দিয়ে নির্বিকারভাবে সিগারেট খেয়ে চলেছেন।

প্রিয় পালটা প্রশ্ন করল মিহিরদাকে, 'কেন, আপনি সেরকম কোনও খোঁজ পেয়েছেন নাকি?'

মিহিরদা শব্দ করে হাসলেন, বললেন, 'এত শিগগির! সবে তো আমরা কাল

এখানে এসেছি! একটু সবুর করুন...আগে ভালো করে একটু খোঁজখবর নিই...।'

'কার কাছে?'

'এই ধরুন আপনার কাছে।' কথাটা বলার সময় মিহিরদা ঘুরে তাকালেন প্রিয়র দিকে।

মুহূর্তের জন্যে মনে হল, প্রিয়বরণ যেন একটু কুঁকড়ে গেল। চোখ নামাল গাড়ির মেঝের দিকে। তারপর মুখ তুলে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আমি তো যা জানি সবই আপনাদের বলেছি...মানে, মলিনের ব্যাপারে...।'

'আর অন্য কোনও ব্যাপারে?' এবারে প্রশ্ন করেছি আমি।

'বলুন, কী জানতে চান?' আমার দিকে ঘুরে সরাসরি আমার চোখে তাকাল প্রিয়।

আমি ওকে সময় নিয়ে দেখলাম।

ওর চোখে সেই বেপরোয়া তেজি ভাবটা নেই। তার বদলে বেশ শান্ত স্থির একটা প্রলেপ নজরে পড়ছে। আর একইসঙ্গে আমার মনের ভেতরে কী-কী প্রশ্ন উঁকি মারছে সেটাও বোধহয় বুঝে নিতে চাইছে।

আমি ওর দিকে চোখ রেখেই বললাম, 'সারথি সরেন নামে কাউকে চেনেন?'

'কোথায় থাকে?' পালটা প্রশ্ন করল প্রিয়বরণ!

'সে জানি না—।'

'আসলে, ম্যাডাম, সারথি সরেন নামটা এ-অঞ্চলে ভীষণ কমন। যেমন, আমাদের চাঁদমণি গ্রামেই দুজন সারথি সরেন আছে।' কথা শেষ করে হাসল প্রিয়। ছোট হয়ে যাওয়া সিগারেটটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'তাদের কি চোদ্দো-পনেরো বছরের কোনও মেয়ে আছে?'

'একজনের আছে।'

'মেয়েটার নাম কি ময়না?'

ঝিমলি আমার উরুর পাশে গোপন চিমটি কাটল। বোধহয় বলতে চাইছে, প্রিয়বরণের কাছে বেশি বলাটা ঠিক হবে না।

আমি ঘাড় কাত করে এমনভাবে ঝিমলির দিকে তাকালাম, যার মানে 'আমার খেয়াল আছে—কোনও চিন্তা নেই।'

ততক্ষণে প্রিয়বরণ আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, এবং একটা প্রশ্নও করেছে।

'না, ওর নাম আলো। কিন্তু ময়না সরেন মেয়েটা কে?'

'এখন থাক। সময় এলে বলব।'

এরপর আমি মুখে কুলুপ এঁটে বসলাম।

াতে চাইল। কিন্তু আমরা দুজনেই তখন গাড়ির ভ
ক তাকিয়ে আছি।

া গড়ালেও রোদের তেজ তেমন কমেনি। জানলা দি
লাগছিল। বাইরে কখনও-কখনও ধু-ধু মাঠ চোখে
আকাশমণির সারি। গাছ যে আমি খুব একটা চিনি
মিহিরদা চিনিয়ে দিয়েছেন।

রে প্রান্তর কোথাও ঢিবির মতো উঁচু হয়ে আবার
াবার গড়ানে জমির মতো একটানা ঢালু হয়ে চলে
ার দুপাশে পাথর-কাঁকর ছাওয়া জমি, কোথাও-বা (
াছে মসৃণ কালো পাথর, অথচ তারই মাঝে কখনও-ক
মাঝারি পুকুর। দেখেই বোঝা যায়, বেশি গভীর নয়
রোদ পড়ে ঝলমল করছে।

-রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে
র আর তার লাগোয়া কিছু গাছপালা। বোধহয় ‍
রা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকায় নিস্তব্ধতার পরত ক্রমশ
চালিয়ে প্রিয়বরণ হঠাৎই আমাকে লক্ষ করে প্রশ্ন
কেমন লাগছে?’

া সামনের দিকে চোখ রেখে বললাম, ‘ভালোই...
ন...কাঁসাই দেখলে আপনাদের খারাপ লাগবে না। এ
ঝতে পারবেন না। গরমে নদীটাকে কেমন যেন
..ভরা যৌবন।’

র মুখে ‘ভরা যৌবন’ কথাটা শুনে ঝিমলি আমাকে (
য়ে হাসলও সামান্য।

রদা বললেন, ‘শীর্ণ কথাটায় মনে পড়ল। প্রিয়বাবু, ব
ন তো!’

মাথা নাড়ল ঃ ‘না।’

াদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসলেন মি
আর সাঁই মানে শীর্ণ নদীর স্রোত। দুইয়ে মিলে
ভেসে যায়...।’

লি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস
কী রে?’

আমি চাপা গলায় বললাম, 'ন্যারো, থিন...ছিনে।'

'ছিনে' শব্দটা শুনেই কলকাতার পুরোনো কথাটা ঝিমলির মনে পড়ে গেল। ও খোলা মনে হেসে উঠল।

আমার বেশ গরম লাগছিল। দুপুরে ঘুম হয়নি বলে একটু ঝিমুনি মতনও আসছিল। কপালে হাত বুলিয়ে ঘাম মুছে নিলাম। মিহিরদাকে বললাম, জল তেষ্টা পাচ্ছে। মিহিরদা ঝোলা-ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে দিলেন।

প্লাস্টিক-বোতলটা হাতে ধরেই আমি বলে উঠলাম, 'জলটা বড্ড গরম হয়ে গেছে। কাছাকাছি টিউবওয়েল নেই?'

প্রিয় আর গণপতি প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'আছে।'

তার আট-দশ সেকেন্ড পরেই রাস্তার পাশ ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল গণপতি। বলল, 'দিদি, ওই যে টিউকল। এগুলো বেশ ডিপ। দেখবেন জল দারুণ ঠান্ডা হবে।'

বোতলটা হাতে নিয়ে আমি নেমে পড়লাম। দেখলাম, ওপাশের দরজা খুলে প্রিয়বরণও নেমে পড়েছে।

তখনই নজরে পড়ল, সামনেই একটা টিউবওয়েল, আর তার পাশেই কীসের যেন জটলা আর চেঁচামেচি।

প্রিয়বরণ বোতলটা আমার হাত থেকে নিয়ে এগিয়ে গেল টিউবওয়েলের কাছে।

টিউবওয়েলটা একটু অন্যরকম দেখতে—কলকাতার আশেপাশে যেমনটি দেখা যায় ঠিক সেরকম নয়। টিউবওয়েলের মাথাটা চ্যাপটা লোহার বাক্সমতন—তা থেকে বেশ লম্বা একটা সরু হাতল লম্বা কাঠির মতো বেরিয়ে আছে। টিউবওয়েলের বাঁকা হাতল দেখলেই আমার মনে হয়, কোনও মেয়ের ঢেউখেলানো চুল। এগুলোয় সেরকম কোনও কল্পনার সুযোগ নেই।

প্রিয়বরণ বোতলে জল ভরছিল। আর আমি সামনের জটলার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বেশ কয়েকজন পুরুষ-মহিলা যে সেখানে হই-চই করছে তার ধরনটা আমার কানে ঝগড়ার মতোই শোনাচ্ছে। তাদের ভাষা বাংলা আর অচেনা কথার বিনুনি। তার মধ্যে বাংলা যেটুকু-বা বুঝতে পারছি সেটুকুও আঞ্চলিক টানের দেওয়াল ডিঙিয়ে বুঝতে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা শোনার পরই ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করতে পারলাম। আর সেটা করামাত্রই বুকের মধ্যে দুরুদুরু শুরু হয়ে গেল।

একটা ছেলেকে মাসখানেকের ওপর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছেলেটার নাম চুনারাম মাহাত। বয়েস আঠেরো কি উনিশ। মাসখানেক আগে

এক শনিবারে হাটে বেরিয়েছিল—আর বাড়ি ফেরেনি। তারপর বহু খোঁজখবর করেও তার আর হদিস পাওয়া যায়নি।

ছেলেটার বাপ ছিল না। ফলে সে ছিল তার বিধবা মায়ের একমাত্র ভরসা। তাই ছেলেকে না পেয়ে মা এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেরিয়েছে। চাষের খেত, নদীর পাড়, ঝোপ-জঙ্গল—কোথাও বাদ দেয়নি। কিন্তু তাতেও চুনারামের কোনও সন্ধান মেলেনি।

শেষ পর্যন্ত চুনারামের মা সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেছে। যাকে সামনে পায় তাকেই হম্বিতম্বি করে হারানো ছেলের খোঁজ জানতে চায়, আর কপাল চাপড়ে কাঁদে।

আমি জটলার কাছে এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখেই সবাই চুপচাপ হয়ে গেল। এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি এইমাত্র কোনও ফ্লাইং সসার থেকে নেমে এসেছি। কিন্তু তাতে আমি এতটুকুও দমে গেলাম না। বরং ওদের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, চোখ বুলিয়ে নিলাম সবার মুখের ওপর।

জটলার মধ্যে একজন মাঝবয়েসি মহিলা সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। গায়ে কাপড়ের ঠিক নেই। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চোখের কোল বসা। সামনের পাটির দুটো দাঁত নেই। কানে বড়-বড় দুটো রুপোর রিং।

মুখটা বিকৃত করে মহিলা কাঁদছিল আর কপাল চাপড়াচ্ছিল।

বুঝলাম, এই অভাগা মহিলাই হল চুনারামের মা।

ময়না সরেনের কথা আমার মনে পড়ল। মনে পড়ল বাপির কথাও। বাপির তবু মৃতদেহটা আমরা পেয়েছিলাম। ময়না কিংবা চুনারামের তাও পাওয়া যায়নি। যদি ওদের মৃত্যু হয়ে থাকে তা হলে এই তিনটে মৃত্যুই কি একসূত্রে বাঁধা?

আর কিছু ভেবে ওঠার আগেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। চুনারামের মা সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমার পায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর পায়ে মাথা ঘষতে-ঘষতে কান্না-ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'মোর ছেল্যাকে ফিরাউ দে! ফিরাউ দে! তোর দুটি পায়ে গড় করি, মা—।'

আমি 'কী করছেন! কী করছেন!' বলে পা ছাড়িয়ে পিছিয়ে এলাম। ঝুঁকে পড়ে ওকে তুলতে চেষ্টা করলাম।

তখনই বাকিদের ঘোর কাটল। তারা তাড়াতাড়ি চুনারামের মাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

মহিলা তখনও হাউহাউ করে কাঁদছিল। সারথি সরেনের কান্নার সঙ্গে এই কান্নার কী অসম্ভব মিল! সন্তানের শোক কখনও দুরকম হয় না।

এমন সময় ওদেরই মধ্যে মাতব্বর মতন একজন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, 'দিদি, কিছু মাইন্ড করবেন না। ও পাগল হয়ে গেছে।'

লোকটার চেহারা রোগা। মাথার চুলগুলো খাড়া-খাড়া—অনেকটা জুতোর বুরুশের মতো। ঝোপের মতো ভুরু। আর সরু লম্বা গোঁফ।

লোকটা পান চিবোচ্ছিল। তার সামনের দাঁতগুলো রীতিমতন এবড়োখেবড়ো। তাতে চুন-খয়েরের লাল রস আর এখানে-ওখানে সবুজ পানের কুচি লেগে আছে। এ ছাড়া লক্ষ করলাম, কথা বলার সময় তার বাঁ-দিকের চোখটা সামান্য ছোট হয়ে যায়।

আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, 'চুনারাম কোথায় উধাও হয়ে গেল?'

ঠোঁট ওলটাল লোকটা! দু-চারবার চোয়াল নেড়ে বলল, 'কী জানি। বহু চেষ্টা করেও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'পুলিশে খবর দেননি?'

'দিয়ে কোনও লাভ নেই...।'

আমি কিছু একটা জিগ্যেস করতে যাব, জল-ভরা বোতল নিয়ে প্রিয়বরণ টপ করে আমার পাশটিতে এসে উদয় হল। চাপা গলায় বলল, 'ম্যাডাম, গাড়িতে ফিরে চলুন। এ নিয়ে আর কথা নয়।'

আমি মুখিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে প্রিয়র দিকে তাকালাম।

দেখি ওর চোখে-মুখে জল। নিশ্চয়ই টিউবওয়েলের জল নিয়ে মুখে ঝাপটা দিয়েছে। জলের ফোঁটা ওর নাকের ডগায়, গোঁফে, চিবুকে, আর বাঁ-গালের জড়ুলেও। তার ওপরে রোদের রেখা পড়ে চিকচিক করছে। সব মিলিয়ে ওকে কেমন যেন ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে।

প্রিয় দু-চোখ মেলে অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর দৃষ্টিতে চাপা অনুনয় ছিল। যেন বলতে চাইছিল, 'প্লিজ, আমার কথা শুনুন।'

আমি একটু নরম হলাম। প্রিয় জলের বোতলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিন, জল খান। দেখুন, কী ঠান্ডা!'

আমি ওর হাত থেকে জলের বোতলটা নিলাম। সত্যিই খুব ঠান্ডা জল।

প্রিয়বরণ নিচু গলায় বলল, 'চুনারামের ব্যাপারে আর কিছু জিগ্যেস করবেন না। লোকে সন্দেহ করবে। আমি পরে আপনাকে অনেক কথা বলব...শুধু আপনাকে...।'

আমি অবাক হয়ে প্রিয়র দিকে তাকালাম।

পরে ও আমাকে অনেক কথা বলবে! শুধু আমাকে!

কিন্তু কী কথা? আর শুধু আমাকেই-বা কেন?

প্রিয় তখন গালে, কপালে, মুখে হাত বুলিয়ে জল মুছে নিচ্ছে। আবার আমার চোখে যাতে চোখ না পড়ে সে-চেষ্টাও করছে।

আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এক-একটা ছেলে-মেয়ে এই অঞ্চল থেকে একে-একে উধাও হয়ে যাবে অথচ সবাই চুপ করে থাকবে! সবকিছু এইভাবে চেপে যাওয়ার কোনও মানে হয়! কেউ কি চুনারাম বা ময়নার খোঁজ করবে না? পুলিশও কোনওরকম মাথা ঘামাবে না? প্রিয়বরণও কি সেটাকে ধামা-চাপা দিতে চাইছে?

বোতল থেকে জল ঢাললাম হাতে। আঁজলা করে মুখে ছিটিয়ে দিলাম।

আ—আঃ! ঠান্ডা জলের ছোঁয়ায় আমার রাগ অনেকটা জুড়িয়ে গেল। ঘাড়ে গলায় ভিজে হাত বুলিয়ে নিলাম আমি। তারপর মুখ উঁচু করে বোতল থেকে জল ঢাললাম গলায়। একটা ঠান্ডা স্রোত গলার নলি বেয়ে পৌঁছে গেল পাকস্থলিতে।

প্রিয় বলল, 'চলুন, গাড়িতে চলুন—।'

আমি বোতলের ছিপিটা এঁটে দিচ্ছিলাম। তখনই বাঁ-হাতের কনুইয়ে প্রিয়র হাতের ছোঁয়া টের পেলাম। ও আমাকে সঙ্গে করে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে।

মাথার ওপরে ঘোলাটে আকাশ, বিকেলের পড়ন্ত সূর্য, পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা, রাস্তার দুপাশের দোকানপাট যেমন স্বাভাবিক, প্রিয়র আচরণ আমার কাছে ঠিক একইরকম স্বাভাবিক মনে হল।

সামনে তাকিয়ে দেখি, মিহিরদা আর ঝিমলি গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

প্রিয় আমাকে বলল, 'আপনাকে পরে যে-কথাগুলো বলব সেগুলো ওঁদের দুজনকে কিন্তু বলবেন না। এটাই আপনার কাছে রিকোয়েস্ট।'

আমি ঘাড় নেড়ে 'হুঁ' বললাম। আমার বাঁ-হাতটা প্রিয়বরণের ছোঁয়া থেকে সরিয়ে নিলাম। কিন্তু মনের ভেতরে একটা কৌতূহল থেকেই গেল ঃ আমাকে কী গোপন কথা শোনাবে ও?

মিহিরদা আর ঝিমলির মুখোমুখি হতেই ঝিমলি হাত নেড়ে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার, অন্তরা! এনি প্রবলেম?'

আমি ছোট্ট করে মাথা নাড়লাম ঃ 'না, কিছু না।'

তারপর সংক্ষেপে চুনারামের ব্যাপারটা বললাম।

শুনেই ঝিমলি অবাক হয়ে বলল, 'ময়না মেয়েটার মতো এই ছেলেটাও ভ্যানিশ হয়ে গেছে! তাও আবার শনিবার! ডেফিনিটলি দুটোর মধ্যে কোনও কানেকশান আছে।'

হঠাৎই আমার খেয়াল হল, প্রিয়বরণের কাছে ময়নার ব্যাপারটা আমাদের আড়াল করার কথা ছিল। কিন্তু ঝিমলি সেটা আর মনে রাখতে পারেনি।

মিহিরদা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইলেন। বললেন, 'চলো, চলো, অনেক

দেরি হয়ে গেছে। এরপর ফিরতে-ফিরতে সন্ধে নেমে যাবে। তখন...।'

প্রিয়বরণ কেমন একটা ঠান্ডা গলায় বলে উঠল, 'আমি তো সঙ্গে আছি! ভয়ের কী আছে!' তারপর আমার দিকে স্পষ্ট করে তাকাল। সে-চাউনির মধ্যে গোপন কথা বলতে চাওয়ার একটা আকুতি ছিল।

আমরা সবাই আবার গাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম।

যেতে-যেতে প্রিয় মিহিরদার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই প্রশ্ন ছুড়ে দিল ঃ 'একটু আগে ঝিমলি-ম্যাডাম যে ময়না নামের মেয়েটার কথা বলছিলেন সে কি ওই ময়না সরেন—সারথি সরেনের মেয়ে?'

মিহিরদা একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ...মানে...ঠিকই ধরেছেন।'

'ময়না যে উধাও হয়ে গেছে সেটা আপনারা জানলেন কেমন করে?'

প্রিয়বরণকে ডিঙিয়ে মিহিরদা আমার দিকে তাকালেন। আমিও দেখছিলাম মিহিরদার দিকে। এই প্রশ্নটার ঠিক কী উত্তর দেওয়া যায় আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না। দিশেহারাভাবে মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম।

'কী, বলুন—।' প্রিয় মিহিরদাকে তাগাদা করল।

ঠিক তখনই ঝিমলি ফস করে বলে বসল, 'আমরা নিজের চোখে দেখেছি।'

উত্তরটা শোনামাত্রই প্রিয়বরণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ও অচেনা চোখে অদ্ভুত তির-বেঁধা দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

সেই দৃষ্টিতে কিছু একটা ছিল নিশ্চয়ই। হয় অ্যাক্স এফেক্ট, নইলে ভানুমতীর মায়াজাল। আমি অজগরের সামনে থমকে পাথর হয়ে যাওয়া খরগোশের মতো হয়ে গেলাম। আমার চারপাশটা কেমন দুলে উঠল। গাছপালা, আকাশ, রাস্তা, দোকানপাট—সব যেন টলমলে জলের ভেতর দিয়ে দেখা ছবির মতো হয়ে গেল। কফি হাউসে দেখা স্বর্ণভূষণ তরফদারের কথা মনে পড়ে গেল আমার। ঝিমলির ডানহাতের কবজির দিকে তাকালাম। ওই তো, সেই কালশিটের দাগ! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!

প্রিয়বরণের দিক থেকে ঝিমলির দিকে চোখ সরিয়েছিলাম বলেই হয়তো ঘোরটা ফিকে হয়ে এল। আমি মন শক্ত করে প্রিয়বরণের দিকে আবার তাকালাম।

আশ্চর্য! ও আবার সেই চেনা প্রিয়বরণ হয়ে গেছে! প্রিয়বরণের ভেতর থেকে পলকের জন্যে যে অন্য এক প্রিয়বরণ বেরিয়ে এসেছিল সে আবার আড়ালে চলে গেছে।

একগাল হেসে প্রিয় ঝিমলির দিকে তাকাল ঃ 'সত্যি? আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন?'

ঝিমলি কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। হাতে-ধরা রিভলভার থেকে আচমকা গুলি বেরিয়ে গিয়ে কোনও প্রিয়জন খুন হয়ে গেলে যেমনটা হয়।

কয়েক লহমা কীসব ভেবে ও ঠিক করল, 'স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই'। তাই প্রিয়বরণের দিকে সরাসরি তাকিয়ে চিবুক সামান্য উঁচু করে ও বলল, 'হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখেছি। আমরা আই উইটনেস।'

'কবে দেখেছেন?'

'কাল রাতে?'

'পুলিশে খবর দেননি কেন?'

এই প্রশ্নটার উত্তর দিলাম আমি। একটু বাঁকা সুরে বললাম, 'শুনলেন না, একটু আগে ওই ভদ্রলোক কী বললেন?' আঙুল তুলে দূরের জটলার দিকে দেখালাম আমি : 'খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই। মানে—।'

আমাকে বাধা দিয়ে মিহিরদা বলে উঠলেন, 'সবাই "লাভ নেই" বলছে বটে, কিন্তু তবুও আমরা একবার চেষ্টা করে দেখব।'

'ময়নাকে কোথায় উধাও হতে দেখেছেন?' চোয়াল শক্ত করে প্রিয় জানতে চাইল। ওর চোখ-মুখ আবার অন্যরকম লাগছে।

মিহিরদা জবাব দিলেন, 'আমরা এখানে নতুন—জায়গার কি অতশত নাম-ধাম জানি! হোটেলে ফেরার সময় জায়গাটা বরং আপনাকে দেখাব। আপনি হয়তো নাম বলতে পারবেন।'

প্রিয়বরণ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, মিহিরদা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরলেন : 'নিন, ওসব ছাড়ুন। একটা সিগারেট ধরান দেখি। এখন চটপট রওনা না হলে ফেরার সময় দেরি হয়ে যাবে।'

প্রিয়বরণ কেমন যেন গুম মেরে গেল। ওর কপালে কয়েকটা সরু ভাঁজ পড়ল। ও মিহিরদার প্যাকেট থেকে সিগারেট তুলে নিল। মিহিরদা লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন। তারপর নিজেও একটা ধরালেন।

আমি ঝিমলিকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। চাপা গলায় ওকে বললাম, 'প্রিয় আমাকে অনেক কথা বলবে বলেছে। তোকে আর মিহিরদাকে সেসব কথা বলতে বারণ করেছে।'

শুনে তো ঝিমলি চোখ একেবারে কপালে তুলল। চোখের কোণে লেগ পুল করার হাসি ফুটিয়ে বলল, 'মাই গড! এর মধ্যেই প্রাইভেট কথা বলতে চায়!'

আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম, 'আস্তে—শুনতে পাবে। আমার মনে হয় কী জানিস? ও বোধহয় চুনারাম আর ময়নার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলতে চায়। এ ছাড়া আর কী কেস হতে পারে বলতে পারিস?'

'পারি। কেস জন্ডিস।' বলে ঝিমলি তেরছা হেসে চোখ টিপল।

আমি বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লাম ঃ 'ধুস! তুই একটা হোপলেস!'

ঝিমলি খিলখিল করে হেসে উঠল। আমাকে আলতো করে একটা ঠেলা মারল। আমরা পলকে যেন কলেজ-জীবনে ফিরে গেলাম।

গাড়িতে উঠে পড়লাম আমরা। মিহিরদা সামনের সিটে গণপতির পাশে বসতে-বসতে বললেন, 'অন্তরা, আজ যদি তোমার জলতেষ্টা না পেত তা হলে চুনারামের ব্যাপারটা জানাই হত না। ওই ভদ্রমহিলাকে তোমার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে আমি আর ঝিমলি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।...আমি নামতে যাচ্ছিলাম...ঝিমলি বারণ করল...বলল, প্রিয়বরণ যখন আছেন, কোনও চিন্তা নেই...।'

আমি আড়চোখে প্রিয়র দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওর মুখে তৃপ্তির হাসি। তারপর চোখ ফিরিয়েই খেয়াল করলাম, ঝিমলি আমার দিকে গোয়েন্দার চোখে তাকিয়ে আছে।

আমার হাসি পেয়ে গেল। ধন্য ঝিমলি! মেয়েটা ভীষণ পেছনে লাগতে পারে দেখছি!

ঝিমলি গাড়ির পাশের দরজা খুলে মিহিরদার পেছনের সিটটায় উঠে বসল। ও ভেবেছিল, আগের মতোই আমি ওর পাশে বসব। কিন্তু মজা করার একটা ঝোঁক পেয়ে বসল আমায়। আমি আচমকা চলে গেলাম গাড়ির পেছনের দরজার কাছে—একটানে দরজা খুলে উঠে বসলাম পেছনের সিটে।

প্রিয় বেচারা দোটানায় পড়েছিল। এখন যা অবস্থা তাতে হয় আমার সঙ্গে নয় ঝিমলির সঙ্গে ওকে বসতে হবে। অথবা সামনের সিটে মিহিরদার সঙ্গে গাদাগাদি করে।

এমনিতে ব্যাপারটা কিছু নয়, কিন্তু প্রিয়বরণের কাছে বোধহয় 'কিছু'। তাই কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে সিগারেটে লম্বা টান দিল প্রিয়। তারপর 'ধুত্তেরি' ঢঙে সিগারেটটা ছুড়ে মারল মাটিতে—এবং পেছনের দরজা খুলে আমার মুখোমুখি সিটে বসে পড়ল।

আমি ঝিমলির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে চোখে হাসলাম।

বাইরে এতসব হলেও আমার মনের ভেতরে একটা কথাই ঘুরছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, প্রিয়বরণ অনেক কিছু জানে। সেই খবরগুলো ওর কাছ থেকে বের করতে গেলে ওর খানিকটা কাছাকাছি হওয়া দরকার। বাপির মৃত্যুরহস্য ভেদ করতে হলে এটা নিতান্ত জরুরি। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে।

গাড়ি স্টার্ট দিল।

খানিকটা পথ পেরোতে-না-পেরোতেই প্রিয় কথা শুরু করল।

'ম্যাডাম, আপনারা এখানে মলিন সামন্তকে নিয়ে স্টোরি করতে এসেছেন।

জন্মান্তরের ব্যাপারে আপনাদের ইন্টারেস্ট। স্টোরির মেটিরিয়াল জোগাড় হয়ে গেলেই আপনারা কলকাতায় ফিরে যাবেন। আমাকে কিন্তু এখানেই পড়ে থাকতে হবে। চাকরি করি যে!'

আমি প্রিয়র মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সেখানে একটা বিষাদের ছায়া দেখতে পেলাম। ওর চোখ দুটো গাড়ির পেছনের দরজার কাচের জানলা দিয়ে দূরে তাকিয়ে ছিল।

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। ওর কথা শোনার জন্যে যেন অপেক্ষা করছি।

একটু পরে আমার দিকে চোখ ফেরাল ও। বলল, 'আসলে বছর-দু-আড়াই ধরে এই ব্যাপারটা হচ্ছে।'

'কী ব্যাপার?'

'এই যে...লোকজন উধাও হয়ে যাওয়া...।'

ওর মুখে এ-কথা শুনে মিহিরদা হাতের সিগারেট জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে কাত হয়ে বসলেন। পেছন ফিরে তাকালেন প্রিয়বরণের দিকে।

ঝিমলিও দেখলাম একরাশ আগ্রহ নিয়ে প্রিয়র দিকে তাকিয়ে।

প্রিয়বরণ ধীরে-ধীরে বলল, 'এ এক আশ্চর্য ব্যাপার!' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

গাড়ি বলতে গেলে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছিল। কোথা থেকে যেন মেঘ এসে সূর্যটা ঢাকা পড়ে যাওয়ায় পিচের রাস্তাটাকে অনেক বেশি কালো মনে হচ্ছিল। পথের ধারে একটা টিলার ওপরে দুটো স্টোনচিপ্‌স-এর কারখানা চোখে পড়ল। সেখানে ধুলো উড়িয়ে মেশিনে পাথর ভাঙা হচ্ছে। পুরুষ আর মহিলা শ্রমিকরা ঝুড়ি ভরতি করে বড়-বড় পাথরের চাঁই মেশিনের কাছে নিয়ে আসছে। তারপর মেশিনের ভেতরে ঢেলে দিচ্ছে।

গাড়ির জানলা দিয়ে হু-হু করে বাতাস ঢুকছিল। বাতাসটা আগের চেয়ে ঠান্ডা। হয়তো দূরে কোথাও কয়েক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে।

আমরা প্রিয়র মুখ খোলার জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করছিলাম। ও জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল কয়েকবার। তারপর খানিকটা আনমনা ঢঙে বলতে লাগল ঃ 'একটা স্পষ্ট কথা আপনাদের বলি। এই যে লোকজন ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা...এটা এ-অঞ্চলের অনেকেই জানে। তা সত্ত্বেও সবাই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। প্রথম দিকটায় পুলিশ কিছু খোঁজখবর করেছিল। তাতে কোনও রেজাল্ট না পাওয়ায় পরের দিকে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তা ছাড়া, এখানকার লোকজন অপদেবতাকে ভীষণ মান্যি করে। তাদের ধারণা, উধাও হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে পাতালের কোনও অপদেবতা টেনে নিয়েছে।'

মিহিরদা হঠাৎই ডানহাতটা প্রিয়বরণের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, বললেন, 'দেখুন তো, এই জিনিসটা আগে কখনও দেখেছেন কি না—।'

টাটা সুমোর সামনের সিটে বসায় মিহিরদার হাত ঝিমলির নাগাল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ঝিমলি রিলে রেসের ব্যাটন বদলের মতো জিনিসটা মিহিরদার হাত থেকে নিয়ে প্রিয়বরণের হাতে পৌঁছে দিল।

জিনিসটা দেখতে পেলাম এবার। মাছের আঁশের মতো চাকা-চাকা দাগওয়ালা সেই লকেটটা।

প্রিয়বরণ ওটা হাতে নিয়ে চোখের খুব কাছে তুলে ধরল। স্যাকরাদের গয়না পরীক্ষার মতো করে ওটা জরিপ করে দেখতে লাগল। মাঝে-মাঝে লকেটটার ওপরে আলতো করে আঙুল বোলাল। মাথা নাড়ল বারকয়েক। তারপর অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'এরকম লকেট আগে দেখেছেন'?

চোখ তুলে তাকাল প্রিয়বরণ। কপালে ভাঁজ ফেলে ছোট্ট করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ম্যাডাম—দেখেছি।'

॥ ষোলো ॥

কংসাবতী নদী দেখে আসা একটা অভিজ্ঞতা। তবে প্রিয়বরণ আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে, এটা পুরুলিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত নদীর বর্ষার ঢলঢলে রূপ। জাবড় পাহাড়ে জন্ম নিয়ে নদীটা বয়ে এসেছে দক্ষিণ বরাবর। প্রায় দেড়শো মাইলেরও বেশি লম্বা নদীটা ঝালদার জাবড় পাহাড় থেকে বেরিয়ে ঝালদা, জয়পুর, আরষা, পুঞ্চা, মানবাজার ইত্যাদি থানা এলাকার মধ্যে দিয়ে গিয়ে বাঁকুড়ায় ঢুকেছে।

নদীটা গায়েগতরে বেশ চওড়া—গড়ে নাকি প্রায় আড়াইহাজার ফুট। তা হবে হয়তো। নদীটার দিকে তাকিয়েই আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছিল।

প্রিয় বলল, এই নদী থেকেই নাকি তৈরি হয়েছে আরও কয়েকটা ছোট নদী। বেশ অদ্ভুত তাদের নাম ঃ কুমারী, পটলই, সন্ধু।

নদী দেখার পর এলোমেলো বেড়ানো হচ্ছিল। ছোটখাটো দোকানপাট দেখলেই ঝিমলি হাতের চুড়ি, কানের দুল—এসব খুচরো কেনাকাটার বায়না ধরছিল। আমি মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা নিয়ে থম মেরে গাড়িতে বসেছিলাম। আর চাকা-চাকা দাগওয়ালা লকেটটার কথা ভাবছিলাম।

আমি প্রিয়কে প্রশ্ন করেছিলাম, এরকম লকেট ও আগে দেখেছে কি না। তাতে ও বলেছে, 'হ্যাঁ, ম্যাডাম—দেখেছি।'

এরপর আরও বলেছে, 'এরকম একটা লকেট মলিন কুড়িয়ে পেয়েছিল—মাসচারেক আগে।'

আমার মনে পড়ে গেল, বাপি মারা গিয়েছিল মে মাসের পাঁচ তারিখে, আর আজ পয়লা সেপ্টেম্বর। সময়টা মোটামুটি চারমাস বলা যায়। যদিও মলিনের লকেট কুড়িয়ে পাওয়ার সঙ্গে বাপির মৃত্যুর তেমন যোগ হয়তো নেই, তবুও চারমাসের মিলটা আমার মাথায় খেলে গেল।

আমি প্রিয়কে জিগ্যেস করলাম, 'কোথা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল?'

প্রিয় মিহিরদা আর ঝিমলির দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জবাব দিল, 'ওই বাঘমুন্ডির একটা জায়গায়—নাম বললে আপনারা চিনতে পারবেন না।'

ওর কথাটা হয়তো সত্যি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হল প্রিয়বরণ জবাবটা এড়িয়ে গেল। কে জানে, এই জবাবটা পরে-আমাকে-বলতে-চাওয়া গোপন কথার তালিকায় আছে কি না।

প্রিয় লকেটটা ঝিমলির হাতে ফেরত দিল, ঝিমলি ওটা এগিয়ে দিল মিহিরদার দিকে।

পরে লকেট নিয়ে আর কোনও কথা আমরা বলিনি।

কাঁসাই দেখে ফেরার পথে নানান জায়গায় আমরা গাড়ি থামাচ্ছিলাম। একটা পেট্রল পাম্প দেখতে পেয়ে গণপতি 'তেল নিতে হবে' বলে সেখানে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। আমরা সেই ফাঁকে গাড়ি থেকে নেমে হাত-পায়ের আড় ভেঙে নিলাম। মিহিরদা এদিক-ওদিক তাকিয়ে ক্যামেরা তাক করে ফটো তুলতে লাগলেন।

পেট্রল পাম্পের আশেপাশে কয়েকটা দোকান ছিল। দেখি ঝিমলি ওর স্বভাবমতো সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমি আর প্রিয়বরণ কিছুক্ষণের জন্যে 'একা' হয়ে গেলাম।

আমি কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বললাম, 'আমাকে কী কথা বলবেন বলছিলেন...?'

প্রিয় মাথা ঝাঁকালো দু-তিনবার, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না, কী বলবে—অথবা আদৌ বলবে কি না।

একটু পরে ও বলল, 'কাল তো বিকেলে আপনারা রসময়দার বাড়ি যাবেন—।'

'হ্যাঁ—সেরকমই তো কথা আছে।'

প্রিয়বরণ মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল, তারপর নখ খুঁটতে-খুঁটতে বলল, 'রসময়দার বাড়ি কাল না গিয়ে পরশু যাবেন?'

আমার অবাক লাগল, জিগ্যেস করলাম, 'কেন?'

'আমি—মানে, কাল—আমি—আপনাকে ক'টা কথা বলতে চাই। যদি...কাল বিকেলে আপনি আমার সঙ্গে একটু বেরোন...মানে, ভরসা করে যদি বেরোতে পারেন তা হলে...অনেকগুলো কথা বলার ছিল, বিশ্বাস করুন।'

প্রিয়বরণের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হল।

বিকেল পার হয়ে সন্ধে নামছে। কনে-দেখা-আলো সবে ডানা মেলছে। পশ্চিমের মোলায়েম আলো এসে পড়েছে প্রিয়বরণের ফরসা রোগা মুখে। ওর মুখে লালচে আভা। চোখ নোয়ানো। পায়ের চটির কিনারা দিয়ে পেট্রল পাম্পের রুক্ষ কাঁকর-মাটিতে আঁচড় কাটছে।

প্রিয় চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। ওর মুখটা কী অসম্ভব করুণ লাগছে। ওকে যে ভরসা করা যায় না এ-কথা ভাবাটাই আশ্চর্যের। এই রোগা-সোগা দুর্বল ছেলেটাকে ভয় পাওয়ার কোনও মানেই হয় না।

আমি অনেকক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলেও আসলে সেটা দশ কি পনেরো সেকেন্ড মাত্র। শেষ পর্যন্ত কৌতূহল আর মায়া আমাকে জিতে নিল। ওকে বললাম, 'ঠিক আছে। কাল বিকেলে—এই চারটে নাগাদ—আপনার সঙ্গে যাব। আর মলিনের বাড়ি পরশুদিন যাব—খবরটা আপনি রসময়বাবুকে দিয়ে দেবেন, কেমন?'

আমার কথায় প্রিয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল পলকে। যে-হাসিটা ওর মুখে দেখলাম, তাকে প্রাণের হাসি বলাটাই সবচেয়ে মানানসই—যদিও ঠিক জানি না প্রাণের হাসি বলতে কী বোঝায়।

প্রিয় ইতস্তত করে বলল, 'কাল তা হলে আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব...যেখান থেকে মলিন ওই লকেটটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। তবে...তবে ম্যাডাম, মিহিরবাবু কিংবা ঝিমলি ম্যাডামকে ডিটেল্‌সে কিছু বলার দরকার নেই।'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। মানে, কিছু বলব না। তবে একটু যে দুশ্চিন্তা হল না তা নয়। এই গোপনীয়তার বিনিময়ে কিছু জানা যাবে তো! বাপির রহস্যময় মৃত্যুর দু-একটা সূত্র পাওয়া যাবে তো! কিংবা ময়না সরেন কি চুনারাম মাহাতের আচমকা উধাও হওয়ার...!

এমন সময় দেখি মিহিরদা আর ঝিমলি—দুজনে দু-দিক থেকে—ফিরে আসছে গাড়ির দিকে।

ঝিমলি কাছে এসে বলল, 'অন্তরা, কী ফ্যান্টাস্টিক! জানিস একটা দোকান দেখলাম—টেলারিং কাম জুতোর দোকান। কী ফ্যান্টাস্টিক কম্বিনেশান বল তো।

জামা-প্যান্ট সেলাই হচ্ছে—হ্যাঙারে-হ্যাঙারে ঝুলছে। আবার সামনের কাচের শো-কেসে সারি-সারি জুতো। দোকানের নাম কী জানিস?'

'কী?'

' "জনতা টেলারিং অ্যান্ড শু স্টোর"। বল, কী ফ্যান্টাস্টিক কম্বিনেশান—!'

ঝিমলির কথায় সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। আর একইসঙ্গে একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে গেল। বাপির মৃত্যুরহস্যের মধ্যেও এরকম কোনও 'ফ্যান্টাস্টিক কম্বিনেশান' লুকিয়ে নেই তো!

আমার কেমন যেন অস্থির-অস্থির লাগছিল।

সাংবাদিক সুরঞ্জন মজুমদারের অপঘাত মৃত্যুর খোঁজখবর করতে আমরা পুরুলিয়ায় এসেছি। আসার পর থেকে অনেক ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, তবে আমরা তদন্তের সঠিক কোনও পথ এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। সেই পথটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে পাওয়াটা খুব জরুরি।

কার কাছে রয়েছে সেই পথের চাবিকাঠি, সেটা এখনও জানি না।

আমার মনে পড়ল মধুসূদনের কথা।

আজ ওকে হোটেলে দেখেছি। বাপির ডেডবডি নিতে এসে ওর সঙ্গে কথা বলে মিহিরদার মনে হয়েছিল, মধুসূদন অনেক কিছু জানে। অথচ ওর সঙ্গে এখনও কথা বলা হয়নি—তবে সেটা অবশ্য সুখেন্দু পালের কড়া পাহারাদারির জন্যে।

ঠিক করলাম, আর দেরি নয়—আজ রাতেই আমি মধুসূদনের সঙ্গে কথা বলব। বলব, আমার বাপি সুরঞ্জন মজুমদার গত মে মাসের পাঁচ তারিখে কত কষ্ট পেয়ে 'পথিক' হোটেলের পাঁচনম্বর ঘরে মারা গেছে। তারপর....।

গাড়ি করে হোটেলে ফেরার পথে বহু কথা মনের ভেতরে তোলপাড় করতে লাগল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠছি। আর এটাও মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু একা খোঁচাখুঁচি করে দেখলে হয়তো মন্দ হবে না। কারণ, আমি, মিহিরদা আর ঝিমলি—তিনজনে থাকলে লোকে যেভাবে মুখ খুলবে, আমি একা থাকলে হয়তো তারা আরও সহজে নিজেদের মেলে ধরবে। চুনারামের পাগল মা আজ বিকেলে যেমনটা করেছে।

প্রিয়বরণ মনের ফুর্তিতে নানান কথা বকবক করছিল। 'মাইনিং অ্যান্ড মিনারেল্‌স' কোম্পানির কাজকর্মের কথা বলছিল, কী করে ও এই কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিল সে-কথা বলছিল, মাটি খুঁড়তে গিয়ে একবার ওদের কোম্পানি ইয়া লম্বা এক সাপের খোলস পেয়েছিল—তা প্রায় সত্তর-আশি ফুট লম্বা হবে—সে-কথা শোনাচ্ছিল।

ঝিমলি ওর কথার স্রোতে বাধা দিয়ে বলল, 'খোলস মানে?'

প্রিয় ইতস্তত করছে দেখে আমি জবাব দিলাম, 'মোল্টিং-এর সময় সাপ যে-স্কিনটা ফেলে দেয়—মানে, স্লাফ আর কী...।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঝিমলি হেসে ফোড়ন কাটল, 'তা ওই খোলসের লেংথটাকে একটু কমানো যায় না, প্রিয়বাবু? সত্তর-আশি ফুটটা বড্ড এক্সট্রিম হয়ে যাচ্ছে না...?'

প্রিয় ব্যঙ্গের ইঙ্গিতটা ধরতে পারল কি না বোঝা গেল না। কারণ ও বেশ সিরিয়াস গলায় বলল, 'এক্সট্রিম নয় মোটেই—বরং লেংথটা আরও বেশি হতে পারে। যা আপনি চোখে দেখেননি তা অবিশ্বাস করার অভ্যেসটা ভালো নয়। এখানে এসে কাল রাতে আপনারা যা দেখেছেন সেটা আপনাদের কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের বললে তারা কি বিশ্বাস করতে চাইবে? অথচ দেখুন, ব্যাপারটা যে সত্যি সেটা আমাদের চেয়ে ভালো আর কে জানে!'

কথাটা শুনে ঝিমলি দমে গেল। আমিও।

প্রিয় কিন্তু আবার স্বাভাবিক সুরে ওর কথাবার্তা শুরু করল। ও কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে, আমরা রীতিমতো বোর হচ্ছি।

হঠাৎই আমার মনে হল, কাল বিকেল চারটের দিকে তাকিয়ে ও বোধহয় উৎসাহে টগবগ করছে। ও দেখছি এখনও সতেরো বছর বয়েসেই দাঁড়িয়ে আছে!

আমি চুপ করে ওর কথা শুনছিলাম—কিংবা শোনার ভান করছিলাম। আর মনে-মনে বেশ মজাও পাচ্ছিলাম।

হোটেলে ফিরে প্রিয়বরণ 'যাই-যাই' করেও বেশ দেরি করে ফেলল। চা খাওয়ার নাম করে বেশ কিছুটা সময় কাটাল। তারপর বাইকে স্টার্ট দিয়ে চলে যাওয়ার সময় বলল, 'কাল বিকেল চারটেয়—।'

এবং আমাদের লক্ষ করে হাতও নেড়ে গেল। যদিও বুঝলাম, হাত নাড়াটা শুধু আমার জন্যেই।

ঘরে এসে মিহিরদা 'কাল বিকেল চারটেয়—' নিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন তুললেন। তখন আমি মিহিরদাকে অনেক করে বোঝালাম।

অনেক বাকবিতণ্ডার পর মিহিরদা আমার মরিয়া অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। আর ঝিমলি আমাকে বেশ জোর দিয়ে সাপোর্ট করল। ফলে শেষ পর্যন্ত মিহিরদা রাজি হলেন। তখন মিহিরদাকে মধুসূদনের কথাটা বললাম।

মিহিরদা বললেন, 'অন্তরা, তোমার কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু মধুসূদন বোধহয় সুখেন্দু পালের ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। মুখ খুললেই ওর চাকরিটা যাবে।'

'কিন্তু যে করে হোক ওর সঙ্গে কথা তো বলতেই হবে, মিহিরদা।'

'সেটা অবশ্য ঠিক।' একটু কেশে উঠলেন মিহিরদা। তারপর ঃ 'দ্যাখো কথা বলে...। তবে আমার মনে হচ্ছে, বাঘমুন্ডি থানায় একবার আমাদের যাওয়া দরকার। নইলে কী থেকে কীসে জড়িয়ে পড়ব। দেখি, অফিসে ফোন করে একটু কথা বলি...।'

একটু পরেই আমরা ফোনের ব্যাপারটা সারতে বেরোলাম।

টাটা সুমো নিয়ে কিলোমিটারখানেক যেতেই এসটিডি বুথের দেখা পেলাম। তারপর শুরু হল ফোনের পালা।

মিহিরদা অফিসে ফোন করে কার সঙ্গে যেন অনেকক্ষণ কথা বললেন। তারপর বাড়িতে।

মিহিরদার হয়ে গেলে ঝিমলি। আর সবশেষে আমি।

টেলিফোনে আমার গলা শুনতে পেয়ে মা কেঁদে ফেলল। বারবার শুধু 'অন্তু...অন্তু...অন্তু...' বলতে লাগল।

আমি মাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে চাইলাম। বললাম, 'কোনও চিন্তা কোরো না—আমি এখানে দিব্যি আছি।'

মায়ের মনে যে কত কথা জমে ছিল! এই ক'দিন অদেখায় যে এত কথা জমতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

মা-কে বারবার করে আশ্বাস দিলাম। বললাম যে, আমরা খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছি। দু-একটা সূত্র যে মেলেনি তা নয়। বরং আমরা আরও কিছু সূত্রের সন্ধানে আছি।

কথা বলতে-বলতে মা কেমন পালটে গেল।

একটু আগেই যে-মা ছিল একতাল নরম মাটি, একটু পরেই সে ধীরে-ধীরে জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেল। সুরঞ্জন মজুমদারের মৃত্যুরহস্য ভেদ করার জন্যে মা যেন মা-দুর্গা হয়ে আমাকে নির্দেশ দিল।

'...তোকে পারতেই হবে, অন্তু।' বলে কথা শেষ করল মা।

আর আমার শরীরের ভেতরে রক্তকণিকার দল নীরব চিৎকারে 'বন্দে মাতরম' বলে যুদ্ধের জিগির তুলল।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মধুসূদন পাঁচনম্বর ঘরে এসে আমার আর ঝিমলির খাবার দিয়ে গেল। মিহিরদা পাশের ঘরে খাওয়া-দাওয়া সারছেন। আমাদের বলেছেন, শরীরটা টায়ার্ড লাগছে বলে তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বেন। আর আমাকে অন্তত সাতপ্রস্থ সাবধান করেছেন ঃ মধুসূদনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আমি যেন খুব সতর্ক এবং সাবধান থাকি। আসলে মধুসূদনের কাছ থেকে কোনও ভয় নেই—

খত ভয় সুখেন্দু পালকে।

মধুসূদনকে একা পেয়ে আমি ওর সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ওর সঙ্গে আলাপের শুরুটা তেমন ভালো হল না।

ও কেমন যেন সংকুচিতভাবে ঘরের নোনা-ধরা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন মামলার আসামি।

আমি যে-কথাই বলি না কেন, মধুসূদন তার কাঠ-কাঠ জবাব দিয়ে আলাপের চেষ্টাটাকে থামিয়ে দিতে লাগল।

তখন ঝিমলি হঠাৎ করে অপদেবতার কথা তুলল। বলল কাল রাতে ময়না সরেনের উধাও হয়ে যাওয়ার কথা। বলল, আজ সকালবেলায় সারথি সরেনের বুকফাটা কান্নার কথা।

মধুসূদন অবাক চোখে আমাদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর বলল, 'আপনারা এতসব দেখেছেন?'

আমি তখন বললাম, 'হ্যাঁ—দেখেছি। তা ছাড়া, আপনি তো জানেন, চারমাস আগে এই ঘরে আমার বাবা সুরঞ্জন মজুমদার মারা গিয়েছিলেন। পাশের ঘরে, চারনম্বর ঘরে, যিনি উঠেছেন, সেই মিহিরবাবু এসেছিলেন আমার বাবার ডেডবডি নিতে। তখন আপনি তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন।'

মধুসূদন বিড়বিড় করে বলল, 'সেই লোকটা...এই ঘরে যার মরণ হল...সে আপনার বাবা বটে?'

আমি খাওয়া ছেড়ে মধুর কাছে গেলাম। ওর কাঁধে হাত রেখে ওর চশমার পুরু কাচের দিকে তাকালাম, বললাম, 'হ্যাঁ, মধুদা। সারথি সরেন তার হারানো মেয়ের জন্যে কাঁদছে। আর আমি কাঁদছি আমার হারানো বাবার জন্যে—আমার বাপির জন্যে। এরকম আরও কত লোক কাঁদছে—এই গ্রাম আর আশপাশের গ্রামে।'

ঝিমলি তখন চুনারাম মাহাতের গল্পটা মধুসূদনকে শোনাল।

মধুসূদন চুপ করে রইল। বোধহয় কিছু একটা ভাবছিল।

আমি মানুষটার দিকে দেখছিলাম। আবেগের বশে ওকে আমি 'দাদা' বলে ডেকেছি। এই মানুষটা অনেক কিছু জানে। পুরুলিয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে মিহিরদাকে ও কথা দিয়েছিল, মলিন সামন্তের ব্যাপারে কখনও খোঁজখবর করতে এলে ও যথাসাধ্য সাহায্য করবে। কিন্তু বাপির মৃত্যুর ব্যাপারে?

পুরোনো কথাটা ওকে মনে করিয়ে দিয়ে আমি একটা অর্ধসত্য আচমকা ছুড়ে দিলাম মধুর দিকে ঃ 'মধুদা, তুমি কি জানো, জাতিস্মর মলিন সামন্তের সঙ্গে এই সব উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারগুলোর একটা যোগ রয়েছে! হয়তো আমার বাবার মৃত্যুরও একটা...।'

বেশ বুঝতে পারছিলাম, 'যোগ' বলতে শুধু অদ্ভুত চেহারার একটা লকেট। কিন্তু সেটাই বা কম কী। এখন তো আমাদের খড়কুটো আঁকড়ে ধরারই সময়!

আমি আর ঝিমলি মিলে মধুসূদনকে আরও অনেক অনুরোধ-উপরোধ করতে লাগলাম। এমনকী ওর খোয়া যাওয়া ডান পা নিয়েও প্রশ্ন তুললাম। বললাম, 'মধুদা, আমাদের জীবন তো ভগবানের দান। এই জীবন নষ্ট করার অধিকার কোনও অপদেবতার নেই। আমরা কেন সবার চোখে জল দেখব? চারদিকে কেন এত কান্না, কেন এত দুঃখ? আমরা সবাই তো মনের আনন্দে দিন কাটাতে চাই...।'

মধুসূদন ধীরে-ধীরে মেঝেতে বসে পড়ল। মাথায় একটা হাত রেখে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক...ঠিক। সব্বাই হোলে হালে জিব কাটাবে এটাই বোঙার নিয়ম। একে-একে মরণ হবে...এ ঠিক নয়।'

আমি মধুসূদনের কাছে উবু হয়ে বসে পড়লাম। ধরা গলায় বললাম, 'মধুদা, তুমি আমার বাবার জন্যে কিছু করবে না? আমার মনের কষ্টটা দেখবে না? বলো...।'

মধুসূদন ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকাল। মাথাটা সামান্য ঘোরাতেই আর ওর চোখ দেখা গেল না—চশমার কাচজোড়া ঘরের বাল্‌বের আলোয় চকচক করে উঠল।

ঝিমলি আমার কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। ও চাপা গলায় বলল, 'মধুদা, প্লিজ। আমাদের হেল্‌প করো...।'

মধুসূদন আমার ভেজা চোখের দিকে তাকাল। তারপর কেমন যেন ঘষা গলায় বলল, 'আজ রাতে আপনাদের আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। নিজের চক্ষে আপনারা দেখবেন। অপদেবতার গায়ে জলপড়া দেব। তবে সেখানে গিয়ে হটপট করে কিছু যেন করবেন না—।'

ঠিক তখনই ঘরের দরজায় সুখেন্দু পাল এসে দাঁড়াল। মধুসূদনকে লক্ষ করে বিরক্ত গলায় বলল, 'কী ব্যাপার, মধু, এতক্ষণ ধরে এখানে কী করছ?'

সুখেন্দু পালের গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, পায়ে পাজামা। মুখে বিরক্তি এবং সিগারেট। কপালে আর ভুরুতে এত ভাঁজ পড়েছে যে, মুখের ময়লা রং আরও ময়লা দেখাচ্ছে।

সিগারেটটা মুঠো করে চেপে ধরে শোঁ-শোঁ করে টান দিল সুখেন্দু পাল। তারপর মধুকে একরকম খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'শুধু এদের দিকে দেখলেই চলবে! হোটেলে তো আরও বোর্ডার আছে, নাকি?'

মধুসূদন ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, 'এরা আমাকে অকারণে বকাবকি করছেন, বাবু। বলছেন ঘর ঠিকমতো ঝাড়পোঁছ হচ্ছে

নাকো।' গজগজ করা সুরে শেষ কথাটা বলে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল মধুসূদন, বলল, 'আপনারা দশটায় শোবেন তো! আমি তার আগে এসে স-ব আপনাদের মনের মতন করে দিয়ে যাব। কোনও চিন্তা নাই—।'

বুঝলাম, কথা ঘুরিয়ে দিয়ে সুখেন্দু পালের সন্দেহের পাশ কাটাল মধুসূদন। আর একইসঙ্গে আমাকে আর ঝিমলিকে ঠারেঠোরে জানিয়ে দিয়ে গেল, রাত দশটা নাগাদ ও আবার আসবে।

মধু দরজার দিকে রওনা হল। ওর কাঠের পা খটখট শব্দ তুলে এগোতে লাগল। শুনতে পেলাম ও বিড়বিড় করে বলছে, 'সারাদিন হাড়ভাঙা খাটানি—আমি আর পারছি নাকো...।'

মধুসূদন চলে যেতেই সুখেন্দু পাল একচোখ বুজে সিগারেটে চোস্ত টান দিল, বলল, 'গরিব মানুষ...ওদের একটু-আধটু বখশিস-টকশিস দিয়ে দেবেন। বোঝেনই তো, এ-চাকরি করে আর ক'টাকা পায়!'

আর দাঁড়াল না সুখেন্দু পাল, দরজা ছেড়ে চলে গেল। বারান্দার বাল্‌বের আলোয় ওর যে-কালো ছায়াটা হুমড়ি খেয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছিল সেটাও সরে গেল।

আমার বুক ঠেলে স্বস্তির বাতাস বেরিয়ে এল। এতক্ষণ একটা রহস্যময় দম আটকানো ভাব যেন আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল।

আমি ঝিমলির দিকে তাকালাম। দেখি ও খাওয়া থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ওকে বললাম, 'নে, চট করে খাওয়া শেষ করে নে। দশটার আগেই আমাদের রেডি হয়ে থাকতে হবে। মিহিরদাকে আমি বলে দিচ্ছি, আমরা মধুসূদনের সঙ্গে একটু বেরোব।'

ঝিমলি খেতে শুরু করেছিল, আমার শেষ কথাটা শুনে খাওয়া থামিয়ে দিল ঃ 'মিহিরদা আমাদের সঙ্গে যাবেন না?'

'না। মিহিরদা সঙ্গে থাকলে মধুসূদন সহজ হতে পারবে না।'

'সহজ হতে পারবে না মানে?' ঝিমলির কপালে ভাঁজ পড়ল।

আমি হেসে বললাম, 'তার মানে হি ওন্ট ফিল কমফোর্টেব্‌ল। ওঃ, তোর জন্যে আমাকে সঙ্গে দোভাষী নিয়ে ঘুরতে হবে দেখছি!'

'দোভাষী আবার কী?'

আমি কপট রাগ দেখিয়ে বললাম, 'এটার মানে বলব না। তুই খোঁজখবর করে জেনে নিবি—তা হলে লাইফে আর ভুলবি না।'

ঝিমলি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠোঁট ওলটাল ঃ 'ও. কে.।'

॥ সতেরো ॥

রাতের অন্ধকারে 'পথিক'-এর বাইরেটা যে 'পথিক'-এর ভেতরের চেয়ে এত আলাদা সেটা আগে বুঝতে পারিনি।

মেঘে-মেঘে আকাশটা কখন যেন লালচে হয়ে গেছে। বহু-দূরে-চলে-যাওয়া এরোপ্লেনের শব্দের মতো কুকুর যেমন চাপা গর্জন করে, ঠিক সেইরকম ধাঁচে মেঘ ডাকছিল। খুব ভালো করে খেয়াল না করলে ঘরে বসে এ-গর্জন টের পাওয়া মুশকিল।

আমি আর ঝিমলি খুব সাবধানে পা ফেলতে-ফেলতে মধুসূদনকে অনুসরণ করছিলাম। মধুসূদনের একহাতে একটা ছোট পেতলের ঘটি—তাতে দুটো ফুলের মালা জড়ানো। আর অন্যহাতে একটা হ্যারিকেন।

ও চলতে-চলতেই বিড়বিড় করে কীসব যেন বলছিল। সেটা দুর্বোধ্য ভাষায় কোনও মন্ত্র-টন্ত্রও হতে পারে।

'পথিক' থেকে আমরা বেরিয়েছি অদ্ভুতভাবে। অদ্ভুতভাবে বলছি এই কারণে যে, সদর দরজা দিয়ে আমরা বেরোইনি।

হোটেলটার একতলার পেছনদিকে পাশাপাশি দুটো বাথরুম আছে। দুটো বাথরুমই জরাজীর্ণ, ভাঙাচোরা। সে-দুটোর মাঝখান দিয়ে সরু একটা পথ আছে। সেই পথের শেষে বাউন্ডারি ওয়ালের যে-অংশটুকু চোখে পড়ে সেটা টিনের। মানে, ভাঙাচোরা বাউন্ডারি ওয়ালের একটা ফাঁকা অংশকে জং-ধরা টিন দিয়ে কোনওরকমে তাপ্পি দেওয়া হয়েছে। সেই তাপ্পির ফোকর দিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছি বাইরে।

ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর পেরোতেই মধুসূদন আমাদের ঘরে এসে হাজির হয়েছিল। তারপর আমি আর ঝিমলি ঘরের দরজায় তালা দিয়ে মধুদার সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছি।

দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমি ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করেছি, 'মধুদা, সুখেন্দু পাল টের পাবে না তো?'

মধুসূদন চাপা গলায় বলেছে, 'রাত ন'টা কি দশটা পেরোলেই বাবুর চোখে রং লাগে।'

'তার মানে?'

'মানে বোতল-বোতল মদ গিলে নেশা করে। এখন বাবুর কোনও হুঁশ নেইকো। কোনও ভয় নাই।'

সুখেন্দু পাল তা হলে এখন নেশা করে বেহেড হয়ে আছে! যাক, বাঁচা গেল।

ঝিমলিকে চাপা গলায় সে-কথাই বললাম।

একতলায় নেমে এসে দেখি একটামাত্র টিমটিমে আলো প্রাণপণে অন্ধকার তাড়ানোর চেষ্টা করছে।

এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সুখেন্দু পাল কেন, কাউকেই চোখে পড়ল না। এ ছাড়া কোনও শব্দও কানে এল না। শুধু অনেক করে কান পাতলে কয়েকটা রাতপোকার ডাক শোনা যাচ্ছিল।

খুব সাবধানে টিন সরিয়ে আমরা খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। আর এসে দাঁড়ানোমাত্রই একটা ঠান্ডা ভাব টের পেলাম। তা ছাড়া, বেশ সহজে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছিলাম।

পোকার একটানা ডাকের সঙ্গে চাপা মেঘের গর্জন শুনতে পেলাম। তখনই চোখ তুলে তাকালাম আকাশের দিকে। এবং আকাশের লালচে মেঘে আমি যেন আশঙ্কার ছায়া দেখতে পেলাম।

মধুসূদন বলল, 'সাবধানে আমার পেছু নিন, দিদিমণি।'

আমি ছোট্ট করে 'হুঁ' বললাম।

চলার পথটা এবড়োখেবড়ো। মাঝে-মাঝেই ছোট-বড় পাথরের টুকরো পায়ে ঠেকছে। যেদিকে আমরা এগোচ্ছি সেদিকে তাকালে লালচে মেঘের পটভূমিতে বিশাল-বিশাল গাছের ছায়া-ছবি চোখে পড়ছে।

হঠাৎই দুটো সাদা রঙের পাখি কর্কশ স্বরে ডেকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

ঝিমলি চাপা গলায় বলল, 'লক্ষ্মীপ্যাঁচা!'

আমি ভাবলাম, মিহিরদা আমাদের সঙ্গে এলে বলতেন, 'অন্তরা, আর কোনও চিন্তা নেই—যাত্রা শুভ।'

কিন্তু আমি মিহিরদা নই। এখানে আমি বাপির 'অসমাপ্ত' কাজ শেষ করার জেদ নিয়ে এসেছি।

মধুদা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে তাকাল। বাঁ-হাতের হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা ধরুন, দিদিমণি। এবার কাজ শুরু করতে হবে—গন্ধ পাচ্ছি।'

গন্ধ! কীসের গন্ধ!

হ্যারিকেনটা হাতে নিলাম আমি, আর একইসঙ্গে জোরে-জোরে নাক টানতে লাগলাম।

সত্যিই তো! একটা ঝিমঝিমে মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি যেন। এ গন্ধ তো আমার অচেনা নয়! 'পথিক' হোটেলের পাঁচনম্বর ঘরে মিহিরদা এই গন্ধ পেয়েছিলেন।

ন্যাপথালিনের গন্ধের সঙ্গে একটা নেশা-ধরানো মিষ্টি আমেজ মেশানো।

কিন্তু কী কাজ শুরু করবে মধুসূদন?

উত্তর পেলাম প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

ঘটি কাত করে ডানহাতে জল না কী যে যেন ঢেলে নিল মধুসূদন। তারপর ডানহাতের আঁজলা তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই জল ছিটিয়ে দিতে লাগল দুপাশে আর সামনের দিকে।

ঝিমলি জিগ্যেস করল, 'কী ছেটাচ্ছ, মধুদা?'

'চুপ, দিদিমণি। জলপড়া। বেবাক নেন্‌ঝাড় কাটিয়ে অপদেবতাকে নাস্‌ করতে হবে...নাস্‌ করতে হবে।'

কথা ক'টা বলেই মধুদা বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়া শুরু করল। সে-মন্ত্রের কানাকড়িও আমরা বুঝতে পারছিলাম না।

এই অবস্থাতেই আমরা এগিয়ে চললাম।

হঠাৎই এক জায়গায় এসে দেখি জমিটা কেমন যেন ঢালু হয়ে গেছে। আর সেই ঢালু জায়গাটা শাল-খুঁটি দিয়ে বেড়ামতন দেওয়া। তবে সময়ের কারসাজিতে সে-বেড়ার বহু জায়গাই ভেঙে গেছে। সেরকম একটা ভাঙা সীমানা বেছে নিয়ে মধুদা ঢালু জমিতে নামতে শুরু করল।

আমি আর ঝিমলিও ওর পিছু নিলাম।

মধুদা শুধু একবার মন্ত্র পড়া থামিয়ে চট করে বলল, 'সাবধানে আসবেন, দিদিমণিরা। আমার সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে সেঁটে থাকবেন যেন...।'

ঝিমলি ভয় পেয়ে আমার হাত খামচে ধরল। সেই অবস্থাতেই আমরা মধুসূদনের পেছন-পেছন এগিয়ে চললাম। মনে শুধু একটাই চিন্তা ঃ কিছুতেই যেন ওর কাছ থেকে পিছিয়ে না পড়ি।

এবড়োখেবড়ো পথে পা ফেলতে গিয়ে আমার হাতের হ্যারিকেন ভীষণ দুলছিল। সেইসঙ্গে দুলছিল আমার মনও। আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে মধুসূদন? কোন অপদেবতার গায়ে জলপড়া দেবে ও?

ঢালু জমি ধরে অনেকটা নামার পর আমাদের থামতে বলল মধুসূদন।

আবছা আলোয় বুঝতে পারছিলাম জায়গাটা গাছে ঘেরা। একপাশে টিলার মতো একটা বিশাল কালো পাথর। লালচে মেঘের ঘোলাটে আলো আর টিমটিমে হ্যারিকেনের মলিন শিখা জায়গাটাকে কেমন যেন ছমছমে করে তুলেছে।

মধুসূদন আমাদের বলল, 'দিদিমণি, আপনারা এইখানটায় দাঁড়িয়ে থাকুন। কিছুতেই ডরাবেন না। আমি তো আছি!'

মধুদার কথায় যে তেমন একটা ভরসা পেলাম তা নয়। ওই তো রোগা

দড়ি পাকানো চিমসে চেহারা! তার ওপর একটা **পা** আবার কাঠের! ও আমাদের কি বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে?

কিন্তু মনে পড়ে গেল, মিহিরদাকে মধু বলেছিল, কেউ ওর আর ক্ষতি করতে পারবে না। একবার অঙ্গহানি হয়ে কোনওরকমে বেঁচে গেলে তাকে আর কিছু করতে পারে না।

কিন্তু কে আর কিছু করতে পারে না? সেই অলৌকিক অপদেবতা?

আর যাদের সেরকম কোনও অঙ্গহানি হয়নি—মানে, আমাদের—আমাদের তো ভয় আছে!

আমি আর ঝিমলি দাঁড়িয়ে পড়লাম। মধুসূদন তখন আমাদের কাছ থেকে হাত-চারেক এগিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। ভাবটা এইরকম, যেন নীচের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখছে।

আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে সামনে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে টের পেলাম, ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধটা আমার নাকে ছুটে এসে ধাক্কা মারল।

একটু সামলে নিয়ে ভালো করে চোখ মেললাম সামনের দিকে। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, পাথরের টিলার গা-ঘেঁষে একটা কালো গহ্বর। তারই কিনারায় দাঁড়িয়ে গহ্বরের ভেতরে ঝুঁকে পড়েছে মধুসূদন।

একটা ঠান্ডা কালো ভয় আমাকে পেঁচিয়ে ধরল। মনে হল, আমার গলার নলিটা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ।

আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। গোটা শরীর ঘেমে গেল পলকে। জিভটা শুকিয়ে গিরগিটির চামড়া হয়ে গেল। আমি কোনওরকমে ডুকরে উঠলাম, 'মধুদা...।' তারপর কয়েক পা পিছিয়ে এলাম।

ভীষণ ভয় পেলেও আমি মনে-মনে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ, কোনও কিছু না দেখেই আমি ভয়ে আকুল হয়ে পাগলের মতো হাবুডুবু খাচ্ছি।

এ কী আশ্চর্য ভয়!

মধুসূদন আমার ডুকরে ওঠা ডাক শুনতে পায়নি। কারণ, ও তখন বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র পড়ছে। শুধু ঝিমলি আমাকে আঁকড়ে ধরে নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে, অন্তরা?'

আমি বললাম, 'না রে, কিছু হয়নি—।'

ওড়না দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিলাম আমি। একপলক তাকালাম আকাশের দিকে। এর মধ্যেই মেঘ আরও গাঢ় হয়েছে। কোথাও একফোঁটা বাতাস নেই—কেমন যেন গুমোট মতন। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। শুধু একটানা ঝিঁঝির কান্না আর মাঝে-মাঝে রাতপাখির ডাক।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, কখন যেন মধুদূনের মন্ত্রের সুর চড়া হয়ে গেছে। ও বলছে ঃ

অং কিলী কিলী কালি স্বহায় মন্ত্রে কাঁকুড়ি
খেয়ে ফেল্যাম খুলি, উড় বিশ তুই কুলী-কুলী
কার আজ্ঞা ভগ ডাকিনির আজ্ঞা।।

তিনবার এই কথাগুলো বলে ছড়াকাটার পর মধুসূদন ঘটির মন্ত্রপূত জল ছেটাতে লাগল গহ্বরের চারদিকে। আর কাঠের পা নিয়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতো গহ্বরটা ঘিরে পাক খেতে লাগল।

এভাবে কিছুক্ষণ কাটতে-না-কাটতেই অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটে গেল।

অন্ধকার গহ্বরের ভেতর থেকে ছিটকে এল তীব্র শিসের শব্দ।

শব্দটা এমন সুরে বাজছিল যেন কেউ যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে শিস দিচ্ছে।

শব্দটা প্রথমে কাটা-কাটা, তারপর কাঁপা-কাঁপা সুরে লম্বা একটানা, তারপর আবার এলোমেলো শিসের টুকরো, তারপর আবার বাঁশির দীর্ঘ আর্ত সুর।

সব মিলিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ঝরে পড়ছিল সেই অলৌকিক শিসের সুরে।

আমি মধুদাকে কিছু একটা বলতে যাব, ঠিক তখনই শুনতে পেলাম ডানা ঝাপটানোর শব্দ। অনেকগুলো পাখি যেন একসঙ্গে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আচমকা গুলির শব্দে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা একঝাঁক পায়রা যেভাবে ঝটপট করতে-করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে যায়, অনেকটা সেইরকম।

মধুদা ছিটকে দূরে সরে গেল। চকিতে ঝিমলির দিকে পিছিয়ে এলাম আমিও। ঝিমলি ভয়ে আমাকে জাপটে ধরল। আর-একটু হলেই হ্যারিকেনটা আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল।

সেই অন্ধকার গহ্বরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম বড়-বড় কতকগুলো কালো পাখি গর্ত থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে ওপর দিকে। মাপে পাখিগুলো প্রায় শকুনের মতো হবে। ওদের কালো শরীর লালচে আকাশের অনেকটা ঢেকে দিল।

পাখিগুলো গহ্বর থেকে উড়ে বাইরে এল বটে, কিন্তু ওদের কারও মুখ থেকে এককণা চিৎকার বেরোল না।

তবে একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করে দিয়েছিল।

কালো পাখিগুলোর ডানায়, গায়ে, মাথায়, এখানে-সেখানে, লেগে রয়েছে

উজ্জ্বল সবুজ ছোপ। রাতের অন্ধকারে সেগুলো বেড়ালের চোখের মতো জ্বলছে। কোনও খামখেয়ালি রং-মিস্ত্রি যেন সবুজ ফ্লুওরেসেন্ট রং পাখিগুলোর গায়ে নানান জায়গায় এলোমেলোভাবে লাগিয়ে দিয়েছে।

এতক্ষণ ধরে পাওয়া মিষ্টি ঝাঁজালো গন্ধটা হঠাৎই আরও উগ্র হয়ে উঠল। একইসঙ্গে কয়েক ঝলক ঠান্ডা বাতাস আমাদের ভাসিয়ে দিল। মনে হল যেন, পাখির ঝাঁকের ডানার ঝাপটায় সেই বাতাস ছুটে এসেছে আমাদের দিকে।

'ওগুলো—ওগুলো কী?' ঝিমলি ভয়-পাওয়া গলায় আমাকে জিগ্যেস করল।

'জানি না—তবে শকুন হতে পারে।' ঢোক গিলে বললাম আমি। তারপর মধুদার দিকে তাকিয়ে যোগ করলাম ঃ 'মধুদা হয়তো বলতে পারবে—।'

দেখি মধুসূদন আবার ছুটে গেছে গর্তটার দিকে। ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছে।

আমি আর ঝিমলি খুব সাবধানে পা ফেলে মধুসূদনের কাছে গেলাম। মনে সাহস এনে মধুদার পাশ থেকে উঁকি মারলাম। সামান্য ঝুঁকে তাকালাম গহ্বরের গভীরে।

একটা ঠান্ডা স্রোত আমাকে ভেতর থেকে কাঁপিয়ে দিল।

যা দেখলাম, আগে কখনও তা দেখিনি। বাপির ডায়েরিতেও এরকম কোনও দৃশ্যের কথা কোথাও লেখা নেই।

গর্তটার ভেতরে উঁকি মারতেই একটা ঠান্ডার ছোঁয়া পেলাম। জমাট শীত হঠাৎই আমার নাক-মুখ-চোখ ছুঁয়ে গেল। বরফের চাঁই দিয়ে ঘেরা কোনও জায়গায় ঢুকে পড়লে এমনটা হয়।

আমি নীচের দিকে তাকালাম।

নীচে—অনেক নীচে—উজ্জ্বল সবুজ একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল।

গ্রীষ্মকালে কুয়োর জল অনেক নেমে যায়। সেই কুয়োতে যদি জলের বদলে থলথলে কোনও সবুজ জেলি ভরতি থাকে—আর, তা থেকে যদি সবুজ আলোর আভা বেরোয়, তবে অনেকটা এইরকমই বোধহয় দেখাবে।

কালীপুজোর সময় একরকম দেশলাই-বাজি জ্বাললে সবুজ আগুন ফস করে ঝলসে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এর রংটাও সেই চোখ-ধাঁধানো সবুজ আগুনের মতো। আর শুধু রং নয়—শব্দটাও যেন কাছাকাছি। দেশলাই-কাঠি জ্বাললে যে-শব্দটা হয়, সেইরকম তেজি 'ফস-ফস' শব্দ উঠে আসছে কুয়োর গহ্বর থেকে। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে মিহি শিসের শব্দ।

শিসের এই শব্দটা বেশ দূর থেকেও শোনা যায় বলে মনে হল আমার। নিশ্চয়ই আশপাশের লোকালয়ের মানুষজন এই শিসের শব্দ বাড়ি থেকেই শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু তারা কেউই বেরিয়ে আসছে না বাড়ি থেকে।

এমন নয় যে, তাদের কোনও কৌতূহল নেই। তারা বেরিয়ে আসছে না ভয়ে। তারা জানে, রাতে এরকম শিসের শব্দ হলে বেরোতে নেই। বাপি ডায়েরিতে লিখে গেছে ঃ '...শিসের শব্দটাকে এখানকার মানুষ নিশির ডাক বলে ভাবে...ভয় পায়...।'

গর্তের অতলে সবুজ জেলির আলোটা ফ্লুওরেসেন্ট আলোর মতো ধকধক করে জ্বলছিল। বোধহয় সেখান থেকেই গায়ে সবুজ রং মেখে নিয়ে কালো পাখিগুলো রাতের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। শুধু দেখছিলাম না, বরং বলা উচিত, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে দৃশ্যটাকে গ্রহণ করছিলাম।

আমি কাঁপা হাতে হ্যারিকেনটাকে গর্তের কিনারায় একটা পাথরের ওপরে রাখলাম। তখনই টের পেলাম, ঝিমলি বজ্রমুঠিতে আমার বাঁ-হাত আকড়ে ধরেছে।

আমার হাতটা ব্যথা করছিল। কিন্তু ঝিমলিকে কিছু বললাম না। বরং ওকে আরও কাছে টেনে নিয়ে পাশ থেকে একহাতে প্রায় জড়িয়ে ধরলাম।

মিষ্টি গন্ধের ঠান্ডা ঢেউ গর্তের অতল থেকে উঠে আসছিল। আর শিসের শব্দ, ফস-ফস শব্দ, গর্তের ভেতরকার পাথুরে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পাক খেয়ে কেমন যেন একটা ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল।

গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমরা তিনজন এক অজানা-অচেনা ভয়কে প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম।

হঠাৎই মধুদা চাপা গলায় বলল, 'জানতাম আজ রাতে এখেনে একে দেখা যাবে। শয়তানটা একে-একে গ্রাম-কে-গ্রাম খ্যেয়ে লিচ্চে। একে নাস্ করতে হবে।'

এই কথা বলতে-বলতে কখন যেন পেতলের ঘটি তুলে নিয়েছে মধুসূদন। এবং প্রবল চিৎকার করে দুর্বোধ্য ভাষায় ওর হননমন্ত্র আওড়ানো শুরু করে দিয়েছে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরই উথালপাথাল ঘটনা ঘটে গেল।

মধুসূদন মন্ত্র পড়তে-পড়তে ঘটির জল হাতে ঢেলে নিয়ে গর্তের ভেতরে ছেটাতে শুরু করল। আর একইসঙ্গে গর্তের কিনারা ঘিরে পাক খেতে লাগল।

কাঠের পা নিয়ে বুড়ো মানুষটা ভেলকি দেখাচ্ছিল। এবড়োখেবড়ো জমিতে ওর চকিত চলাফেরা যেন ব্যালে নাচিয়েকে হার মানাচ্ছিল।

হ্যারিকেনের মলিন আলো মধুসূদনের মুখে পড়ছিল। ওর ভাঁজ পড়া কালো মুখে চকচকে ভাব। চশমার কাচে আলো ঠিকরে পড়ে চোখ আড়াল হয়ে গেছে। মাথার ধবধবে সাদা চুলকে আবছা আলোয় মনে হচ্ছে পালকের টুপি। নরম মনের মানুষটার মুখের ভাঁজগুলো এখন কেমন যেন নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে।

আকাশে মেঘ ডেকে উঠল জোরে। আর ঠিক তখনই গর্তের ভেতরে

প্রবল ঝড় উঠল।

মধুদার জলপড়ার ছিটে বোধহয় পড়েছিল সেই সবুজ জ্যোতির ওপরে। আমি আর ঝিমলি ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলাম।

লক্ষ করলাম, সবুজ জেলির মতো জিনিসটা আচমকা কুঁকড়ে গেল। তারপরই জেলিটা আকার বদলে নিল। ওটার একটা অংশ হঠাৎই হাতের মতো লম্বা হয়ে ছিটকে উঠল শূন্যে—যেন পলকে ছোবল মারার ঢঙে আমাদের নাগাল পেতে চাইল।

শিসের শব্দ থেমে গিয়ে খসখসে শব্দটা অনেক জোরালো হয়ে উঠল। শব্দটা এমন, যেন কোনও অতিকায় প্রাণী ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে, ছাড়ছে। আর সবুজ আলোর আভাটাও হয়ে উঠেছে অনেক তেজি।

মধুসূদন জলপড়া ছেটানো থামায়নি। দাঁতে দাঁত চেপে অসম্ভব জেদ নিয়ে নিজের কাজ করে চলেছে।

ওপর দিকে ছোবলের ঢঙে ছিটকে আসা 'হাত'টা নেমে গিয়েছিল নীচে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার জেলির অন্য অংশ থেকে একটা ছোবল ছুটে এল ওপরে।

মিষ্টি গন্ধটা ক্রমে আরও ঝাঁজালো হয়ে অসহ্য মাত্রায় পৌঁছে গেল। আমি আর ঝিমলি একইসঙ্গে নাকে ওড়না চাপা দিলাম।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে গম্ভীর গুবগুব শব্দ তুলে একটা অলৌকিক ঝড় যেন পাতাল থেকে উঠে আসতে লাগল ওপরে।

ঝড় যতই বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা শোঁ-শোঁ শব্দ শুরু হল। তারপর বরফ-ঠান্ডা বাতাসের ঝড় স্ক্রুর মতো প্যাঁচ খেয়ে অতল সবুজ থেকে ধেয়ে এল ওপরে।

আমি 'মধুদা!' বলে চিৎকার করে উঠলাম।

মধুসূদন চেঁচিয়ে বলল, 'ভয় পাবেন না, দিদিমণি! ভয় পেলেই দানবটা পেয়ে বসবে—আরও ভয় দেখাবে!'

ঝিমলি ভয়ে কাঠ হয়ে আমাকে লতানে গাছের মতো আঁকড়ে ধরে রইল। আর ঝড়ের হিমশীতল বাতাস আমাকে, ঝিমলিকে, মধুদাকে ঠান্ডায় যেন জমিয়ে দিল।

আচমকা ভয়ংকর শব্দে মেঘ ঢেকে উঠল আকাশে।

আমরা চমকে উঠলাম। তখনই কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি টের পেলাম গায়ে।

মধুদা তখনও জলপড়া ছেটাচ্ছে আর বলছে, 'শয়তানটা রাগে কেমন ফুঁসছে দেখেন, দিদিমণি। মর, শালা মর!' বলে মধুদা আমাদের অজানা ভাষায় তীব্রভাবে কীসব বলতে লাগল। বোধহয় অপদেবতাকে গালাগাল দিতে লাগল।

কড়কড় করে বাজ পড়ল কাছেই। আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চিরে

গেল সাদা আলোয়।

আমরা কেঁপে উঠলাম।

ঝিমলি কান্না মেশানো গলায় বলল, 'অন্তরা, পালিয়ে চল—প্লিজ। আমার ভীষণ ভয় করছে।'

আমি ওর হাত আঁকড়ে ধরলাম, বললাম, 'একমিনিট...।'

হঠাৎই দূরে কতকগুলো আলো চোখে পড়ল আমার। অন্ধকারে মিছিল করে আলোর বিন্দুগুলো যেন এগিয়ে আসছে।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'মধুদা! ওই দ্যাখো!'

মধুসূদনের জলপড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল—কারণ, শেষমেশ ও পেতলের ঘটিটা উপুড় করে দিয়েছিল গর্তের ভেতরে।

আমার কথায় মধুদা গর্তের দিক থেকে চোখ তুলে তাকাল। দূরের আলোর মিছিলটার দিকে দেখল।

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। চাপা গলায় বলে উঠল, 'সর্বনাশ!'

আশ্চর্য! যে-মানুষটা এতক্ষণ ধরে এতটুকু ভয় পায়নি সে এখন হঠাৎ ভয়ে সিঁটিয়ে গেল কেন?

'পালিয়ে চলুন, দিদিমণি! ওরা আসছে!'

'ওরা কারা?' প্রশ্নটা করতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল।

'ওদের আপনারা চেনেন না। মানে, ওরা ভালো নয়। ওরা এই শয়তানটার পুজো করে। এখন বোধহয়...সেই পুজো করতে আসছে।'

কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল আমার। মনে পড়ে গেল ময়না সরেনের কথা।

কিন্তু সে-ঘটনা তো ঘটেছে এখান থেকে অনেক দূরে—চাঁদমণি গ্রামে যাওয়ার পথে! তা হলে এখানে আবার কীসের পুজো?

বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আকাশে, আর মেঘ ডেকে উঠল অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে।

আমরা চমকে উঠলাম।

গর্ত থেকে পাক খেয়ে উঠে আসা হিম-বাতাসের ঝড় আমাদের প্রায় জমিয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে ফোঁসফোঁসানি শব্দ। আমরা কেমন যেন স্থবির হয়ে গিয়েছিলাম।

সে-অবস্থাটা কাটল মধুসূদন গর্তের কিনারা ছেড়ে চটপট হাঁটা দিতেই।

'চলুন, দিদিমণি—শিগগির পালিয়ে চলুন! কোথাও একটা আড়াল-টাড়াল দেখে লুকিয়ে পড়তে হবে!'

আমি আর ঝিমলি তড়িঘড়ি রওনা দিলাম।

তখনই হ্যারিকেনের আলোটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিল।

কারণ, আমরা যেমন দূর থেকে ওই আলোর মিছিল দেখতে পাচ্ছি, ওরাও নিশ্চয়ই আমাদের হ্যারিকেনের আলোটা দেখতে পাচ্ছে!

কিছু একটা এক্ষুনি করা দরকার।

সুতরাং গর্তের কিনারায় ফিরে এসে আর কোনও কিছু না ভেবেই বাঁ-হাতের এক থাপ্পড়ে হ্যারিকেনটাকে ফেলে দিলাম গহ্বরের ভেতরে।

ততক্ষণে মধুদা আর ঝিমলি পালাতে শুরু করেছে। আমি পড়ে রয়েছি পেছনে। তাই অদ্ভুত গোঙানিটা আমি বোধহয় একাই শুনতে পেলাম।

গর্তের অতল থেকে ভেসে এল সেই অপার্থিব আওয়াজ। যেন একটা যন্ত্রণা দুমড়ে-মুচড়ে পাক খেয়ে ছটফট করছে, আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। লকলকে জেলির সবুজ হাত আবার ছিটকে উঠে এল গর্তের প্রায় মুখ পর্যন্ত। আর সবুজ আভাটা পলকে যেন তিনগুণ হয়ে গেল।

আমি ছুটতে শুরু করলাম। ছুটতে-ছুটতেই বারবার মুখে হাত বোলাতে লাগলাম—যাতে হিম হয়ে যাওয়া মুখে সাড় ফিরে আসে।

তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে মধুদা বোধহয় পড়ে গেল। কারণ, ওই আবছা অন্ধকারে মধুদার কালো অবয়বটাকে আমি মাটিতে পড়ে যেতে দেখলাম বলে মনে হল। তবে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ও উঠে দাঁড়াল।

ঝিমলি পেছন ফিরে তাকিয়ে চাপা গলায় আমাকে বারবার 'তাড়াতাড়ি আয়! তাড়াতাড়ি আয়!' বলে তাড়া লাগল।

আমি পড়িমরি করে ওদের কাছে পৌঁছলাম। দেখি, চলার সুবিধের জন্যে মধুসূদন একটা শুকনো গাছের ডাল কখন যেন কুড়িয়ে নিয়েছে।

বৃষ্টি টুপটুপ করে পড়তে শুরু করল। ওপরে তাকিয়ে দেখি, আকাশের রং আরও গাঢ় হয়েছে। তারই মাঝে সবুজ আলোর ঝিলিক নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। বুঝতে পারলাম, অন্ধকার রঙের পাখিগুলো এলাকা ছেড়ে মোটেই চলে যায়নি। গহ্বরের সেই ভয়ঙ্কর সবুজের টান ওদের চলে যেতে দেয়নি।

আমরা তাড়াহুড়ো করে এগোচ্ছিলাম।

মধুদা চাপা গলায় বলল, 'দিদিমণি, আমার মতো ওরাও জানত, আজ এখানে অপদেবতাকে দেখা যাবে।'

ঝিমলি তখনও থরথর করে কাঁপছিল। কাঁপা গলায় জিগ্যেস করল, 'কারা, মধুদা?'

'ওই যে—' আঙুল তুলে আলোর মিছিলের দিকে দেখাল মধুসূদন : 'যারা আলো নিয়ে আসছে...।'

আমরা দুটো বড়-বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। সামনেই একটা

বড় গাছ থাকায় আড়ালটা বেশ জুতসই হল।

গহ্বরের ভেতরের গোঙানিটা বোধহয় থেমে গিয়েছিল। কারণ, এখান থেকে ভালো করে কান পেতেও কিছু শোনা যাচ্ছে না।

বৃষ্টি টুপটাপ ঝরেই চলল। আমি আর ঝিমলি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালাম। মধুদা আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে কৌতূহল-মাখা চোখে সামনে তাকিয়ে রইল।

আলোর মিছিলে আলোর সংখ্যা তেমন বেশি নয়—বড় জোর আট-দশটা হবে। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল, মিছিলের গতি যেন একটু বেড়েছে। সেটা হঠাৎ-নেমে-পড়া বৃষ্টির জন্যে, নাকি আমাদের হ্যারিকেনের আলো দেখার জন্যে, তা বলতে পারব না।

মিছিলটা কাছে এলে বুঝলাম, শুধু আট-দশজন নয়, মিছিলে মানুষের সংখ্যা পনেরো-ষোলোর বেশি। কিছু লোকের হাতে মশাল নেই—তাই অন্ধকারে তাদের বোঝা যাচ্ছিল না। এখন কাছে আসাতে অস্পষ্ট ছায়াগুলো নজর করা যাচ্ছে। আর তাদের সঙ্গে ময়না সরেনের মতো কোনও শিকার নেই দেখে একটু স্বস্তি পেলাম।

একটা গুনগুন আওয়াজ ভেসে আসছিল ওই মিছিলের দিক থেকেই। মিছিলটা যখন খুব কাছে—প্রায় বারো-তেরো হাত দূরত্বের মধ্যে—এসে গেল তখন মধুদা চাপা গলায় বলে উঠল, 'বসে পড়ুন, দিদিমণি! বসে পড়ুন!'

সঙ্গে-সঙ্গে আমি আর ঝিমলি পাথরের আড়ালে বসে পড়লাম। মধুদাও এক অদ্ভুত কৌশলে পা ভাঁজ করে বসে পড়ল। কিন্তু লুকিয়ে পড়লে কী হবে, পাথরের ফাঁক দিয়ে আমি মিছিলটাকে লক্ষ করতে লাগলাম।

মিছিলের মানুষগুলো চাপা গলায় কোরাস গাইছিল। সেই গানের কথাগুলো বুঝতে না পারলেও একটা অদ্ভুত সাপ-খেলানো সুর আমাকে যেন অবশ করে দিতে চাইল।

ওই গানের অর্থ মধুদাও বলতে পারল না। শুধু রাগী সুরে বলল, 'কী করে বলব বলুন, দিদিমণি! কখনও তো অপদেবতাকে ডাকিনি—শুধু ভগবানকে ডেকেছি।'

বৃষ্টি আমাদের গা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আকাশে বিদ্যুৎ-রেখা দেখা যাচ্ছিল ঘন-ঘন। ছোট-বড় শব্দে বাজ পড়ছিল। মনে হল, বৃষ্টি আরও জোরালো হয়ে উঠবে।

মধুদাকে গর্তটার কথা জিগ্যেস করলাম।

মধুদা বলল, গর্তটা আসলে একটা পুরোনো কুয়ো। ব্যবহার না করে-করে অকেজো হয়ে গেছে। গরমের সময় বহু নীচে জল দেখা যায়। কালো অন্ধকারের মধ্যে আকাশের গোল ছায়া দেখে জল আছে বলে বোঝা যায়। শীতকালে তার ছিটেফোঁটাও থাকে না।

আজ রাতে অপদেবতা দেখা দিয়েছে—তাই জল খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু কাল সকালে এলেই আবার জলের দেখা পাওয়া যাবে। কুয়োটায় ওপর থেকে ঢিল ফেললে তার আওয়াজ শোনা যায় অনেক পরে—কিন্তু জলের আওয়াজ। তাতে বোঝা যায়, জল আছে।

ঝিমলি জিগ্যেস করল, 'তোমার এই মন্ত্র দেওয়া জল কোথা থেকে পেলে, মধুদা?'

মধুসূদন বলল, বাঘমুন্ডি পাহাড়ে একজন গুণিন আছে। সে সবসময় কথা বলে না—খেয়াল হলে পর কথা বলে। অনেক সাধ্যসাধনা করলে তারপর কিছু দেয়। যেমন দিয়েছে এই পেতলের ঘটির মন্ত্রপূত জল।

আমার কৌতূহল বাড়ছিল। সেই গুণিনের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছিল। এ ছাড়াও একটা প্রশ্ন মনে উঁকি দিচ্ছিল ঃ আজ যে অপদেবতার তিথি সেটা মধুদা জানল কেমন করে?

এমনসময় একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম।

মিছিলের মুখগুলো আমাদের খুব কাছ দিয়ে হেঁটে চলেছে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় কাপড় জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া। কিন্তু তারই মধ্যে একটা মুখ দেখে আমি চমকে উঠেছি। মুখটা ঝিমলিরও চেনা।

স্বর্ণভূষণ তরফদার! যে ঝিমলির হাতে কালো দাগের 'চুড়ি' পরিয়ে দিয়েছে।

ঝিমলির দিকে তাকিয়ে দেখি ও-ও স্বর্ণভূষণকে চিনতে পেরেছে। ওর মুখটা হাঁ হয়ে যাচ্ছিল—এই বুঝি ভয়ে চিৎকার করে উঠবে।

আমি আর দেরি না করে চট করে ঝিমলির মুখে হাত চাপা দিলাম।

॥ আঠেরো ॥

ব্যাপারটা যেন ম্যাজিকের মতো। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছিল। কোনও অপার্থিব ভয়ংকর ম্যাজিশিয়ান রাত হলেই নানারকম ভয়ের ম্যাজিক দেখাচ্ছে। আর সকালের আলো ফুটলেই সবকিছু কেমন বদলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কাল রাতে আমরা যা দেখেছি সব ভুল দেখেছি। ওগুলো হয় স্বপ্ন, নয়তো কোনও মায়াবীর মায়া।

কিন্তু স্বর্ণভূষণ তরফদারের মুখটাই সব কেমন গোলমাল করে দিচ্ছে। কাল রাতে ওকে নিশ্চয়ই আমি আর ঝিমলি ভুল দেখিনি!

অথচ চারপাশে তাকিয়ে স্পষ্ট ঝকঝকে রোদ, চকচকে সবুজ পাতা, রুক্ষ

এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমি আর অর্জুন, পিয়াশাল, মহুয়া, বহড়া, গলগলি গাছ দেখে দিব্যি মনে হচ্ছে কাল রাতে আমরা বোধহয় কিছু দেখিনি।

পরশু রাতে ময়না সরেনের ঘটনার পর কাল সকালে যখন আমরা জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলাম, তখনও অনেকটা এইরকমই মনে হয়েছিল।

কাল রাতে মাঠ থেকে ফেরার পর আমি আর ঝিমলি সারাটা রাত ভয়ে-ভয়ে জেগে কাটিয়েছি। তারপর ভোরের আলো ফুটতেই মিহিরদার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ওঁর ঘুম ভাঙিয়েছি দুজনে।

ঘুমচোখে আমার আর ঝিমলির কাহিনি শুনেছেন মিহিরদা। কে কার আগে বলব তাই নিয়ে আমি আর ঝিমলি মাঝে-মাঝেই একসঙ্গে কথা বলে ফেলছিলাম। আর বলতে-বলতে কেমন একটা চাপা উত্তেজনাও টের পাচ্ছিলাম।

সব শোনার পর মিহিরদা বললেন, 'শোনো, আর দেরি নয়। আজ ব্রেকফাস্ট সেরেই আমরা থানায় যাব। এ ক'দিনের ব্যাপারগুলো সব রিপোর্ট করব।'

গণপতিকে কাল রাতে বাড়ি যাওয়ার ছুটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ও বলেছে, আজ সকাল ন'টার মধ্যেই চলে আসবে।

বেরোতে-বেরোতে আমাদের সাড়ে ন'টা হয়ে গেল। বেরিয়ে দেখি, টাটা সুমোর স্টিয়ারিং-এ গণপতি হাজির।

গাড়িতে উঠে ওকে আন্দাজে পথের ইশারা দিলাম। 'পথিক'-এর পেছনদিকে একটা মাঠের কথা বলতেই গণপতি মোটামুটি বুঝতে পারল। ঘাড় নেড়ে ও গাড়ি স্টার্ট দিল।

খানিকটা এগিয়ে বাঁ-দিকের একটা মেঠো পথে বাঁক নিল গণপতি। উঁচু-নিচু পথে গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে লাগল।

একটু পরেই দুটো বন্ধ দোকানের গা-ঘেঁষে টাটা সুমোটা দাঁড় করালো গণপতি। টিন আর দরমা দিয়ে তৈরি দোকানের খাঁচাগুলো দেখে মনে হয় না কখনও দোকান দুটো খোলা হয়।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল গণপতি। আমাদের নামতে বলল। তারপর দোকান দুটোর পাশের খোলা জায়গার দিকে এগোল।

সেখানে কয়েকটা পাথর ছড়িয়ে আছে। আর পাশেই সরু-সরু দুটো গাছ।

জায়গাটায় পৌঁছতেই একটা বিশাল প্রান্তর আমাদের চোখে পড়ল। উঁচু-নিচু ঢেউখেলানো রুক্ষ প্রান্তর। তার মাঝে-মাঝে কয়েক জায়গায় গাছের জটলা।

দূরের একটা বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখাল গণপতি : 'দিদিমণি, ওই যে আপনাদের হোটেল।'

দেখে আমরাও আবছা-আবছা চিনতে পারলাম। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই আমি,

মিহিরদা, আর ঝিমলি মাঠের দিকে রওনা হলাম। গণপতিকে বললাম, 'তুমি গাড়িতে ওয়েট করো—আমরা আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।'

গুপ্তধন খোঁজার মতো করে আমি আর ঝিমলি কাল রাতের ভূগোলটা খুঁজতে শুরু করলাম।

প্রথমে 'পথিক'-এর জং ধরা টিনের তাপ্পিটা খুঁজে বের করলাম। তারপর কাল রাতের প্রতিটি দৃশ্য মনে করার চেষ্টা করে স্মৃতি হাতড়ে-হাতড়ে এগোতে লাগলাম।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। সেই শাল খুঁটি ঘেরা ঢালু জমিটা দেখতে পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা তিনজনে পা চালালাম সেদিকে।

দিনের আলোয় কিছু লুকোনোর উপায় নেই। সবকিছুই খোলা পাতার মতন —শুধু পাতার আড়ালে ওত পেতে থাকা সবুজ আতঙ্কটুকু ছাড়া।

আমরা পাথুরে টিলাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। তার পাশে এলোমেলোভাবে ছোট-বড় পাথর পড়ে আছে। কাল রাতে ওইখানে গিয়েই আমরা সেই অদ্ভুত গহ্বরের ভেতরে উঁকি মেরেছিলাম।

টিলার কাছাকাছি কয়েকটা গাছ। এ ছাড়া কয়েকটা গাছ এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

মিহিরদাকে বললাম, 'মিহিরদা, ওই যে—সেই কুয়োটা। কাল রাতে...।'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মিহিরদা বললেন, 'চলো, দেখছি।'

আমরা চটপটে পায়ে টিলার কাছে এগিয়ে গেলাম।

মিহিরদা ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে লাগলেন। তার মধ্যেই অন্তরা এগিয়ে গিয়ে কুয়োর কিনারায় ঝুঁকে পড়ে নীচে উঁকি মেরেছে।

মিহিরদা টিলার আশপাশটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, 'অন্তরা, এদিকে লোকজন রেগুলার আসে বলে মনে হয় না। এলে সবজায়গায় এরকম নুড়ি-পাথর ছড়িয়ে থাকত না। তা ছাড়া, তাকিয়ে দ্যাখো—মাঠের ওপর দিয়ে পায়ে-চলা পথেরও কোনও ছাপ নেই।'

কথা বলতে-বলতে আমি আর মিহিরদা কুয়োর কিনারায় চলে এলাম। পাথরের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কুয়োর গহ্বরের ভেতরে উঁকি মারলাম। আমাদের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে ঝিমলি তখন একই কাজ করছিল।

মিহিরদা নীচের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'হুঁ...এই কুয়োটা কেউ ইউজ করে না। যাকে বলে অ্যাবান্‌ডন্‌ড। জলের লেভেল যে কোথায় আছে কে জানে!'

আমিও ঝুঁকে পড়ে কুয়োর জল দেখতে চেষ্টা করছিলাম—কিন্তু ঠিকমতো

ঠাহর করতে পারছিলাম না।

ঝিমলি টপ করে একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল। তারপর আমরা তিনজনেই কান পেতে রইলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর জল থেকে উঠে আসা শব্দটা শোনা গেল। খুব কমজোরি 'টুপ' শব্দ একটা।

মিহিরদা তখনও উঁকি-ঝুঁকি মেরে জল দেখতে চেষ্টা করছিলেন। আলতো করে বললেন, 'হ্যাঁ...অনেক নীচে জল নড়ছে বলে মনে হচ্ছে।'

আমি আর ঝিমলি নতুন উৎসাহে ভালো করে ঝুঁকে পড়লাম আবার।

হ্যাঁ, অনেক নীচে ছোট্ট একচিলতে ধূসর আকাশ নড়ছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, 'মিহিরদা, কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না। কাল রাতে এখানে এত কাণ্ড হল, আর আজ তার কোনও চিহ্নমাত্র নেই! আশ্চর্য!'

মিহিরদা ছোট্ট করে 'হুঁ' বলে ক্যামেরা বাগিয়ে কুয়োটার ফটো তুলতে লাগলেন।

আমি আর ঝিমলি এদিক-ওদিক ঘুরে কাল রাতের সেই পাথর দুটো চিনতে পারলাম—যার আড়ালে লুকিয়ে আমরা মিছিলের লোকদের লক্ষ করছিলাম।

একটু পরে আমরা ফিরে চললাম গাড়ির দিকে।

মিহিরদা বললেন, 'অন্তরা, ব্যাপারটা কিন্তু পুজো-আর্চার মতোই ঠেকছে। অনেক লোকজন মিলে কোনও এক অপদেবতার পুজো করছে। এই পুজো শুধু রাতে হয়—দিনের আলোয় হয় না।'

আমি বললাম, 'এ কেমন দেবতা! শুধু রাতে পুজো নিতে আসে, দিনে উধাও হয়ে যায়! তা ছাড়া, ওই কালো পাখিগুলো...।'

ভুল করছ, অন্তরা। দেবতা নয়—অপদেবতা। আর ওই বড়-বড় পাখিগুলো হয়তো শকুন হতে পারে। তবে ওগুলো সেকেন্ডারি। আসল হল, ওই দেবতা কিংবা অপদেবতার ব্যাপারটা। সেটা আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। দ্যাখো, আজ বিকেলে প্রিয়বরণ তোমাকে নতুন কোনও ক্লু দেয় কি না।'

ঝিমলি বলল, 'প্রিয় বোধহয় সেরকম কিছু জানে না। ওর ইন্টারেস্ট তোর দিকে।' শেষ কথাটা ও বলেছে আমার দিকে তাকিয়ে, আর সেইসঙ্গে চোখও মটকেছে।

আমি শুধু ঠোঁটে হাসলাম। ঝিমলির সঙ্গে ফাজলামিতে আমি পারব না।

আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠতেই মিহিরদা গণপতিকে বললেন, 'বাঘমুন্ডি থানায় চলো। বড়বাবুর সঙ্গে একটু দেখা করব।'

গণপতি সামান্য অবাক হলেও কিছু বলল না—গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

*

বাঘমুন্ডি থানার চেহারাটা দেখার মতো এবং বলার মতো।

পিচের রাস্তা থেকে একটা টিলার ঢাল উঠে গেছে ওপরে। সেই ঢালে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় শালগাছ। ঢালের শুরুতেই মাটি কেটে আট-দশ কাঠা মতন একটা জায়গা সমান করা হয়েছে। সেটাই থানার ক্যাম্পাস।

ছোট টিলার গাছপালার পটভূমিতে থানাটাকে দেখতে ঠিক পাহাড়ি ছবির মতো লাগছিল। থানার লাগোয়া একটা ফাঁকা জায়গায় 'পুলিশ' লেখা দুটো জিপ দাঁড়িয়েছিল। আমাদের টাটা সুমোটা গণপতি সেখানে পার্ক করে দিল।

রাস্তা থেকে থানার ক্যাম্পাসটা প্রায় হাত-তিনেক উঁচুতে। তাই মাটিতে সিঁড়ির ধাপ কেটে শানপাথর বসানো। সেই ধাপ ক'টা উঠলেই ছোট গ্রিলের গেট। তারপর থানার উঠোন। উঠোনের সদর দরজার পাশেই 'বাঘমুন্ডি থানা' লেখা একটা সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে।

উঠোন ঘিরে থানার সবক'টা ঘর দাঁড়িয়ে—অনেকটা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ধাঁচে। সেই ঘরগুলোর দরজার মাথায় ছোট-ছোট নেমপ্লেটে বাংলায় লেখা রয়েছে ঘরের পরিচয়। যেমন, 'বড়বাবু', 'অফিস', 'মালখানা', 'হাজতঘর'—এমনকী 'প্রস্রাবখানা', 'পায়খানা' পর্যন্ত।

থানার ঘরগুলোর রং সাদা। ঘরের মাথায় পাঁচিল ঘেরা ছাদ বলে কিছু নেই—শুধু দুটো ঘরের ন্যাড়া ছাদে দুটো জলের ট্যাঙ্ক বসানো।

আমরা তিনজনে সিঁড়ির ধাপ ভেঙে উঠে পড়লাম থানার ক্যাম্পাসে।

মিহিরদা বললেন, 'আমাদের কথা শুনে বড়বাবুর কী রিয়্যাকশন হবে কে জানে!'

'রিয়্যাকশন যাই হোক, ব্যাপারগুলো জানানো দরকার।' আমি বললাম, 'বিশেষ করে যখন এতগুলো লোক মিসিং হয়ে যাওয়ার কেস...।'

'দেখা যাক।'

উঠোনে দাঁড়িয়ে একজন সেপাই কোমরের বেল্ট ধরে নাড়াচাড়া দিচ্ছিল। বোধহয় নীচের দিকে নেমে যাওয়া প্যান্টটাকে বাগে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। সে-দৃশ্য দেখে ঝিমলি হেসে ফেলল, বলল, 'হাউ ফানি!'

আমি ওকে ইশারায় চুপ করতে বললাম। যদিও সেপাইয়ের চেহারা আর ভঙ্গি মিলিয়ে দৃশ্যটা বেশ মজারই বটে।

সেপাইটার চেহারা বেশ রোগা। গায়ের রং এত কালো যে, চোখ দুটো সাদা টুনি বাল্‌বের মতো জ্বলছে। ঠোঁটের ওপরে বেশ মোটাসোটা গোঁফ। বগলে চেপে

ধরা লাঠি। আর দু-হাত কোমরের বেল্ট আঁকড়ে ধরে অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিতে ঢোলা প্যান্টটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে ওপরে তুলছে।

ঝিমলি চাপা গলায় বলল, 'দ্যাখ, দ্যাখ, ওর য়ুনিফর্মটা এত ঢোলা যে, প্যান্টুল ঠিক করতে-করতে সার্ভিস লাইফের থার্টি পারসেন্ট টাইম চলে যাবে।'

ঝিমলির কথায় মিহিরদা প্রায় জোরে হেসে ফেলেছিলেন আর কী! দেখলাম, তিনি কোনওরকমে চোয়াল শক্ত করে হাসি চেপে সেপাইটিকে বললেন, 'বড়বাবু আছেন? আমরা জার্নালিস্ট—কলকাতার ''সুপ্রভাত'' নিউজপেপার থেকে আসছি।'

সেপাইটি যেভাবে তড়িঘড়ি অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল তাতে মনে হল, 'সুপ্রভাত'-এর বোধহয় নাম শুনেছে। 'সুপ্রভাত' যে এদিকে আসে সেটা পুরুলিয়া স্টেশানে দেখেছি। তা ছাড়া, কে জানে, পাহারাদারটির হয়তো সাহিত্য-বাতিক আছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন' বলে সে লম্বা-লম্বা পা ফেলে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল 'বড়বাবু' লেখা ঘরের দিকে।

আমি আর ঝিমলি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে লোকটির পেছন-পেছন এগোলাম।

উঠোনে বেশ গরম লাগছিল। বড়বাবুর ঘরে ঢুকতেই আরাম পেলাম।

সেপাইটি সেলাম ঠুকে বড়বাবুকে বলল, 'স্যার, এনারা নামকরা খবরের কাগজ ''সুপ্রভাত'', তার সাংবাদিক। কলকাতা থেকে এসেছেন।'

আমরা বড়বাবুর দিকে তাকালাম। ওঁর চেহারা দেখে খুব একটা ভরসা পেলাম না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ওঁকে জানানো ছাড়া উপায় নেই।

মিহিরদা আমাদের দিকে আড়চোখে একপলক তাকিয়ে তারপর বড়বাবুর দিকে ফিরে হাতজোড় করে বললেন, 'নমস্কার! আমরা কলকাতা থেকে...।'

মিহিরদা পরিচয়ের পালা সারছিলেন, আর আমি বড়বাবুকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম।

গোলগাল তামাটে মুখ। মুখে একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব আছে। তবে মাথাজোড়া চকচকে টাক বয়েসটা জানান দিচ্ছে। ঠোঁটের ওপরে প্রজাপতি গোঁফ। ওটাকে দুপাশ থেকে ছেঁটে একটু ছোট করে দিলেই চার্লি চ্যাপলিনের মতন হয়ে যেত। গালে বা থুতনিতে দাড়ির খুব একটা ব্যাপার আছে বলে মনে হল না। তবে তাদের খোঁচা-খোঁচা চেহারা দেখে মনে হল, সকালে বোধহয় দাড়ি কামানোর সময় পাননি।

বড়বাবুর গায়ে খাকি ইউনিফর্ম। তার বুকপকেটের কাছে প্লাস্টিকের প্লেটে বাংলা এবং ইংরেজিতে নাম লেখা ঃ কেদারনাথ সেনাপতি।

কেদারনাথের ছোট-ছোট চোখে যেন হালকা সন্দেহের কাজল লাগানো। ঘন-ঘন মাথা ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। কোনও কথা বললে মোটামুটিভাবে 'উঁ-উঁ' শব্দ করে জবাব দিচ্ছেন। আর নিতান্ত দরকার না পড়লে কথা খরচ

করছেন না।

মিহিরদার পরিচয়ের গৌরচন্দ্রিকা শেষ হলে কেদারনাথ ইশারায় আমাদের বসতে বললেন। জোড়া-তাপ্পি দেওয়া তিনটে কাঠের চেয়ারে আমরা বসে পড়লাম।

কনস্টেবলটি তখনও একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বড়বাবু তাকে বললেন, 'পদু, এবার যাও—ডিউটি করো গিয়ে।'

ঠান্ডা কাঠ-কাঠ গলায় কেদারনাথ কথাগুলো বললেন। তাতে ধমকের সুর না থাকলেও ধমক বলে বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। পদুর সেটা বুঝতে একটু দেরি হল। কিন্তু বুঝতে পেরেই আর দেরি করল না। প্যান্টটাকে ওপরে টেনে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সামনের টেবিল থেকে একটা বড় বাঁধানো খাতা আর কিছু কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে দিলেন কেদারনাথ, তারপর বললেন, 'পদু—মানে, প্রদীপ—ওর একটু লেখালিখির চর্চা আছে। আপনারা পত্রিকার লোক—তাই অত আঠা।'

কেদারনাথ বেশ মোলায়েম সুরে নিভাঁজ ঢঙে কথাগুলো বললেন। কিন্তু আমাকে সুররিয়ালিস্টিক ধাক্কা দিল ওই 'আঠা' শব্দটা।

সামনের টেবিলটা মাপে বেশ বড় হলেও জিনিসপত্র বিশেষ নেই। দুটো কাচের পেপারওয়েট, একটা জলভরতি দু-লিটারের প্লাস্টিক-বোতল, আর তিনটে বলপয়েন্ট পেন। এ ছাড়া একপাশে কালো রঙের টেলিফোন।

কেদারনাথের মাথার পেছনে দেওয়াল—আর দুপাশে দুটো জানলা। জানলা দিয়ে কড়া আলো আসছিল—তাই ব্যাকলাইটের জন্যে কেদারনাথের মুখটা কিছুটা আঁধার হয়ে যাচ্ছিল।

থানার সব দেওয়ালেই সাদা রং, আর জানলা-দরজায় ক্যাটকেটে নীল রং। জানলাগুলো পুরোনো ধাচের—গ্রিলের বদলে লম্বা-লম্বা লোহার শিক লাগানো।

মিহিরদা এবারে সমস্যার কথা বলতে লাগলেন। খুব ধীরে, পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতন করে, মিহিরদা সমস্যার কয়েকটা স্তরমাত্র তুলে ধরলেন বড়বাবুর সামনে। আর বাকি খোসাগুলো ছাড়ানো তো দূরের কথা—ছুঁলেনই না।

যেমন, মলিনের কথা বললেন, ময়না সরেনের কথা বললেন, আর বললেন চুনারাম মাহাতের কথা। বাপির কথা একফোঁটাও বললেন না মিহিরদা, বললেন না 'পথিক' হোটেলের সুখেন্দু পালের কথা, মধুসূদনের কথা, কিংবা স্বর্ণভূষণ তরফদারের কথা।

কথা শেষ করার সময় মিহিরদা একটু হোঁচট খেয়ে বললেন, 'এই যে মানুষজন উধাও হচ্ছে, বাপ-মা কান্নাকাটি করছে...এর তো একটা সুরাহা হওয়া দরকার।'

'উঁ...দরকার...ভীষণ দরকার।' মাথা নেড়ে বললেন কেদারনাথ।

মিহিরদা সেই পুরোনো কৌশল আবার ছুড়ে দিলেন পাশুপত অস্ত্রের মতো। মানে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে কেদানাথের দিকে এগিয়ে ধরলেন, হেসে বললেন, 'প্লিজ...।'

কেদারনাথ সেনাপতি ভুরু উঁচিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে ঠান্ডা নজরে তাকালেন মিহিরদার দিকে। মরা মানুষ হাসলে যেমন দেখায় সেইরকম নিষ্প্রাণ হাসি হাসলেন। তারপর আচমকা সামনে ঝুঁকে এসে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে একটা সিগারেট তুলে নিলেন প্যাকেট থেকে। সেটা ঠোঁটে লাগিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা সুখেন্দু পালের "পথিক" হোটেলে উঠেছেন তো?'

মিহিরদা নিজে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, বড়বাবুর প্রশ্নে স্পষ্ট চমকে উঠলেন। হাত থেকে সিগারেটটা আর-একটু হলে পড়েই যাচ্ছিল—কোনওরকমে সেটা সামলে নিলেন।

এতটা চমকে যাওয়ার কারণ, কথা বলার সময় মিহিরদা আমরা যে হোটেলে উঠেছি সেটা বললেও কোন হোটেল তা বলেননি।

'দিন, আগুন দিন—' লাইটারের জন্যে হাত বাড়ালেন কেদারনাথ সেনাপতি ঃ 'আগুন নিয়েই আমাদের যত কারবার...' মিহিরদা লাইটার জ্বালিয়ে এগিয়ে ধরলেন ওঁর সামনে। সিগারেট ধরা মুখটা বাড়িয়ে কেদারনাথ সেই আগুনে সিগারেটের ডগা ছোঁয়ালেন। পরপর ক'টা টান দিলেন, সেইসঙ্গে মুখে শব্দ করলেন, 'উঁ-উঁ-উঁ।' তারপর ওপরদিকে মুখ করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'খোঁজখবর রাখাটা খুব বাজে কাজ, মিস্টার গাঙ্গুলি—তবে ওই রাখতে হয় শালা ফ্যাতা পাবলিকের জন্যে।'

আই. কিউ.-র সঙ্গে যে মুখের চেহারার কোনও সম্পর্ক নেই, সেটা আরও একবার বোঝা গেল বড়বাবুর কথা শুনে। লোকটা ঘোড়েল—একইসঙ্গে অসভ্য। কারণ, দু-দুজন মেয়ে সামনে হাজির থাকা সত্ত্বেও কী অনায়াসে 'শালা' কথাটা বলে ফেললেন!

ঝিমলির দিকে তাকিয়ে দেখি ও ব্যাপারটা অতটা গায়ে মাখেনি। আমার চোখে চোখ পড়তেই ও বুঝল আমার কিছু একটা হয়েছে। তাই চোখের ইশারায় জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

আমি ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালাম। ইশারায় বোঝালাম, 'না, কিছু না।'

বড়বাবু সিগারেটে টান দিতে-দিতে মিহিরদাকে বললেন, 'আপনি তো মাস-চারেক আগে এই বাঘমুন্ডিতে এসেছিলেন—ওই "পথিক" হোটেলেই উঠেছিলেন।'

মিহিরদা বার-দুয়েক কাশলেন। বড়বাবুর কথায় অবাক না হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এসেছিলাম।'

'ওই সুরঞ্জন মজুমদারের ডেডবডি নিতে—তাই না?'

আশ্চর্য! বোকা-বোকা এই পুলিশ অফিসারটা সব জানে!

মিহিরদার ইগো বোধহয় একটু আহত হয়েছিল। ওটাকে হাত বুলিয়ে তোয়াজ করে তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে জানালেন, হ্যাঁ, এসেছিলেন।

'তো লোকজন উধাও হওয়ার ব্যাপারে আপনার এত ইন্টারেস্ট কীসের?'

'আমি জার্নালিস্ট—তাই।' মিহিরদা সহজভাবে বললেন।

'উঁ।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কেদারনাথ। তারপর : 'এখানে অনেক পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়। সব ব্যাপারের কি আর সুরাহা আছে? নেই। কিন্তু আপনি যখন কমপ্লেন করছেন তখন অবশ্যই লিখে নেব—অ্যাকশন নেওয়ারও চেষ্টা করব।'

টেবিলে রাখা খাতাটা টেনে নিয়ে 'চটাস' শব্দে খাতাটা খুলে ফেললেন কেদারনাথ। একটা বলপয়েন্ট পেন তুলে নিয়ে খচখচ শব্দে কীসব লিখলেন। তারপর মিহিরদার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন খাতাটা। পেনটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন, সই করুন। ফিনিশ।'

মিহিরদা কেদারনাথের এই চটজলদি কাজে বেশ অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। আড়চোখে খাতার খোলা পাতার দিকে দেখলেন। সেখানে কুৎসিত হাতের লেখায় ইংরিজিতে লেখা রয়েছে :

Moyna Saren, Chunaram Mahat and many other persons missing.

সমস্যাটিকে বড়বাবু মাত্র ন'টা শব্দে দিব্যি ছকে ফেলেছেন। যার আর-একটা অর্থ এমন হতে পারে যে, সমস্যাটি এরকমই সংক্ষিপ্ত এবং তুচ্ছ।

মিহিরদা সই করে দিলেন।

'কী, এবার খুশি তো?' চকচকে চোখে বড়বাবু মিহিরদাকে জিগ্যেস করলেন।

মিহিরদা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তখনই 'ক্রি-রি-রি-রিং' শব্দে ফোন বেজে উঠল। একটা হাই তুলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন কেদারনাথ।

'হ্যালো—বাঘমুন্ডি থানা।'

ওপাশ থেকে কোনও পুরুষালি গলা শোনা যাচ্ছিল—তবে কথাগুলো বোঝা যাচ্ছিল না। কেদারনাথের কথা শুনে ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছিল।

'না, না—আপনার ওই ঘড়িটা রিকভার করা যায়নি। মন্দির-মাঠের পাশের রাস্তায় কেসটা হয়েছিল তো। হ্যাঁ—ওই এরিয়ায় যে-দুজন ছিনতাই কেস করে বেড়ায় তাদের তুলে এনে কষ্কু পালিশ দিয়েছিলাম। গ্যাঁজলা বেরিয়ে গেছল। না, মালটা ওরা নেয়নি। আমি তো পড়িমড়ি চেষ্টা করলাম—কিন্তু বেরোল না।...না, না, ও-কাজটা করবেন না। একে তো আমাদের হপ্তায় ওই চাড্ডি টাকা দেন—সেটা বন্ধ করলে চলে!...আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন—এখেনে চলে আসুন। আমাদের

মালখানায় প্রচুর রিস্টওয়াচ আছে—এদিক-সেদিকের মাল। ও থেকে যেটি মন চায় বেছে নিয়ে যান। ব্যস, হল তো! ঝামেলা মিটে গেল।...হ্যাঁ, হ্যাঁ—আজই সন্ধেবেলা চলে আসুন। ঘড়িও পেয়ে যাবেন, আর একসঙ্গে বসে মেজাজটাও একটু খেলিয়ে নেওয়া যাবে...হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক আছে।'

কেদারনাথ ফোন রেখে সিগারেটে ফুড়ুক-ফুড়ুক করে টান দিয়ে ছোট টুকরোটা ঘরের কোণে ছুড়ে দিলেন। মিহিরদার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী, স্যাটিসফাইড?'

মিহিরদা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'স্যাটিসফায়েড মানে...লোকগুলো মিসিং সেটা রিপোর্ট করে কখনও স্যাটিসফায়েড হওয়া যায়! ওদের খুঁজে পেলে...মানে, খোঁজ করে যদি দেখতেন...।'

হাসলেন বড়বাবু ঃ 'বললাম যে অ্যাকশন নেব। খোঁজ নেব। কিন্তু নিয়ে লাভ নেই। ওদের পাওয়া যাবে না। আমরা জানি। আপনারা নতুন—তাই উচাটনে ভুগছেন। ঠিক আছে।' হাতে হাত ঘষে বড়বাবু এবার হাঁক ছাড়লেন ঃ 'পদু! পদু!'

প্রদীপ প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল ঃ 'বলুন, স্যার—।'

'সন্ধেবেলা সুহাসবাবু আসবে একটা রিস্টওয়াচ বেছে নিতে। মালখানার রিস্টওয়াচগুলো গুছিয়ে একটা ডিব্বায় ভরে রেডি রাখো। নইলে তখন আবার পেরাঞ্চি হবে।'

প্রদীপ প্যান্টটা টেনে-টুনে সামলে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কেদারনাথ ওকে পিছু ডাকলেন ঃ 'শোনো—।'

প্রদীপ ঘুরে তাকাল বড়বাবুর দিকে।

'তোমার তো প্যান্টের কেস দেখছি কেরোসিন। হয় পাছায় মাংস লাগাও নয় প্যান্ট ঠিক করে সিলাও। স্টুপিড।'

প্রদীপ মুখ কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে গেল।

মিহিরদার দিকে তাকিয়ে হাসলেন কেদারনাথ ঃ 'বলুন, আপনার আর কী সেবা করতে পারি?'

মিহিরদা সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে আগুনটা রগড়ে দিলেন। ছোট্ট করে কেশে বললেন, 'নাঃ, আর কিছু না। মিসিং কেসগুলো শোনার পর ভাবলাম থানায় জানানো উচিত—তাই আপনাকে জানিয়ে গেলাম।'

'খুব ভালো করেছেন। এটাই তো সৎ নাগরিকের কাজ! তবে আপনারাও কেয়ারফুল থাকবেন। আপনার সঙ্গে লেডিজ রয়েছে। এই এরিয়া থেকে যে-রেটে লোকজন হাপিস হচ্ছে...কেয়ারফুল থাকবেন কিন্তু।'

কেদারনাথের শেষ কথাটায় একটা চাপা শাসনের সুর টের পেলাম। লক্ষ

করলাম, মিহিরদার কপালে ভাঁজ পড়েছে। অপলকে বড়বাবুকে দেখছেন, ওঁর মনের ভেতরটা আঁচ করতে চাইছেন।

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে ছিলাম আমি। কেদারনাথের অদ্ভুত সব কথা শুনছিলাম। ভদ্রলোকের—অবশ্য ভদ্রলোক বলা যাবে কি না বুঝতে পারছি না—কথাবার্তার ঢং অসহ্য। আমরা যে কাগজের লোক, আমি আর ঝিমলি যে মহিলা—সেসব ব্যাপারকে কোনও পাত্তাই দিচ্ছেন না।

সুতরাং আর চুপ করে থেকে লাভ নেই। তাই বললাম ঃ 'আমরা তো কেয়ারফুল থাকব বুঝলাম। কিন্তু এখানে কোনও ক্রাইম হলে লোকজন এসে আপনার ওই জাবদা খাতায় এক লাইনের রিপোর্ট লেখায়, তারপর বাড়ি গিয়ে কেয়ারফুল থাকে? এটাই কি দস্তুর?'

কাল্পনিক কী যেন চিবোলেন বড়বাবু। ওঁর ফোলা গাল নড়ল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। এটাই দস্তুর। তবে সে যদি রিপোর্ট লিখিয়ে বাড়ি পর্যন্ত বেঁচেটা পৌঁছতে পারে তবেই কেয়ারফুল থাকবে।' কথা শেষ করে চাপা হাসি হাসলেন কেদারনাথ।

এটা আর চাপা শাসন নয়—স্পষ্ট হুমকি।

কিন্তু আমরা কাগজের লোক। দরকার পড়লে এ. ডি. এম., ডি. এম., যে-কোনও লেভেলে যেতে পারি। একটু রুখে উঠে সেরকমই একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলাম বড়বাবুকে, কিন্তু মিহিরদা টেবিলের আড়ালে আমার হাত চেপে ধরলেন।

মিহিরদা দুবার কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন। তারপর বড়বাবুকে বললেন, 'মিস্টার সেনাপতি, আমরা মিসিং কেসগুলো রিপোর্ট করে আমাদের ডিউটি করেছি...এবার আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।' একটু চুপ করে থেকে মিহিরদা আবার বললেন, 'যদি মাইন্ড না করেন, আমার একটা প্রশ্ন ছিল—।'

'বলুন।'

'এখানকার কিছু লোক কি অপদেবতার পুজো করে?'

হো-হো করে হেসে উঠলেন কেদারনাথ সেনাপতি। হাসির চোটে চেয়ারে একেবারে এলিয়ে পড়লেন। ওঁর যে ভুঁড়ি আছে সেটা এবার বোঝা গেল। হাসির দমকে দিব্যি ভুঁড়িকম্প হচ্ছিল।

আমরা তিনজনে ওঁর হাসি থামার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হাসির ঢেউ কমে এলে কেদারনাথ হাসতে-হাসতেই জিগ্যেস করলেন, 'অপদেবতা কাকে বলে?'

মিহিরদা চট করে জবাব দিতে পারলেন না। আমিও মনের ভেতরে একটা জুতসই জবাব হাতড়ে চললাম।

কিছুক্ষণ সময় নেওয়ার পর মিহিরদা একটু মিনমিন করেই বললেন, 'যে-দেবতা...মানে...ক্ষতি করে...তাকে অপদেবতা বলতে পারেন।'

আবার হাসলেন কেদারনাথ। এপাশ-ওপাশ গোঁফ নাড়লেন ঃ 'ক্ষতিই যদি করবে তা হলে মানুষ তার পুজো করবে কেন?'

'যাতে ক্ষতি না করে।'

'উঁ—মাস্তানকে তোলা দেওয়ার মতো!'

কথাটা কানে লাগলেও কিছু করার নেই। কেদারনাথের কথাবার্তাই ওইরকম।

আমি আর মিহিরদা চুপ করে রইলাম। কী বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

কেদারনাথ আবার হেসে বললেন, 'তা হলে তো বাঘ-সিংগি, দাঁতালো শুয়োর, অজগরের বাচ্চা, তিমি, হাঙর, বাজপাখি কি গন্ডারের ছা-ও আমাদের ক্ষতি করতে পারে। নিন—তা হলে ওদের পুজো শুরু করে দিন।' কথা শেষ করেই উঁচু গলায় ব্যঙ্গের হাসি।

কী অদ্ভুত উদাহরণ! দাঁতালো শুয়োর, বাজপাখি, গন্ডারের ছা! হরিব্‌ল্!

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে বড়বাবু বলে চললেন, 'এই স্বাধীন দেশে আপনি স্বাধীনভাবে যা খুশি পুজো করতে পারেন, গাঙ্গুলিমশাই। গামছা, গাছের ডাল, কাঁচি, কলাগাছ—যা খুশি। কারও কিছু বলার রাইট নেই, বুঝলেন!'

আমরা এটুকু বুঝতে পারছিলাম, আর বুঝে লাভ নেই। মানে-মানে উঠে পড়াই ভালো।

সুতরাং আমি কেদারনাথকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। মিহিরদা আমার দিকে একপলক তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বড়বাবুকে বললেন, 'আমাদের হেল্‌প করার জন্যে ধন্যবাদ।'

আমাদের দেখাদেখি ঝিমলিও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আমরা তিনজনে চলে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই পেছন থেকে কেদারনাথ সেনাপতি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'আপনারা কোনও অপদেবতার পুজো দেখেছেন নাকি?'

মিহিরদা ময়না সরেনের নিখোঁজ হওয়ার কথা বললেও ওকে যে আমরা রাতের আঁধারে সবুজ আগুনে ফেলে দিতে দেখেছি সেটা বলেননি। শুধু সারথি সরেনের শোক-সন্তাপের কথা বলেছেন। এ ছাড়া, কাল রাতের ঘটনাও কিছু জানাননি।

তাই বড়বাবুর প্রশ্নে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'না, কিছু দেখিনি। শুধু লোকজনের মুখে শুনেছি।'

'উঁ—তাই বলুন। একটা অ্যাডভাইস দিই—যদি নিতে মন চায়। ওসবে কান

দেবেন না। ওসব কিংবদন্তি।'

আর কথা না বলে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

চড়া রোদ বাইরের উঠোনে ঠিকরে পড়েছে। তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আমরা পা ফেলে মেন গেটের দিকে এগোলাম।

প্রদীপকে চোখে পড়ল। উঠোনের একপ্রান্তে শালগাছের ছায়ায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পায়ের কাছাকাছি একটি ছাইরঙা মা-মুরগি তার হাফডজন ছানা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কীসব খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে।

হঠাৎ কী মনে হল, আমি মুরগি দেখার ছলে প্রদীপের কাছে চলে গেলাম। চাপা গলায় বললাম, 'শুনলাম আপনি সাহিত্যিক—তাই আপনার মতামত চাইছি—।'

প্রদীপ চমকে উঠে তাকাল আমার চোখে। দেখি ওর চোখ খুশিতে উজ্জ্বল। বোধহয় এই প্রথম কেউ ওকে 'সাহিত্যিক' বলল।

আমি ঝুঁকে পড়ে মুরগির ছানা ধরতে গেলাম। দুটো হলদে ছানা দৌড়ে আমার নাগালের বাইরে পালিয়ে গেল।

আমি উবু হয়ে বসা অবস্থাতেই প্রদীপের দিকে মুখ তুলে তাকালাম, জিগ্যেস করলাম, 'বড়বাবু লোক কেমন?'

প্রদীপ সঙ্গে-সঙ্গে চাপা গলায় উত্তর দিল, 'জঘন্য। দু-নম্বরি।'

আমি 'থ্যাংক য়ু' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখি মিহিরদা আর অন্তরা ক্যাম্পাসের সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে দেখছে।

প্রদীপকে ছোট্ট করে 'আবার দেখা হবে' বলে আমি প্রায় দৌড়ে মিহিরদাদের কাছে গেলাম।

শানবাঁধানো সিঁড়ির ধাপে নামতে-নামতে মিহিরদা বললেন, 'হঠাৎ মুরগি ধরতে গেলে?'

আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, আর তাতেই প্রদীপের কাছে জানলাম, কেদারনাথ লোকটা জঘন্য—দু-নম্বরি।'

'হুঁ।' বলে মিহিরদা চুপ করে গেলেন।

আমরা যখন টাটা সুমোর দিকে এগোচ্ছি তখন ঝিমলি আমার কাছে এসে বলল, 'শোন, খুব ট্রাই করে ওয়ার্ডগুলো মেমোরাইজ করেছি—পরে তোকে মানে জিগ্যেস করব বলে। ফ্যাতা, সুঝাও, কঙ্কু, চাড্ডি, পেরাঞ্চি, সিলাও, বেঠুয়া আর কিংবদন্তি।'

আমি হেসে বললাম, 'তোকে নিয়ে আর পারি না! এর মধ্যে দু-তিনটের মানে বলতে পারব—বাকিগুলো জানি না। তুই না বড্ড বেশি ইনকুইজিটিভ।'

লতে সুবিধে হয় সেইজন্যে প্রিয়বরণ বেশ আস্তে
া কুড়ি-টুড়ি কিলোমিটার হবে। ওর মাথার চুল (
ই উড়ছিল না। তবে ওর গা থেকে গন্ধ উড়ে আসা
য় 'অ্যাক্স এফেক্ট'।

র পেছনের সিটে বসার সময় প্রিয় আমাকে ওড়
নছিল, 'দেখবেন, ওটা যেন বেশি না ওড়ে। চাক
ব।'

যখন ওড়না ঠিকঠাক করে গুছিয়ে সিটে উঠে বসলাম
দেখি মিহিরদা আর ঝিমলি দরজায় দাঁড়িয়ে। মিহির
ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। ওর চোখ যেন বলছে, 'ফি
া হচ্ছে।'

ণের সঙ্গে আমার যাওয়ার ব্যাপারটায় ঝিমলি প্রথম
এসেছে। অথচ আজ যখন তৈরি হয়ে প্রিয়র বাইবে
ই আমার জামা টেনে ধরেছে। বলেছে, 'অন্তরা, ও
রট্যান্ট? একটা অলটারনেটিভ কিছু ভাবা যায় না
ওর চোখের দিকে তাকিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নে
মাকে ডাকছে।'

ও নিচু গলায় বলেছে, 'ও. কে.। টেক কেয়ার।'
হাত তুলে ওকে অভয় দিয়েছি। যদিও ভেতরে-ভেত
করছিল। কিন্তু নতুন কিছু জানার কৌতূহলটা আমা
ণ আজ একটা নতুন শার্ট পরে এসেছে। বাদামি ত
টা ফুলশার্ট। এই শার্টটা শুধু যে আগে দেখিনি ত
বেরোচ্ছিল।

বশ ফাঁকা। দু-ধারে গাছপালা আর দোকানপাট। মাঝে-
হ। বিকেলের রোদ খুব কড়া না হলেও গায়ে লাগছি
া করে মাথায় পেঁচিয়ে নিয়েছিলাম।

লল, 'এদিক-ওদিক কিছু ঘুরে দেখবেন নাকি?'
অন্যমনা থাকায় প্রথমে খেয়াল করিনি। তাই বললা
-ওদিক কিছু ঘুরে দেখতে চান?'
া কোথায় যাচ্ছি?'

'বাঘমুণ্ডি পাহাড়ের দিকে। একটা জায়গা আপনাকে দেখাব...আর কিছু কথাও আছে।'

'এদিকে আর দেখার কী আছে?'

'রাজবাড়ি আছে। সেখানে রাধা-গোবিন্দের মন্দির আছে, পঞ্চরত্ন শিবের মন্দির আছে—।'

'আপনি খুব আস্তিক দেখছি।'

'না—' মাথা নাড়ল প্রিয় ঃ 'আমি নাস্তিক। তবে মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোটার কাজ আছে—বেশ সুন্দর। তাই বলছি।'

আমি বললাম, 'না, থাক। আগে কাজগুলো সেরে নিই, তারপর ওসব জায়গায় বেড়ানো যাবে।'

প্রিয় চুপ করে গেল। বোধহয় দমে গেল খানিকটা। কিন্তু ওর বোঝা উচিত আমি ওর সঙ্গে কাজে বেরিয়েছি—বেড়াতে নয়। নাকি ও 'অনেক কথা বলার আছে' বলে আমাকে ধাপ্পা দিয়েছে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। শব্দ করে বাইক ছুটে চলেছে। চলতে-চলতে একসময় আমরা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম। রাস্তাটার ঢাল খানিকটা ওপরদিকে। আর দুপাশে গাছপালা বেশ ঘন। তার মধ্যে কয়েকটা গাছ বিশাল লম্বা—যেন আকাশ পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঢাল বেয়ে ওঠার জন্যে মোটরবাইক গোঁ-গোঁ শব্দ করছিল। প্রিয়বরণ বেশ পটু হাতে সেটাকে বাগ মানিয়ে এদিক-ওদিক বাঁক নিয়ে দিব্যি ওপরে উঠছিল।

হঠাৎই একটা বাঁক নিতেই আমরা তিনজন লোকের মুখোমুখি হয়ে পড়লাম।

প্রিয়বরণ শব্দ করে ব্রেক কষে বাইক থামাল। শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে খানিকটা ধুলোও উড়ল। আমি আর-একটু হলে বাইক থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম। প্রিয়র জামা খামচে ধরে কোনওরকমে সামলে নিলাম।

তিনজন মানুষের মুখই তামাটে রঙের পাথরে খোদাই করা। মাথায় ছোট-ছোট চুল। চোখ সরীসৃপের মতো ঠান্ডা, স্থির। ওদের গায়ে সাদা ফতুয়ার মতন জামা—ঘামে ভেজা। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা লকেট। আর মাথায় আলগোছে একটা কালো কাপড় জড়ানো। তবে তিনজনের প্যান্টের রং এক নয়। একজনের প্যান্টের রং খাকি। আর-একজনের রং গাঢ় সবুজ। তৃতীয়জনের প্যান্টের রং ছাই-ছাই। তিনটে প্যান্টের মধ্যে মিল যেটুকু, সেটুকু হল, তিনটে প্যান্টই নানান জায়গায় তালি মারা।

তিনজনকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, বাইকের পথ আটকানোর জন্যেই ওরা আচমকা পথের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে।

মোটরবাইক থামতেই আমি বাইক থেকে নেমে পড়েছিলাম। ওড়না সরিয়ে দিয়েছিলাম মাথা থেকে।

প্রিয় ঘাড় ঘুরিয়ে একপলক তাকাল আমার দিকে। অস্পষ্ট গলায় বলল, 'ভয় পাবেন না, ম্যাডাম। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে—।'

প্রিয়র কথায় খুব একটা ভরসা পেলাম না। কারণ, ওদের গলায় ঝোলানো লকেট আমি চিনতে পেরেছি। আর সঙ্গে-সঙ্গে কোন এক চোরাপথে ভয় এসে ঢুকে পড়ল আমার বুকের ভেতরে।

ওদের লকেটে আঁকা সেই দুটো চোখ, আর চাকা-চাকা দাগ।

প্রিয়বরণ বাইক থেকে নেমে পড়েছিল। ও বাইকটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করাতে-না-করাতেই ওদের মধ্যে একজন চট করে সামনে এগিয়ে এসে ওর জামা খামচে ধরল। দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র গলায় বলল, 'এসব কী হচ্ছে?'

প্রিয় কিন্তু একটুও ভয় পেল না। ঠান্ডা গলায় বলল, 'জামা ছাড়ো।'

আশ্চর্য! লোকটা জামা ছেড়ে দিল। কিন্তু ওর রাগ কমল না। একইরকম সুরে বলল, 'আমাদের সঙ্গে বুঝাবুঝি না করে এসব কী হচ্ছে? তোমাকে এসব মানায় না।'

লোকটার সঙ্গে আমার দূরত্ব বড়জোর তিন-চার হাত। ওর ঘামে ভেজা ফতুয়া ফেটে স্বাস্থ্য বেরিয়ে আসতে চাইছে। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বেশ কিছুটা পথ দৌড়ে এসেছে।

সেটা হতে পারে। হয়তো পাহাড়ের কোনও উঁচু জায়গা থেকে ওরা বাইনোকুলার কিংবা ওরকম কোনও যন্ত্র দিয়ে প্রিয়বরণের ওপরে নজর রাখছিল। তারপর আমাদের বাইক পাহাড়ে ওঠা শুরু করতেই ওরা ওপর থেকে দুদ্দাড় করে নেমে এসেছে।

নাকি ওরা আমার ওপরে নজর রাখছিল?

বোধহয় তাই। কারণ, বাঘমুন্ডিতে এসে যখনই আমি, ঝিমলি আর মিহিরদা রাস্তায় বেরিয়েছি, তখনই একটা সিক্সথ সেন্স আমাকে যেন খোঁচা মেরেছে। মনে হয়েছে, কেউ আমাদের ফলো করছে—চোখে-চোখে রাখছে।

প্রিয়বরণ লোকটাকে চাপা গলায় কী বলল। তারপর হাত ধরে একটু দূরে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে আগাছার ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ওরা দুজন হাত নেড়ে কথা বলতে লাগল। ওদের কথা আমি আর শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবে একবার যেন 'মলিন' কথাটা কানে এল। সেটা মলিন সামন্তর ব্যাপারে, না 'ময়লা' বা ওরকম কিছু বোঝাতে, সেটা ধরা গেল না।

কথা বলতে-বলতে প্রিয় মাঝে-মাঝেই আমার দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু ওই

লোকটার কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। বরং ওর সঙ্গী দুজন পাহারা দেওয়ার ঢঙে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল।

এবার আমি একটু বিরক্ত হচ্ছিলাম। এই লোকগুলো যদি আরও দেরি করিয়ে দেয় তা হলে বেলা পড়ে আসবে। হোটেলে ফেরার তাড়ায় প্রিয়র আসল কথাগুলো হয়তো আর শোনাই হবে না।

শেষ পর্যন্ত যখন প্রিয়বরণকে ডাকব কি না ভাবছি, ঠিক তখনই ওদের গলা উঁচু পরদায় চড়ে গেল।

লোকটা বলল, '...কিছুতেই সব ফাঁস হতে দেব না। প্রভুর আদেশে জান নিয়ে নেব।'

প্রিয়বরণ লোকটার দিকে তর্জনী তুলে বলল, 'সে হলে আমার ডেডবডি ডিঙিয়ে যেতে হবে। আমাকে দিয়ে তোমরা খারাপ কাজ করিয়ো না।'

'যাও-যাও! চোটপাট অন্য জায়গায় দেখাবে। শত্তুরকে নিয়ে গলাগলির নাটক করছে!'

প্রিয় লোকটার দিকে এমন চোখে তাকাল, যার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। আমার মনে হল, ওর চোখের নজরে যেন তীব্র শাসন—অথচ, ঠোঁটের কোণে একচিলতে অবজ্ঞার হাসি।

লোকটার কাছ থেকে সরে আসার আগে প্রিয় ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমাকে ডিসটার্ব করতে বারণ কোরো। যদি কথা না শোনো, তা হলে আমিও তোমাদের ডিসটার্ব করব। এমন ডিসটার্ব করব যে, আর বলার নয়।'

প্রিয় মুখ ঘুরিয়ে চটপট পা ফেলে চলে এল বাইকের কাছে। শান্ত গলায় আমাকে বলল, 'উঠে পড়ুন, ম্যাডাম। খামোকা খানিকটা সময় নষ্ট হল।'

ওকে অনেক কিছু জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ইচ্ছেটা ইচ্ছেই রেখে দিলাম।

তিনজন মানুষের না-পসন্দ নজরের সামনে দিয়ে আমি আর প্রিয় বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। লক্ষ করলাম, লোকগুলো মরা-মানুষের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ওরা আমাদের দেখল।

আমরা পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠে চললাম। দুপাশের দৃশ্য কী মনোরম! লম্বা-লম্বা গাছ। তাদের ঘিরে খাটো গাছের দঙ্গল। এদিক থেকে ওদিকের গাছে ছিটকে উড়ে যাচ্ছে ছোট-বড় পাখি। ওদের ডাকাডাকি কানে আসছে। বিকেলের রোদে গাছের পাতায় হলদে আগুন জ্বলছে। কয়েক মুহূর্ত মনেই পড়ল না যে, আমরা এখানে কেন এসেছি।

হঠাৎই আমরা একটা খোলা জায়গায় এসে পড়লাম।

জায়গাটা একটা টিলার মতন। পথটা সরু হয়ে ডানদিকে চলে গেছে—হারিয়ে গেছে জঙ্গলের আড়ালে। কিন্তু সামনেটা প্রাণভরে খোলা।

প্রিয়বরণ ডানদিকের ঝোপঝাড় ঘেঁষে বাইক দাঁড় করাল। আমি নেমে পড়লাম, প্রিয়ও নামল। বাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে হাত-পা ছাড়িয়ে নিল। পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল।

আমি ততক্ষণে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে গেছি।

টিলাটা নুড়ি-পাথর মেশানো মাটি দিয়ে তৈরি—তবে ওপর-ওপর। ভেতরে নিশ্চয়ই শক্ত পাথরের কাঠামো রয়েছে। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি তার দুপাশে গাছপালা বেশ দূরে-দূরে। টিলার সামনের দিকটা ঢালু হয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে মিশেছে একটা নদীতে।

নদীটা চওড়ায় বিশাল। তবে গভীরতা বোধহয় কম—কারণ, জলে কোনও স্রোত নেই। জলের রং কালচে নীল। আকাশের ছায়া সেখানে মিশে গেছে।

নদীর দু-পাড় থেকে জমিটা ধনুকের মতো বাঁক নিয়ে উঠে গেছে অনেক ওপরে। সেখানে গাছপালার ঘন জঙ্গল। দূরে তাকালে মনে হয় নদীর জল আর আকাশ যেন গায়ে-গায়ে মিশে গেছে। আর সেই অদ্ভুত মিলনকে আগলে রেখেছে দুপাশের উঁচু টিলা আর নিবিড় জঙ্গল।

অগভীর খাদের উপত্যকায় শান্তভাবে শুয়ে থাকা এই নদীটা আমাকে মুগ্ধ করে দিল।

খেয়াল করিনি প্রিয় কখন যেন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আলতো করে ধোঁয়া ছেড়ে ও হঠাৎই বলল, 'এই নদীটার অনেক মিস্ট্রি আছে।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম ঃ 'কী নাম এই নদীটার?'

'কোনও নাম নেই। পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এসে পটলই নদীর সঙ্গে মিশে গেছে।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'ওই লোকগুলোর সঙ্গে আপনার কী নিয়ে ঝগড়া হল?'

প্রিয় হাসল, বলল, 'ওটাও একটা মিস্ট্রি...।'

'মিস্ট্রি মানে?'

উত্তরে বড় একটা শ্বাস ফেলল প্রিয়বরণ। মাথায় গালে হাত বুলিয়ে সময় নিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ও দোটানায় পড়ে গেছে। ওর ভেতরটা বোধহয় ছটফট করছে।

আমি নদীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে প্রিয়র দিকে সরাসরি তাকালাম।

'আমাকে বলবেন না, কীসের মিস্ট্রি?'

প্রিয় চোখ নামিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর আড়চোখে—অনেকটা চোরের দৃষ্টিতে—তাকাল আমার দিকে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'সব কথা এখন বলা যাবে না।'

'কেন?'

'এখনও আদেশ পাইনি।'

'কার আদেশ?'

প্রিয়র মুখে অসহায় ছাপ ফুটে উঠল। আমাকে প্রাণ খুলে সবকিছু বলার জন্যে ও ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছে। আবার একইসঙ্গে কোনও একটা নিয়মের বাধা ওকে ভয় দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিয়বরণ আমার চোখের দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

না, এ প্রিয়বরণকে আমি চিনি না।

ওর দু-চোখ শান্ত সমাহিত। যেন এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে রয়েছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখছে, অথচ দেখছে না। আমাকে ভেদ করে ওর দৃষ্টি যেন পৌঁছে যাচ্ছে কোন অনন্তে।

প্রিয়বরণ বলল, 'যাকে আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তার আদেশ।'

এ-কথা শোনামাত্রই আমার ভেতরটা শিউরে উঠল। একটা চিনচিনে ঠান্ডা অনুভূতি কোথা থেকে যেন তৈরি হয়ে শরীরের প্রতিটি শিরা এবং ধমনি বেয়ে পাগল-পারা গতিবেগে ছুটে বেড়াতে লাগল।

আমি মন্ত্রবলে স্থির হয়ে যাওয়া এক মূর্তির মতো ফ্যালফ্যাল করে প্রিয়বরণকে দেখতে লাগলাম। অথচ একইসঙ্গে জঙ্গলের গাছপালা, নদীর জলের আয়না, আর খুনসুটি করা বাতাস আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পাচ্ছিলাম।

কতক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎই আমার মাথাটা টলে উঠল, আমি কাত হয়ে পড়ে যেতে লাগলাম।

পুরো ব্যাপারটা আমি স্লো মোশান ছবির মতো দেখতে পেলাম।

আমি পড়ছি তো পড়ছিই। বাতাসে ভেসে বেড়ানো তুলোর মতো ধীরে, অতি ধীরে, আমার ভারহীন শরীরটা একটু-একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে মাটির দিকে। নাকি মাটিটাই এগিয়ে আসছে আমার দিকে?

একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রিয়বরণ আমাকে ধরে ফেলল। 'ম্যাডাম! ম্যাডাম!' বলে কয়েকবার ডাকল।

আমি যেন ঘুমের ঘোরের ভেতরে বহু দূর থেকে ওর ডাক শুনতে পেলাম। আমার চোখ বুজে এল। চোখের সামনে এক অলৌকিক অন্ধকার—আর তার মাঝে অসংখ্য হলুদ তারা ঝিলিক মারছে।

একটু পরে যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখি আমি একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছি, আর প্রিয়বরণ হাঁটুগেড়ে বসে আমার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। ওর বাঁ-হাতে একটা জলের বোতল।

আমাকে চোখ খুলতে দেখেই ও একগাল হেসে ফেলল। এত স্বচ্ছ আর পরিষ্কার হাসি যে, অন্যকেও খুশি করে দেয়।

প্রিয় বলল, 'বাব্বাঃ, বাঁচালেন! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—।'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, 'ভয় আমিও পেয়েছি', কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।

প্রিয়র সেই মারাত্মক কথাটা আমার মাথার ভেতরে পেন্ডুলাম ঘড়ির ঘণ্টার মতো মন্দ্রস্বরে বাজছিল ঃ 'যাকে আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তার আদেশ...যাকে আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তার আদেশ...যাকে আপনি খুঁজে...।'

প্রিয়বরণ কি জানে, কাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি!

আমি উঠে দাঁড়ালাম। প্রিয় একেবারে আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করছেন, কী করছেন!' তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরতে গেল।

আমি হাতের ইশারায় ওকে নিশ্চিন্ত করলাম ঃ 'উঁহু, আমি ঠিক আছি। হঠাৎ মাথাটা কেমন পাক দিয়ে উঠেছিল...।'

প্রিয় জলের বোতলের ছিপি আটকে চলে গেল বাইকের কাছে। বাইকের ডিকিতে বোতলটা রেখে ফিরে এল। নিচু গলায় বলল, 'আপনাকে কয়েকটা কথা বলব বলে এখানে ডেকে এনেছি। কিন্তু আপনার শরীরের যা অবস্থা...।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'না, আপনি বলুন।'

প্রিয়বরণ কেমন যেন আবেশ মাখানো মুগ্ধ চোখে দেখছিল আমাকে। ওইভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ও বলল, 'কোনও-কোনও মানুষ এমন আছে যাদের কাছাকাছি এলে সবকিছু খুলে বলতে ইচ্ছে করে...সমস্ত অন্যায় আর পাপের কথা স্বীকার করে মন হালকা করতে ইচ্ছে করে...ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে।' চোখ নামিয়ে নিল প্রিয়বরণ। তারপর আলতো গলায় বলল, 'আপনি সেইরকম।'

আমি অবাক চোখে ওকে দেখতে লাগলাম।

ওর সরল নিষ্পাপ মুখের আড়ালে যে কোনও পাপ আছে, অন্যায় আছে, সেটা কিছুতেই ভাবতে পারছিলাম না।

কোন পাপের কথা বলছে ও?

বিকেল পড়ে আসছিল। গাছগাছালির ছায়া লম্বা হয়ে নদীর জল ছুঁয়ে ফেলেছে। চারিদিক এত শান্ত এত সুন্দর যে, মন জুড়িয়ে গিয়ে ঘুমের ঘোর লাগে। প্রিয়বরণ ছেলেটাও যেন সেই প্রকৃতিরই একটা অংশ—গাছের মতো, কিংবা নদীর

জলের মতো। ওর দিকে তাকিয়ে সেই পুরোনো মায়াটা ভেসে উঠল আমার মনে। কিন্তু বাপির কাছে আমার যে-ঋণ, তা তো শোধ করতেই হবে।

'বলুন, আমি শুনছি।'

আমার শক্ত গলা প্রিয়বরণকে চমকে দিল। ও চটপট বলে উঠল, 'হ্যাঁ বলছি। ম্যাডাম, আমি অপদেবতার পুজো করি—।'

সঙ্গে-সঙ্গে কোন এক ম্যাজিকে প্রকৃতি রুদ্র হয়ে উঠল। বাঁধন-ছেঁড়া চিতাবাঘের মতো বাতাস হিংস্র হয়ে উঠল। ঝোড়ো হাওয়া ফুঁসে উঠল পলকে। পাহাড়-জঙ্গলের কোন অজানা উৎস থেকে তৈরি হয়ে বাতাসের দল গেল নদীর দিকে। শান্ত স্থির নদীর জলে অসংখ্য শিরা জেগে উঠল। তিরতির করে কাঁপতে-কাঁপতে সেগুলো ছুটে চলল দূরে, আরও দূরে।

আমার ঢোলা কামিজ, প্রিয়বরণের জামার হাতা, পতাকার মতো শব্দ করে উড়ছিল, ঝাপট মারছিল। মনে হচ্ছিল, নদী নয়, আমরা দুজনে পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রিয়বরণ ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'ঝড় উঠেছে। শিগগির চলুন, আমরা ফিরে যাই।'

আমি বললাম, 'এই ঝড়ের মধ্যে কোথায় যাবেন! চলুন, ওই গাছগুলোর আড়ালে দাঁড়াই—।'

সামনেই কয়েকটা গাছ প্রায় 'হাত-ধরাধরি' করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি প্রিয়র হাত ধরে টেনে নিয়ে চললাম সেদিকে।

ঠিক তখনই শিসের শব্দটা আমি শুনতে পেলাম।

শিস তো নয়, যেন মরণের ডাক! আমি ভয়ে প্রিয়বরণের হাত আঁকড়ে ধরলাম।

হাওয়া প্রবল বেগে ছুটলেও ধুলো উড়ছিল না। কাঁকরের কণা ছিটকে এসে গায়ে লাগছিল। আর গাছের মাথাগুলো পাগলের মতো এপাশ-ওপাশ নড়ছিল।

আমি চাপা গলায় বলে উঠলাম, 'কোথা থেকে এই শিসের শব্দ আসছে?'

প্রিয় বলল, 'আমাদের দেবতার ডাক...।'

আমি অবাক হয়ে প্রিয়র মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ও কেমন এক অদ্ভুত চোখে নদীটার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি কিছু একটা বলতে গেলাম, কিন্তু প্রথম শব্দের টুকরোটা বেরোনোমাত্রই প্রিয় আমার দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করে বলল, 'চুপ।'

আর ঠিক তখনই শীতকাল নেমে এল। হু-হু করে ছুটে চলা বাতাসের উষ্ণতা কমতে লাগল। ঠান্ডায় আমার গায়ে কাঁটা দিল।

প্রিয়বরণ হঠাৎই আঙুল তুলে দেখাল নদীটার দিকে ঃ ‘ওই দেখুন—।’

আমি ওর কথায় সেদিকে চোখ ফেরাতেই বরফ হয়ে গেলাম। শীতটা আচমকা যেন বেড়ে গেল। এ কোন নদীর দিকে আমি তাকিয়ে আছি!

নদীটায় জেগে উঠেছে এক বিশাল ঢেউ। কিন্তু সে-ঢেউ সাধারণ ঢেউয়ের মতো নয়। নদীর দৈর্ঘ্যে বরাবর লম্বালম্বিভাবে ঢেউটা এগিয়ে চলেছে—দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, নদীটা একটা বিশাল লম্বা চাদর। সেই চাদরটা দু-প্রান্তে দুজন ধরে যেন ওপর-নীচে ধীরে-ধীরে নাড়াচ্ছে, আর সেই দোলানিতে তৈরি হয়ে গেছে এই অলৌকিক ঢেউ—ঢেউটা নদীর পথ বেয়ে খুব ধীরে এগিয়ে চলেছে।

সূর্যের আলো তখনও ছিল। কিন্তু এই নির্জন পরিবেশে ঝোড়ো হিমবাতাসে সে-আলো আমাকে তেমন ভরসা জোগাচ্ছিল না। তার ওপর সেই নেশা-ধরানো শিসের শব্দ।

আলো পড়ে ঢেউয়ের উঁচু চুড়োগুলো চকচক করছিল। তা থেকে ছিটকে পড়ছিল জলকণা। দূর থেকে এই অলৌকিক দৃশ্যটা অপূর্ব দেখাচ্ছিল। মুগ্ধ ভয়ে আমি নদীর ঢেউটাকে দেখতে লাগলাম। যাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি এই কি তার চেহারা?

প্রিয়বরণ হঠাৎই হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। চোখ বুজে হাতজোড় করে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র পড়তে লাগল।

আমি ঠান্ডায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। শরীরটা অসাড় কাঠের টুকরো। মন যা অনুভব করছিল চেতনা সেটা ব্যাখ্যা করতে পারছিল না কিছুতেই।

প্রিয় আচমকা ওর মন্ত্র পড়া থামিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। খপ করে আমার হাত চেপে ধরে রুক্ষভাবে টান মারল ঃ ‘চলুন—।’

‘কোথায়?’

‘ওই নদীর কাছে। আপনার তো অনেক কৌতূহল—তার কিছু অন্তত মিটবে।’

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। আর প্রিয় যখন হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল তখন কোনও প্রতিবাদও করতে পারলাম না। শুধু শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল। আর মুখ দিয়ে চাপা গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে আসছিল।

ও আমার হাত ধরে টিলার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

নুড়ি-কাঁকরে আমার পা পিছলে যেতে চাইছিল, কিন্তু প্রিয় আমাকে সামলে নিচ্ছিল বারবার। আমার নাকে-মুখে চুল উড়ে এসে দৃষ্টি আড়াল হচ্ছিল। হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর শিসের শব্দটা সবকিছু যেন চিরে দিচ্ছিল ধারালো ফলায়।

নদীর ঠিক পাশটিতে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন আমি শীতে অথবা ভয়ে

ঠকঠক করে কাঁপছি। সূর্য হেলে গিয়ে মরা আলো এখন শুধু গাছের মাথায়। শনশন বাতাসে ওরা প্রবলভাবে মাথা নাড়ছে—যেন সূর্যকে বলতে চাইছে, না, যেয়ো না।

নদীর ফুঁসে ওঠা জলের চুড়ো আমাদের মাথা ছাড়িয়ে আরও অনেকটা উঁচুতে। এখন আলোর তেজ কমে যাওয়ায় লক্ষ করলাম, নদীর জলে এক বিচিত্র সবুজ আভা। জলের ভেতরে সেই আভা যেন নড়চড়ে বেড়াচ্ছে।

আমরা নদীটার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। তাই জলের কণা ছিটকে আসছিল আমাদের গায়ে। আর গায়ে এসে পড়তেই আমার ভুল ভাঙল ঃ ওগুলো জলের কণা নয়, বরফের কুচি।

আমি আরও একবার শিউরে উঠলাম। মনে হচ্ছিল, এই বোধহয় আমি টলে পড়ে গিয়ে অতলে হারিয়ে যাব—অনেকটা ময়না সরেনের মতো। ঝিম-ধরা অবশ চেতনা নিয়ে আমি চঞ্চল সবুজ জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রিয়বরণ তখন হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে নদীর পাড়ে। সামনে ঝুঁকে পড়ে দু-হাতে মাটি চাপড়াচ্ছে আর দুর্বোধ্য ভাষায় কীসব বলছে।

আমাদের সাক্ষী রেখে নদীর জল ঢেউ খেলিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। মনে হল, জলের আড়ালে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে কেউ যেন এগিয়ে চলেছে।

কিছুক্ষণ পর সেই ঢেউ স্তিমিত হয়ে গেল। জলের আলোড়ন কমতে-কমতে একেবারে স্থির হয়ে গেল। একইসঙ্গে তাল মিলিয়ে বাতাসের তেজ কমে এল, শীতটাও গেল চলে। শিসের শব্দটাও যে কখন হারিয়ে গেছে খেয়ালই করিনি।

প্রিয়বরণ উঠে দাঁড়াল। নদীর দূর রেখার দিকে তাকিয়ে কাকে যেন প্রণাম করল।

আমার গায়ে লেপটে থাকা বরফের কুচিগুলো গলে জল হয়ে যাচ্ছিল। আমি কাঁপা হাতে সেগুলো ঝেড়ে ফেলতে লাগলাম। লক্ষ করলাম, আমার পোশাকের অনেক জায়গায় ভিজে ছোপ।

প্রিয় বলল, 'চলুন, ফিরে যাই—।'

আমার ঘোর তখনও পুরোপুরি কাটেনি। ওকে জিগ্যেস করলাম, 'এসব... এসব কী দেখলাম।'

'যা দেখলেন তাই। এখানে মাঝে-মাঝে তার দেখা পাওয়া যায়। আজ যে দেখা পাব ভাবিনি। বোধহয় আপনাকে কিছু দেখাতে চাইছিল...তাই দেখাল।'

আমি টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। আমার পা কাঁপছিল। তাই দেখে আমার হাত ধরে প্রিয়বরণ পাশাপাশি উঠতে লাগল।

আমি আতঙ্কের গলায় জিগ্যেস করলাম, 'হঠাৎ শীত পড়ল কেন, ঝড় উঠল কেন? ওই শিসের শব্দটাই বা কীসের?'

'এত প্রশ্ন করেন আপনি...।' হাসল প্রিয়বরণ ঃ 'তাই সে নিজে এসে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল। শিসের শব্দটা তো একটু আগেই আপনাকে বললাম। বাকি রইল শীত আর ঝড়...।' একটু চুপ করে থেকে ও বলল, 'শীত আর ঝড় সে ভালোবাসে। প্রকৃতি বেশিরভাগ সময়েই তার কথা শোনে।'

কথাবার্তায় প্রিয় বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেও আমি পারিনি।

কী করে পারব! ভয়টা যে কিছুতেই যেতে চাইছিল না। কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যাচ্ছিল বারবার।

'আমি বাড়ি যাব।' কেমন যেন কাঠ-কাঠ শোনাল আমার কথাটা।

'হ্যাঁ—চলুন।'

আমরা টিলার ওপরে উঠে এলাম। বাইকের দিকে এগোতে-এগোতে প্রিয় বলল, 'বাইকে ঠিকমতো বসবেন। পড়ে যাবেন না যেন।'

আমি ঘোর-লাগা গলায় মিনমিন করে বললাম, 'আমাকে সব কথা বলতে পারেন না?'

প্রিয় থমকে ঘুরে তাকাল আমার দিকে, বলল, 'এখনও যে আদেশ পাইনি। তবে সে নিজে দেখালে আমাদের কিছু করার নেই—আজ তো দেখলেন। আস্তে-আস্তে সব জানতে পারবেন...তা ছাড়া, এখন আপনার শরীর ভালো নেই।'

সন্ধের ছায়া নামতে শুরু করেছিল। পাখিদের কিচিরমিচির শুনতে পেয়ে হঠাৎই যেন মনে পড়ল, এতক্ষণ ওদের ডাকাডাকি শুনতে পাইনি। তা হলে কি ওই শিসের শব্দ শুনতে পাওয়ামাত্রই পাখিরা ডাকাডাকি বন্ধ করে দিয়েছিল?

প্রিয়বরণ বাইক স্টার্ট করতেই মনে পড়ে গেল মিহিরদা আর ঝিমলির কথা। ওঃ, কতক্ষণ ওদের দেখিনি!

একইসঙ্গে মনে হল, আজ প্রিয়বরণ আমার সঙ্গে না থাকলে আর কি হোটেলে ফেরা হত? মিহিরদা আর ঝিমলিকে আর কখনও কি দেখতে পেতাম?

বাপির কথা মনে পড়ে গেল আমার। বাপির চেয়ে আমার ভাগ্যের জোর বোধহয় একটু বেশি।

॥ কুড়ি ॥

রাতে আমার জ্বর এসে গিয়েছিল। যত না জ্বর তারচেয়ে বেশি ছিল ঠকঠক করে কাঁপুনি।

প্রিয়বরণ যখন আমাকে 'পথিক'-এর সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল তখনও আমি স্বাভাবিক হতে পারিনি। কেমন এক অজানা ভয়ে শরীরটা কাঠ হয়ে রয়েছে। হাত-পা বেশ কষ্ট করে নাড়াতে হচ্ছে। মনটাও কেমন যেন সিঁটিয়ে আছে। আর সেই অবস্থাতেই আমি ছড়-টানা বেহালার তারের মতো কেঁপে চলেছি।

'পথিক'-এর বাইরে টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলছিল। সেই আলোয় দুটো ছায়াময় মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল ঃ মিহিরদা আর ঝিমলি।

প্রিয়বরণ বাইক থামাতেই আমি নেমে পড়লাম। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম।

প্রিয় বাঁ-হাতে খপ করে আমার হাতের ডানা চেপে ধরল। চাপা গলায় বলল, 'সাবধান!'

'অন্তরা!' বলে ডেকে উঠল ঝিমলি। ছুটে চলে আসতে চাইল আমার কাছে।

প্রিয় বাইক থেকে নেমে আমার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। ঝিমলিকে আমার কাছে এগিয়ে আসতে দেখেই ও প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আজ আপনি যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, সব শুধু আপনার জন্যে। কাউকে একটি কথাও বলবেন না। শুধু জানবেন, আমি আপনার সঙ্গে আছি। আমি থাকতে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।'

ঝিমলি কাছে চলে আসছিল অথচ প্রিয়বরণের কথা শেষ হয়নি। আমার মধ্যে কী যে হল, ঝিমলির দিকে হাত বাড়িয়ে আমি হাতের পাঞ্জা মেলে ধরলাম, বললাম, 'ঝিমলি, প্লিজ...আমরা একটু কথা শেষ করে নিই...।'

ঝিমলি মাঝপথেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। লক্ষ করলাম, আমার কাণ্ড দেখে প্রিয়বরণও বেশ অবাক হয়ে গেছে।

আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে প্রিয় চাপা গলায় 'থ্যাংক য়ু' বলল আমাকে। তারপর বাইকে উঠে পায়ের হ্যাঁচকায় বাইক স্টার্ট করে বলল, 'ভালো থাকবেন। আবার দেখা হবে।'

তারপরই ভটভট শব্দ তুলে ওর বাইক উড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি খুব সাবধানে পা ফেলে ঝিমলির দিকে এগোলাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝিমলি ছুটে এসে একেবারে জাপটে ধরল আমাকে।

'তুই কোথায় গিয়েছিলি? কোথায় ছিলি এতক্ষণ?' কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল ঝিমলি ঃ 'আমি আর মিহিরদা তোর জন্যে চিন্তায় মরে যাচ্ছি...।'

আমি মিহিরদার দিকে তাকালাম। ওঁর চশমার কাচে আলো পড়ে চকচক করছে। অথচ আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওই চকচকে কাচের আড়ালে দুটো স্নেহ-মাখা চোখ অলৌকিক মমতায় আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওঁকে 'দাদা' বলে ডাকি

বটে, কিন্তু আসলে মিহিরদা বোধহয় 'বাপি'-র মতন।

হাসপাতাল থেকে সদ্য-ফেরা অপারেশানের রুগির মতো ঝিমলি আমাকে দু-হাতে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল মিহিরদার দিকে।

মিহিরদা আর পারলেন না। তাড়াতাড়ি পায়ে এগিয়ে এলেন আমার কাছে। জিগ্যেস করলেন, 'অন্তরা, তোমার কিছু হয়নি তো! তুমি..তুমি...।'

আমি মিহিরদার দিকে তাকিয়ে কোনওরকমে একচিলতে হাসলাম, বললাম, 'না, কিছু হয়নি। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে....।'

আমাকে হোটেলের ঘরে নিয়ে এসে ঝিমলি আর মিহিরদা একরকম নার্সিংহোমের পরিচর্যা শুরু করে দিলেন। কিন্তু তাতে ওঁদের খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে না। কারণ, তখনও আমার শরীরটা তিরতির করে কাঁপছিল। কিছুতেই কাঁপুনিটাকে আমি থামাতে পারছিলাম না।

মিহিরদা রোজ রাতে হালকা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন। সেই ট্যাবলেট একটা খাইয়ে দিলেন আমাকে।

ঝিমলি বারবার জিগ্যেস করছিল, 'কী হয়েছে, অন্তরা? কী হয়েছে?'

মিহিরদা ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন কোনও কথা জিগ্যেস করার দরকার নেই, ঝিমলি। ওর শরীর ভালো নেই। মনে হচ্ছে, একটু জ্বরও এসেছে। অন্তরাকে এখন ঘুমোতে দাও—কাল সকালে কথা হবে।'

আমি একটা ঘোরের মধ্যে মিহিরদা আর অন্তরার মুখ দুটো দেখছিলাম। দুটো মুখের চেহারা একইরকম ঃ দুশ্চিন্তায় আকুল।

আমি কাঁপা গলায় মিনমিন করে বললাম, 'আজ অনেক কিছু দেখেছি—জেনেছি। কিন্তু কাউকে বলা বারণ। আজ আপনাদের তো মলিনের বাড়ি যাওয়ার কথা। সেখানে হয়তো আরও কিছু জানতে পারবেন—।'

মিহিরদা মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না, না—তোমাকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি বরং খবর দিয়ে আসছি—কাল যাব।'

আমার ওজর-আপত্তি ওঁদের কাছে টিকল না। আমরা সবাই হোটেলেই থেকে গেলাম।

রাতে মিহিরদা একবার বেরোলেন কয়েকটা ফোন করার জন্যে। আমি অবশ্য আগেই মিহিরদাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম ঃ আমার জ্বরের কথা মাকে যেন না বলেন। তারপর একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ডুবে গেলাম আমি। যখন ডুব দিয়ে উঠলাম তখন পাখির ডাক কানে এল। বুঝলাম, ভোর হয়ে গেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই টের পেলাম, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। ঝিমলির দিকে তাকিয়ে দেখি ও ছুটন্ত মানুষের ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে।

ঠোঁটজোড়া সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

আমি পায়ে-পায়ে ছোট্ট জানলাটার কাছে গেলাম।

ভোরের আলো, চঞ্চল গাছের পাতা আর পাখির ডাক আমাকে গুণ করল। মনে হল, কাল বিকেলের ওই ভয়ংকর ঘটনাগুলো যেমন সত্যি, আজ ভোরের এই মনোরম ঘটনাগুলোও তেমনই সত্যি।

এই সত্যি দিয়েই গতকালের সত্যিকে আমাদের জয় করতে হবে। আলো দিয়ে গোহারান হারাতে হবে অন্ধকারকে।

বিকেলে মলিনদের বাড়ি গেলাম।

ভাগ্য ভালো যে, এবারে কোনও চিৎকার শুনতে পেলাম না।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে রসময় সামন্ত বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়েই একগাল হেসে এগিয়ে এলেন।

মিহিরদা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন। আমি আর ঝিমলি নামতে-নামতেই শুনলাম রসময় মিহিরদাকে বলছেন, 'কাল বিকেলে আপনারা এলেন না—ভাবলাম বুঝি আর আসতে পারবেন না—কলকাতায় ফিরে গেছেন।'

মিহিরদা অল্প হেসে বললেন, 'না, না—তা নয়। কাল একটু অন্য কাজে আটকে গিয়েছিলাম...।'

রসময় আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই বললেন, 'দিদিভাইয়ের কি শরীর খারাপ নাকি?'

আমি হাত নেড়ে বললাম, 'না—ও কিছু নয়। মলিন কেমন আছে?'

'ওই...যেমন থাকে আর কী। মাঝে-মাঝেই আপনমনে কীসব বকবক করে। কোনও মাথামুন্ডু নেই...সবই আমাদের কপাল।'

হঠাৎই রসময়ের খেয়াল হল যে, আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি। চারপাশে লোকের ভিড় জমে গেছে। আমাদের টাটা সুমো দেখে আশপাশের ঘর থেকে বাচ্চাকাচ্চারা বেরিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে ঘোমটা টানা মহিলা এবং কৌতূহলী পুরুষও আছে।

রসময় 'আসুন, আসুন—' বলে আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। ভাবটা এমন, যেন আমরা পাত্রপক্ষের লোক—রসময় সামন্তের মেয়েকে 'দেখতে' এসেছি।

রসময় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা না হলেও মলিনের দায়টা ওঁর কাছে কিছু কম নয়। মনে হচ্ছিল, মলিনকে সারিয়ে তোলার ব্যাপারে তিনি আমাদের ওপরে

ম্যাগেরবাদনের ঘরটাতেই বসলাম। ঘরে হালকা ধূপের
গণে রাখা ঠাকুরের ফটোগুলোর সামনে দুটো ধূপ
আমাদের বসিয়ে ভেতরের ঘুরে ঢুকে গেলেন—বে

নই মলিন ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। আমাদের দিকে
লল, 'বাব্বাঃ, কত জল! চারপাশটিতে শুধু নীল
 সাঁতার কাটছি আর কাটছি। সাঁতার কাটছি আর
 বলে মলিন চোখ বুজে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে হা
াগল।

তিনজনে অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগলাম।

 অবাক হওয়ার কারণ ছিল। মলিন চোখ বুজে ব
 ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু কখনও কোনও কিছুর স
া মানুষের মতো দিব্যি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

মলিকে ছোট্ট করে ঠেলা মেরে বললাম, 'অ্যামে
আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেকিয়ে বলল, 'ছাড় তো
াব দেখছে।'

 ঝিমলির কথা শুনতে পেয়ে আমাদের দিকে ফি
 বলে মনে হয় না। মিডিয়াতে এক্সপোজার পাবে ব
ল অভিনয় করছে এটা ভাবা যায় না।'

ায় রসময় এসে ঘরে ঢুকলেন। অবাক হয়ে দেখলাম
দিকে একপলকও তাকালেন না। সোজা গিয়ে তক্তপে
খি।

 রসময়কে সিগারেট অফার করলেন, নিজেও ধরা
লেন। তারপর মলিনের দিকে ইশারা করে রসময়
শ্ন করলেন ঃ 'ব্যাপারটা কী?'

খন মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে মেঝের দিকে—তেড়ে আ
কে। সেই অবস্থাতেই হাত নাড়ছে মলিন। আর মু

ামন্ত হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আঙুলের রুপো
চুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর আক্ষেপের একটা শব্দ
করছে। ওকে কিছু বলতে গেলেই চিৎকার, চেঁচামে

এভাবে আমরা আর পারছি না।'

মিহিরদা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, ও কি সাঁতার জানে?'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে রসময় বললেন, 'সেটাই তো আশ্চর্য।'

'কী আশ্চর্য?'

'মলিন কখনও সাঁতার শেখেনি—কিন্তু ও সাঁতার জানে।'

এ-কথা শুনেই আমার আর ঝিমলির তো অবস্থা খারাপ। আর মিহিরদার দিকে তাকিয়ে দেখি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার পরেও মুখটা সামান্য ফাঁক করে রেখেছেন। এবং হতবুদ্ধি নজরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন রসময় সামন্তের দিকে।

রসময় বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লেন ঃ 'আর কী শোনাব বলুন তো আপনাদের? এসব পিকিউলিয়ার কাণ্ড চলছে আমার ঘরে। মাথা নেই, মুন্ডু নেই...আমরা এভাবে সত্যি আর পারছি না।'

মিহিরদা মলিনকে ডাকলেন, 'মলিন, শোনো—।'

ছেলেটা মাথা ঝুঁকিয়ে ওই একই ভঙ্গিতে মিহিরদার কাছে এল।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও—তাকাও আমার দিকে।'

মলিন আচমকা ওর ছোট্ট শরীরটাকে সোজা করল। তারপর তাকাল মিহিরদার চোখের দিকে।

আমি মিহিরদার ঠিক পাশেই বসেছিলাম। তাই মলিনের সেই দৃষ্টি আমিও দেখতে পেলাম।

মলিনের চোখের তারা দুটো যেন ছোট্ট দুটো হিরের কুচি—কালো জমির পটভূমিতে ধকধক করে জ্বলছে। এ-দৃষ্টি শুধু যে অন্তর্ভেদী তা নয়—বরং দৃষ্টিটা যেন মিহিরদার শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে—শক্তিশালী এক্স-রে যেমন যায়।

মলিনের চোখের তীব্র নজরে একটা কর্তৃত্বের ভঙ্গি ছিল। তা ছাড়া, সেই নজর যেন নিঃশব্দে বলতে চাইছিল, 'আমি অনেক কিছু জানি।'

এমন সময় সবিতা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

ঝিমলি বলে উঠল, 'এসব ফরম্যালিটির কী দরকার ছিল...।'

সবিতা অল্প হেসে ঝিমলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুধু চা...আর কিছু নেই...।'

সবাইকে চা দেওয়ার সময় সবিতা তেরছা চোখে মলিনকে লক্ষ করছিলেন। চা দিয়ে আপ্যায়নের ব্যাপারটা মিটে গেলে চাপা গলায় মলিনকে ডাকলেন তিনি ঃ 'ও-ঘরে চ'। পড়বি চ'।'

মলিন মায়ের দিকে ফিরেও তাকাল না। অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সোজা

চেয়ে রইল মিহিরদার দিকে।

রসময় স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি যাও—ও একটু পরে যাচ্ছে।'

বাইরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছিল। কোথা থেকে যেন একটা রোদের ফলা ঘরের ভেতরে এসে পড়েছিল। সেটা ক্রমশ সরে যাচ্ছিল। আর একইসঙ্গে সেটার উজ্জ্বল রং ফিকে হচ্ছিল।

বাইরে থেকে বিকেলের বাতাস মাঝে-মাঝেই হানা দিচ্ছিল ঘরে। দরজার বাইরে দড়িতে টাঙানো সবিতার একটা সবুজ রঙের শাড়ি সেই বাতাসের দমকে নাচের ভঙ্গিতে উড়ছিল।

সবিতা চলে যেতেই মিহিরদা মলিনকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি সাঁতার জানো?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'তুমি সাঁতার কোথায় শিখেছ?'

'শিখিনি। জন্ম থেকেই সাঁতার জানি।'

মলিনের কথাটা আমাদের অবাক করে দিল।

মিহিরদা ওর দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলেন। সেই অবস্থাতেই সিগারেটটা সামনে রাখা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলেন।

অনেকক্ষণ পর মিহিরদা মলিনকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি জন্ম থেকেই সাঁতার জানো? কেউ তোমাকে শেখায়নি?'

মাথা নাড়ল মলিন : 'না।'

হঠাৎই মিহিরদা ঝোলাব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা লকেট বের করলেন।

সেই লকেট, যেটা আমরা ময়না সরেনের নিখোঁজ হওয়ার জায়গায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

'এই লকেটটা চেনো?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'লকেটে এটা কীসের ছবি?'

মিহিরদা লকেটটা মলিনের চোখের সামনে ধরে ছিলেন। মলিন তীর বেঁধানো চোখে লকেটটার দিকে তাকিয়ে কয়েকবার ওর জিভের ডগাটা বের করল, ঢুকিয়ে নিল। মনে হল যেন লকেটটাকে ও জিভ ভ্যাংচাচ্ছে।

তারপর বড়-বড় শ্বাস টেনে বলল, 'লকেটের ছবিটা তাঁর। সবাইকে তিনি দেখা দেন না।'

'কে তিনি?' মিহিরদার যে রোখ চেপে যাচ্ছিল সেটা ওঁর প্রশ্নের তীব্রতায় বেশ বোঝা গেল।

'তিনি অন্ধকারের রাজা। রাজা নয়—সম্রাট। তিনি অলৌকিক—তাঁর লীলা অলৌকিক। তাঁকে সহজে দেখা যায় না।'

মিহিরদার কপালে ভাঁজ পড়ল। লকেটটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তারপর কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'মলিন, তিনি কি শিস দেন?'

'হ্যাঁ, দেন। কখনও শিস দেন রাগে। কখনও আনন্দে—।'

আমার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল। ঝনঝন শব্দে কাপটা চৌচির হয়ে চা ছিটকে গেল চারপাশে।

মিহিরদার চায়ের কাপ হাত ফসকে পড়ে না গেলেও লক্ষ করলাম, ওঁর শিরা ওঠা হাত বেশ কাঁপছে।

রসময় সামন্ত তক্তপোশ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আমাদের দিকে দু-পা এগিয়ে এসে আমতা-আমতা করে বললেন, 'মলিন এসব কী বলছে! আগে তো কখনও ওর মুখে এসব কথা শুনিনি।'

মিহিরদা চায়ের কাপটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন। ওঁর মুখের চেহারা দেখে মনে হল, কাপটা আর হাতে ধরে রাখতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। তা ছাড়া, একটা ভয় ওঁর বয়স্ক মুখে ছায়া ফেলেছে।

ওই শিস!

বাপির ডেডবডি নিতে এসে মিহিরদা এই শিসের শব্দ প্রথম শুনেছিলেন।

তারপর...তারপর আমরাও শুনেছি। কাল বিকেলে ওই শিসের শব্দ আমি একা শুনেছি।

এখন মলিনের কথায় বুঝতে পারছি, শিসের যে নানারকম ঢং আমরা শুনেছি তার মধ্যে সত্যিই ধরন ছিল দুটো ঃ রাগের ডাক আর আনন্দের ডাক। আর কাল বিকেলে ওই বিচিত্র নদীতে যে-শিসের শব্দ আমি শুনেছি তার মধ্যে একটা উৎফুল্ল ব্যাপার ছিল।

ওই শিসটা বোধহয় ছিল আনন্দের ডাক।

কাপ ভাঙার শব্দ সবিতাকে এ-ঘরে টেনে নিয়ে এল।

'কী হল?' বলে ঘরে ঢুকেই তিনি বুঝতে পারলেন কী হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলেন বাড়ির ভেতরে। বোধহয় ঘর মোছার ন্যাকড়া নিয়ে আসতে।

আমরা সবিতার দিকে দেখছিলাম বলে বাড়ির সদর দরজার দিকে মনোযোগ দিইনি। হঠাৎই সেদিক থেকে একটা গলা পেলাম।

'কী হল? মলিন আবার কী কাণ্ড করল?'

চেনা গলা। তাই চমকে মুখ ফেরাতেই দেখি বাইরের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে

প্রিয়বরণ সরকার। ঠোঁটে একচিলতে রহস্যময় হাসি।

প্রিয়বরণকে দেখেই মলিন হঠাৎ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল। ও ছুটে গিয়ে প্রিয়কে একেবারে জাপটে ধরল। তারপর প্রিয়র শরীরে নিজেকে একেবারে লেপটে দিয়ে শরীর ঘষতে লাগল। মনে হল, ওদের সম্পর্কটা এমন যে, শত চেষ্টাতেও ছিন্ন হওয়ার নয়।

মলিনের প্রতি প্রিয়র যে একটা টান আছে সেটা আমি আগের দিনই বুঝেছি। তবে সেই টানটা শুধুমাত্র স্নেহ-ভালোবাসার টান নয়—তারচেয়ে একটু যেন আলাদা। তা ছাড়া, একটু আগেই মলিন যেসব কথা বলছিল তার সঙ্গে প্রিয়র কথাবার্তার বেশ মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম আমি। ওদের কথাগুলো একের-পর-এক মনে পড়ছিল ঃ

'যাকে আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তার আদেশ।' প্রিয়বরণ।

'লকেটের ছবিটা তাঁর। সবাইকে তিনি দেখা দেন না।' মলিন।

'আমি অপদেবতার পুজো করি।' প্রিয়বরণ।

'তিনি অন্ধকারের রাজা। রাজা নয়—সম্রাট। তিনি অলৌকিক—তাঁর লীলা অলৌকিক। তাঁকে সহজে দেখা যায় না।' মলিন।

'আমাদের দেবতার ডাক।' প্রিয়বরণ।

'কখনও শিস দেন রাগে। কখনও আনন্দে—।' মলিন।

'শীত আর ঝড় সে ভালোবাসে। প্রকৃতি বেশিরভাগ সময়েই তার কথা শোনে।' প্রিয়বরণ।

কথাগুলো মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রিয়বরণের অপদেবতার একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ছবি তৈরি হতে চাইছিল আমার মনে। অথচ ছবিটাকে আমি যতই আঁকড়ে ধরতে চাইছিলাম, ততই ওটা যেন মায়াহরিণের মতো আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল।

মলিনের বয়স্ক মানুষের মতো পরিণত কথাবার্তা আমার কানে লেগেছিল। এখন মনে হচ্ছে, যেন ও নয়—ওর মুখ দিয়ে এতক্ষণ প্রিয়বরণ কথা বলেছে।

মিহিরদা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখার পর একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। লক্ষ করে দেখলাম, ওঁর হাত এখনও পুরোপুরি স্থির হয়নি।

সবিতা ঘর মোছার ন্যাকড়া নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। উবু হয়ে বসে কাপের ভাঙা টুকরোগুলো সরিয়ে নিলেন। ছিটকে পড়া চা যত্ন করে মেঝে থেকে মুছে নিলেন।

আমি বিব্রতভাবে বললাম, 'সরি, বউদি—হঠাৎ কাপটা কী করে যেন হাত থেকে...।'

সবিতা মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'না, না—তাতে কী আছে—।'

সবিতা চলে যাওয়ার পর মিহিরদা আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, 'অন্তরা, মলিনের সাঁতার জানার ব্যাপারটা কিন্তু আগের জন্মের ব্যাপার। জন্মান্তরের যে কয়েকটা কেস নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি তাতে কিন্তু "করেসপন্ডিং বিহেভিয়ার অ্যান্ড ট্রেইট্স" বলে একটা ব্যাপার আছে। রিসার্চাররা বলছেন, জাতিস্মর ছেলেমেয়েরা অনেক সময় এমন সব কাজ করে যেগুলো না শিখলে কিছুতেই পারা যায় না। যেমন ধরো, সাঁতার—না শিখলে সাঁতার কাটা অসম্ভব। বিহারের একটা ছেলে—ঝামুয়া—বয়েস পাঁচবছর—ওর কেসটা একটা ম্যাগাজিনে আমি পড়েছিলাম। নাইনটিন এইটি নাইনের কেস। সুরঞ্জনকে কেসটার কথা আমি বলেও ছিলাম। ঝামুয়া ওর মায়ের সেলাইকলে দিব্যি সেলাই করতে পারত। ভাবো তো—কী ফ্যানট্যাস্টিক!'

মিহিরদার কথা শুনে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে 'হুঁ' বলে মাথা নাড়লাম।

মলিনকে নিয়ে প্রিয় ঘরের ভেতরে ঢুকে এল। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জিগ্যেস করল, 'কেমন আছেন?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'ভালো—।'

'যাক—আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।' প্রিয় একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল। তারপর রসময় সামন্তের দিকে তাকিয়ে বেশ হালকা সুরে জিগ্যেস করল, 'কী, রসময়দা, মলিন আবার কী কাণ্ড করল?'

রসময় ব্যাজার মুখে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'ওর কাণ্ডের কী আর শেষ আছে! ওই...ডাঙায় সাঁতার কাটছিল—।'

এ-কথায় প্রিয়বরণ হো-হো করে হেসে উঠল। আর হাসতে-হাসতেই মলিনের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে চলল।

আমি প্রিয়বরণকে দেখছিলাম। ওর সহজ-সরল মুখের আড়ালে কোথায় যেন একটা শক্ত এবং জটিল মানুষের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই মানুষটা অপদেবতার পুজো করে। সেই অপদেবতা আবার অন্ধকারের সম্রাট।

ময়না সরেনকে যখন মাটির ফাটলের ভেতরে ফেলে দেওয়া হয় তখন কি তা হলে অপদেবতার পুজো চলছিল?

স্বর্ণভূষণ তরফদার আর তার দলবল যে অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে মশাল হাতে সুর করে মন্ত্র পড়তে-পড়তে ওই কুয়োর দিকে চলেছিল সেটাও অপদেবতার পুজোর জন্যে?

আর কাল বিকেলে মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে প্রিয়বরণ যে ঢেউখেলানো নদীর জলের দিকে গাঢ় চোখে তাকিয়ে হিজিবিজি মন্ত্র আওড়াচ্ছিল সেটাও কি অপদেবতার পুজো?

সেই অপদেবতা কি জলে থাকে? নাকি থাকে মাটির নীচে? তাকে নানান জায়গায় দেখা যায় কেমন করে? অপদেবতা কি তা হলে একজন নয়—কয়েকজন? না কি সে মাটির তলায় চলে বেড়ায়?

এইসব প্রশ্ন মনের ভেতরে তোলপাড় করছিল আর আমি অন্দরমহলের একটা ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তাই বলে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চিন্তাটা এক লহমার জন্যেও বন্ধ করিনি। কারণ, একটা অন্তহীন রাক্ষুসে জেদ মনের ভেতরে কাজ করছিল।

প্রিয়বরণ রসময় সামন্তের পাশে বসে পড়ল—মলিনকে নিজের পাশে বসাল। তারপর মিহিরদার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন, গাঙ্গুলিবাবু, মলিনের ব্যাপারে আর কী জানতে চান—।'

প্রিয়র 'গাঙ্গুলিবাবু' সম্বোধনের মধ্যে ছোট্ট একটা ব্যঙ্গের খোঁচা ছিল বলে মনে হল আমার।

মিহিরদা কিন্তু কিছু মনে করলেন না। অন্তত মিহিরদাকে দেখে কিছু বোঝা গেল না।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মিহিরদা প্রিয়বরণের চোখে সরাসরি তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'অপদেবতা, শিসের শব্দ, লকেটের ছবি—এসবের সঙ্গে জন্মান্তরের ব্যাপারটা মিশে গিয়ে সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ঠিক থই পাচ্ছি না। আপনার একটু হেল্প পেলে ভালো হত।'

মিহিরদার কথার মধ্যে একটা মজার সুর লুকিয়ে ছিল—শিকারি যেমন শিকারের জন্যে ফাঁদ পেতে মজা দ্যাখে। বিশেষ করে মিহিরদার শেষ কথাটায় সেই ফাঁদের ইশারা ছিল।

প্রিয়বরণ কিন্তু একটুও ঘাবড়ে গেল না। মুচকি হেসে মলিনের মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, 'সবকিছুর থই কি সবাই পায়? আর আমাকে হেল্প করতে বলছেন? কেন, ম্যাডাম—আমি কি আপনাদের হেল্প করছি না?'

শেষ কথাটা প্রিয়বরণ আমাকে লক্ষ করে বলেছে।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, করছেন—।'

আমার জবাব শুনে মিহিরদা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে একবার দেখলেন—কিছু বললেন না। তবে মনে হয় গতকাল বিকেলের কথাটা একবার ভাবলেন—যখন প্রিয়র সঙ্গে আমি একা বেরিয়েছিলাম।

আজ সকালে মিহিরদা আর ঝিমলি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছে। কিন্তু আমি ঠিকঠাক জবাব দিতে পারিনি। শুধু একই কথা বারবার বলেছি, 'জেনেছি অনেক কিছু—কিন্তু কাউকে বলা বারণ।'

মিহিরদা শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে বলেছেন, 'যদি তুমি সব খুলে না বলো, তা হলে সুরঞ্জনের মিস্ট্রি আমরা সলভ্ করব কী করে?'

আমি মিহিরদার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু আমার মনের অবস্থাটা মিহিরদাকে বোঝাতে পারছিলাম না।

শুধু বললাম, 'আমাকে একটু সময় দিন, মিহিরদা—প্লিজ...।'

মলিনকে আমরা আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। তবে রসময় সামন্ত আপনমনে অনেক কথাই বলে চললেন।

রাতে মলিনকে চোখে-চোখে রাখতে হয়। নইলে মাঝে-মাঝেই ও কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। তারপর ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক পর সারা গায়ে জল, মাটি, কাদা মেখে ফিরে আসে। তখন কিছু জিগ্যেস করলেই বলে, 'কী করব! ডাক এসেছিল যে!'

প্রথম-প্রথম রসময়রা এ নিয়ে হইচই করতেন, কান্নাকাটি করতেন, ওকে তুমুল খোঁজাখুঁজি করতেন—কিন্তু পরের দিকে ওঁরা ব্যাপারটার সঙ্গে মানিয়ে নেন। মলিনকে শত প্রশ্ন করেও ওঁরা নতুন কোনও উত্তর পাননি।

প্রিয়বরণ আর কথা বলছিল না। চুপচাপ বসে রসময়ের কথা শুনছিল।

আমরাও শুনছিলাম। তবে মিহিরদা শুনছিলেন আর একটা প্যাড হাতে নিয়ে তাতে কীসব নোট করছিলেন।

কথাবার্তা শেষ করে আমরা যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। প্রিয়বরণ আমাদের টাটা সুমো পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার ছল করে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এল। ছল বলছি এই কারণে যে, ও আমার পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল।

মিহিরদা ঝিমলিকে জন্মান্তর ব্যাপারটা নিয়ে নানান কথা বলছিলেন। সেইসব কথার টুকরো মাঝে-মধ্যে আমার কানে ছিটকে আসছিল।

আমার পাশে হাঁটতে-হাঁটতে প্রিয় বলল, 'মলিনকে নিয়ে আমি খুব প্রবলেমে পড়েছি—।'

'কেন?'

'ওর ব্যাপারে আমার ওপর দায়িত্ব অনেক। কিন্তু আমাদের...আমাদের...।' প্রিয় হঠাৎই চুপ করে গেল।

আমি ওকে উৎসাহ দিতে প্রশ্ন করলাম, 'কী হল? থেমে গেলেন কেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রিয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি...আপনাকে আমার সবকিছু খুলে বলতে ইচ্ছে করে...সমস্ত পাপ আর অন্যায় স্বীকার করতে ইচ্ছে করে। অথচ...উঃ...কী যে দোটানায় পড়েছি।' ফোঁস করে শ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল প্রিয়। একটু থেমে তারপর বলল, 'খুব মুশকিল।

কিছু একটা করতে হবে। দেখি—।'

ততক্ষণে আমরা গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি।

প্রিয়বরণ 'আসি' বলে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। মিহিরদা আর ঝিমলিকে একবার দেখল। তারপর একরকম মরিয়া হয়েই আমাকে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার আরও কিছু কথা আছে। কাল আপনার সঙ্গে দেখা করব। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা শেষ হওয়া দরকার...।'

কথা শেষ করে আচমকা 'অ্যাবাউট টার্ন' করে চলে গেল প্রিয়বরণ। আমরা তিনজনেই একটু অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

॥ একুশ ॥

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের টাটা সুমো কাঁচা সড়ক থেকে মেটাল রোডে উঠে এল। আর ঠিক তখনই মিহিরদা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন, 'অন্তরা, আমার মনে হয়, অন্য জন্ম থেকে মলিনের ডাক আসছে। তাই ছেলেটা দু-জন্মের টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে—।'

এ-কথায় আমি আর ঝিমলি চমকে মিহিরদার দিকে তাকালাম।

মিহিরদা সিগারেট খাচ্ছিলেন। পেছনের সিট থেকে আমি তেরছাভাবে ওঁর মুখের দিকে দেখলাম। সাদা জুলপি, গাঢ় খয়েরি চশমার ডাঁটি, তার সামান্য নীচেই কয়েকটা ভাঁজ এবং বসা গাল। সিগারেটের সাদা ধোঁয়া মিহি তন্তুজাল তৈরি করে মিহিরদার মুখটাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

ঝিমলি মিহিরদার মন্তব্যে চমকে উঠলেও কিছু বলেনি। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না।

'দু-জন্মের টানাপোড়েন বলতে কী বলতে চাইছেন?'

মিহিরদা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে একপলক দেখে নিলেন। তারপর বললেন, 'অন্তরা, আমার ধারণা, মাঝে-মাঝে মলিনের কাছে গতজন্ম আর এ-জন্ম মিশে যায়। মানে, দু-জন্মের মধ্যে ও যাতায়াত করে। আর...আর এই যাতায়াতে ওর...ওর...কষ্ট হয়।'

'কীসের কষ্ট?'

একটু কাশলেন মিহিরদা। পাঁচ-সাত সেকেন্ড চুপ করে থেকে আস্তে-আস্তে বললেন, 'যেমন ধরো, যাঁরা রিইনকারনেশান, ইএসপি, ক্লেয়ারভয়ান্স—এসব নিয়ে

গবেষণা করেন তাঁরা বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে বহু কেস-হিস্ট্রি রেকর্ড করেছেন। তার মধ্যে কোনটা কতটা সত্যি তা বলতে পারব না—তবে এটা মানতেই হবে, আমাদের জীবনে অনেকসময় এমন সব ঘটনা ঘটে যেগুলো ঠিক এক্সপ্লেইন করা যায় না। কিন্তু খুব ডিপলি চিন্তা করলে মনে হয়, কোথায় যেন একটা আননোন ফ্যাক্টর রয়েছে। এটাকে অনেকে "এক্স ফ্যাক্টর" বলে। মলিনের জীবনেও এরকম অনেকগুলো এক্স ফ্যাক্টর রয়েছে।'

ঝিমলি সায় দিয়ে মাথা নাড়ল ঃ 'ইয়েস, অফ কোর্স—।'

মিহিরদা একটু হেসে আবার বলতে শুরু করলেন, 'রিচার্ড ওয়েব নামে একজন অভিনেতা ছিলেন। তিনি একটা বই লিখেছিলেন—"দিজ কেম ব্যাক।" নাম শুনেই বুঝতে পারছ, জন্মান্তর, জাতিস্মর এসব নিয়ে লেখা। তাতে অনেকগুলো পিকিউলিয়ার কেসের কথা বলা আছে।

'যেমন, একটি মেয়ে, মেরি রফ—বয়েস সতেরো-আঠেরো—ইলিনয়ের ওয়াট্‌সেকায় থাকত। মেয়েটি অদ্ভুত অনেক কিছু করতে পারত। তার মধ্যে একটা ছিল চোখে কাপড় বেঁধে সেই অবস্থাতে ছুঁচ-সুতো নিয়ে সেলাই করা। ১৮৬৫ সালে মেয়েটি মারা যায়। এর পনেরো মাস পরে ওই অঞ্চলেই একটি মেয়ের জন্ম হয়। তার নাম লুরান্সি ভেনাম। লুরান্সির যখন আট বছর বয়েস তখন ওর মধ্যে মেরির স্বভাব ধরা পড়ে। তারপর আস্তে-আস্তে দেখা যায়, লুরান্সি মেরির মতো অনেক কাজই পারছে। তার মধ্যে একটা ছিল তোমার ওই চোখে কাপড় বেঁধে ছুঁচ-সুতো নিয়ে সেলাই করা—।'

আমি অবাক হয়ে মিহিরদার কথা শুনছিলাম আর কল্পনায় মেরি কিংবা লুরান্সিকে দেখতে পাচ্ছিলাম ঃ একটা বাচ্চা মেয়ে চোখে রুমাল বেঁধে সেলাই করছে। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে আমার জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়ারের কথা মনে পড়ে গেল।

মিহিরদাকে জিগ্যেস করলাম, 'মলিনের লাইফের এক্স ফ্যাক্টরগুলো কী-কী, মিহিরদা?'

'অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে—' সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা জানলা দিয়ে ছুড়ে দিলেন মিহিরদা ঃ 'যেমন ধরো, ওর সাঁতার জানার ব্যাপারটা। প্লাস চোখ বুজে ঘরের ভেতরে ঘুরে বেড়ানো। তারপর ওই অপদেবতার ব্যাপার নিয়ে কিছু-কিছু কথা। তা ছাড়া মাসে একবার গা থেকে গন্ধ বেরোনোর ঘটনা। এ ছাড়া বডি টেম্পারেচার অ্যাবনরম্যালি কম...।' একটু থামলেন মিহিরদা। সামনের রাস্তার দিকে অপলকে চেয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর মাথা নাড়লেন ঃ 'জানো, অন্তরা, আমার একটা সিক্স্‌থ্‌ সেন্স বলছে যে, আমাদের হাতে সময় কমে আসছে। এখন

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। মানে, দু-চারদিনের মধ্যে আমাদের তদন্তের জাল গুটিয়ে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।'

ঝিমলি বলে উঠল, 'তার মধ্যে আমাদের ইনভেস্টিগেশান শেষ হবে?'

'শেষ হবে কি না জানি না—তবে হলে ভালো হয়।'

'এটা আপনার সিক্স্থ্ সেন্স?'

মিহিরদা ঘাড় ঘুরিয়ে ঝিমলিকে দেখলেন, হেসে বললেন, 'সিক্স্থ্ না হোক সেভেন্থ্ বা এইট্থ্ ভাবতে পারো—তবে এটা সত্যি যে, একটা ফিলিং যেন টের পাচ্ছি।'

মিহিরদার কথায় আমি কেমন যেন দমে গেলাম। বাড়ি ছেড়ে এতদূরে এসে মিহিরদার সাহসই আমার আর ঝিমলির প্রধান ভরসা। তিনি যদি এভাবে...।

ভাবতে-ভাবতে আমার মনে হল, গতকাল বিকেলে প্রিয়বরণের সঙ্গে গিয়ে আমার যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা মিহিরদাকে বলা দরকার। কারণ, প্রিয়বরণকে দেওয়া কথা রাখতে গিয়ে শেষকালে মিহিরদার না একটা বিপদ হয়!

বাইরের জগতে অন্ধকার নামছিল। গরম বাতাস ধীরে-ধীরে ঠান্ডা হচ্ছিল। সূর্য একটু আগে পশ্চিমের আকাশে আত্মহত্যা করলেও লালের ছোপ নানান জায়গায় লেগে রয়েছে। তারই ওপরে অন্ধকারের গাঢ় পরদা ক্রমশ আরও গাঢ় হচ্ছিল। গণপতি কখন যেন গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে দিয়েছিল।

আমার মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এখনও ভালো করে কিছু জানা হল না, অথচ পুরুলিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে!

আমার ইচ্ছে ছিল, প্রিয়কে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাগ মানিয়ে অলৌকিক ব্যাপারটার আরও ভেতরে ঢুকব। ভালো করে তলিয়ে জেনে নেব সবকিছু। এমনকী মধুদাকে সঙ্গে নিয়ে সেই মজা কুয়োর ভেতরেও অভিযান চালাব।

এইসব এলোমেলো ভাবতে-ভাবতে আনমনাভাবে জানলা দিয়ে নজর চলে যাচ্ছিল। কয়েকটা গাড়ি, ট্রাক, মোটরবাইক শব্দ করে ছুটে গেল রাস্তা দিয়ে। রাস্তার ধারে কখনও-কখনও চোখে পড়ছে দু-চারটে দোকানপাট। এ ছাড়া বড়-বড় গাছ—শাল, মহুয়া, পিয়াল, কেঁদ—এখানে-ওখানে ঘন ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে।

মিহিরদা কী করে জানি না, আমার মনখারাপ ভাবটা টের পেলেন। তাই মনে হয়, পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে হঠাৎই প্রসঙ্গ পালটে বলে উঠলেন, 'অস্তুরা, তোমাদের একটা কবিতা শোনাই—।'

কথা শুনে আমি তো অবাক। এটা কবিতার সময়!

ঝিমলি চোখ বড়-বড় করে মিহিরদার দিকে তাকাল ঃ 'কী বলছেন, মিহিরদা! এটা কি কবিতার...।'

'হ্যাঁ, কবিতার সময়।' ঝিমলিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মিহিরদা হেসে বললেন, 'বাঙালির কাছে কবিতা হল চায়ের মতো—এভরিটাইম ইজ টি টাইম। যাকগে, কবিতাটা কাল এখানকার একটা ছোট পত্রিকায় পড়েছি। পুরোটা মনে নেই, তবে ফার্স্ট চারলাইন মনে আছে। কবিতাটার সাবজেক্ট ভারী অদ্ভুত ঃ এখানকার গরম, গরমের কষ্ট নিয়ে লেখা। ভাবা যায়!'

'বলুন তো, শুনি—' মনোযোগী ছাত্রীর মতো হাতের চেটোয় থুতনির ভার রেখে মিহিরদার দিকে তাকাল ঝিমলি।

আমিও আগ্রহ নিয়ে মিহিরদার দিকে তাকালাম। পেছন থেকে গাড়ির হর্ন কানে আসছিল।

মিহিরদা ধীরে-ধীরে সতর্ক উচ্চারণে বললেন,

' "চৈত মাস আলেই ন
রৌদের বড় ত্যাজ!
বাইদ, বহাল, গাড়হা, পুখর
সবই ভ্যাঁটফুটা, গটাই বর্ম্মটাড়।" '

'বাঃ, দারুণ!' আমি আর ঝিমলি প্রায় একসঙ্গে **বলে উঠলাম। সেইসঙ্গে গরম**টাও যেন বেশি করে টের পেলাম।

ঠিক তখনই একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল।

পেছন থেকে যে-হর্নের শব্দ শুনছিলাম সেটা পাগলাঘণ্টি হয়ে উঠল। পেছনের দরজার কাচ দিয়ে দুটো জোরালো আলোর বর্শা আচমকা ঢুকে পড়ল আমাদের গাড়ির ভেতরে।

আমি পেছনে তাকিয়ে প্রথমে ভাবলাম, আলো দুটো কোনও গাড়ির হেডলাইট। হয়তো জোরে চালাচ্ছে বলে গণপতির কাছে তাড়াতাড়ি সাইড চাইছে। কিন্তু তারপরই খেয়াল করলাম, দুটো মোটরবাইক আমাদের পেছন-পেছন ছুটে আসছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দুটো হেডলাইট রাস্তার দুপাশে সরে গেল। তারপর বাইকদুটো বিদ্যুৎবেগে আমাদের টাটা সুমোকে পাশ কাটিয়ে হর্ন দিতে-দিতে এগিয়ে গেল সামনে।

তখন আমাদের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় মোটরবাইক দুটোকে স্পষ্ট দেখা গেল।

দুটো বাইকেই পেছনে একজন করে লোক বসে আছে। তাদের হাতে

প্লাস্টিকের বড়-বড় জেরিক্যান। সেই ক্যানদুটো ওরা উপুড় করে ধরল। আর সঙ্গে-সঙ্গে কালো রঙের চটচটে তরল গবগব করে পড়তে লাগল রাস্তায়।

'ওরা কী করছে?' আমি সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলাম।

মিহিরদা সবে 'তেল না কি...' এইটুকু উচ্চারণ করেছেন, তখনই গণপতি ভয়ে চিৎকার করে উঠল : 'সালারা মোবিল ঢালছে!'

একইসঙ্গে ও দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ব্রেক আর স্টিয়ারিং নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে লাগল।

প্রচণ্ড শব্দ হল চাকায়। তারপরই আমাদের গাড়ি এসে পড়ল চটচটে মোবিলের ওপরে।

গণপতি হাজাররকম চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু গাড়ি ওর কথা খুব একটা শুনছিল না। তখন ও গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

কিন্তু গতিজাড্য যাবে কোথায়! তাই আমাদের টাটা সুমো খ্যাপা শুয়োরের মতো যেদিকে পারছিল ছুটে যাচ্ছিল। রাস্তার ওপরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারপর রাস্তার অ্যাসফ্যাল্ট পেরিয়ে চলে গেল পাশের এবড়োখেবড়ো কাঁকুরে জমিতে। সেখানে ভাগ্যিস জমির ঢাল বেশ উঁচু ছিল! তাই একটা ঢিবিতে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো খেয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

মোবিলের ওপরে গাড়ির চাকা প্রথম পিছলে যাওয়ামাত্রই মিহিরদা চিৎকার করে আমাকে আর ঝিমলিকে মাথা নিচু করে বসে পড়তে বলেছিলেন।

আমরা একটুও দেরি না করে তাই করেছিলাম। সেইজন্যে কয়েক সেকেন্ড কিছুই দেখতে পাইনি। কিন্তু এখন গাড়িটা গুঁতো খেয়ে সামান্য কাত হয়ে পুরোপুরি থেমে যেতেই আমরা সোজা হয়ে বসেছি, জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করেছি। যদিও বুক ঢিপঢিপ করছিল।

দূরে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। সেখানে ভালো করে নজর চালিয়েও কাউকে দেখা গেল না। কিন্তু আগুন দেখা গেল। রাস্তায় আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের শিখা জ্বলতে-জ্বলতে ছুটে এগিয়ে আসছে।

আমাদের গাড়িটা কাত হয়ে থাকায় গণপতির দিকের দরজাটা আকাশমুখো হয়ে বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে ছিল।

গণপতি চেঁচিয়ে বলল, 'আপনারা এখুনি নেমে পড়ুন। ওরা মনে হয় মোবিলের সঙ্গে পেট্রোলও ঢেলেছে। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে গেছে।'

গণপতি ওর দিকের দরজাটা বেশ কষ্ট করে ঠেলেঠুলে খুলল। বোধহয় ধাক্কা-টাক্কা লেগে দরজাটা জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। তারপর ও লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

ততক্ষণে মিহিরদা নেমে পড়েছেন, আর বাঁ-দিকের দরজা খুলে আমি আর ঝিমলিও নেমে পড়েছি।

আমার বা ঝিমলির তেমন চোট লাগেনি। শুধু ভয় আর উত্তেজনায় বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছিল।

তবে লক্ষ করলাম, মিহিরদা বাঁ-হাতের কনুই বারবার চেপে ধরছেন, হাত বোলাচ্ছেন। নিশ্চয়ই অল্পবিস্তর চোট পেয়েছেন।

'কী হয়েছে, মিহিরদা? হাতে লেগেছে?'

মিহিরদা তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'না, না—সেরকম কিছু না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ওই দ্যাখো, আগুনটা কতটা এগিয়ে এসেছে!' তারপর গণপতির দিকে তাকিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'গণপতি, আগুন গাড়ি পর্যন্ত চলে আসবে না তো!'

গণপতি তাড়াতাড়ি গাড়ির পেছনদিকটায় চলে গেল। মাটিতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গন্ধ শুঁকল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নাঃ, সেরকম ভয় নেইকো। তা ছাড়া, আগুন যদি এদিকে এগিয়ে আসে তা হলে গাড়ি চালিয়ে চম্পট দেব।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'তোমার গাড়ি ঠিকঠাক চলবে তো?'

অন্ধকারেই হাসল গণপতি ঃ 'বাঘের বাচ্চা সহজে ঘায়েল হয় না, দিদিমণি। আমি গাড়ি নিয়ে ওর মধ্যে দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারতাম—কিন্তু তাতে আপনাদের রিস্ক হয়ে যেত।'

গণপতির কথা শেষ হতে-না-হতেই দেখি একটা মালবোঝাই ছোট লরি রাস্তার মোবিলে স্কিড করে বেসামাল হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটা গাছের গুঁড়িতে গিয়ে গোঁত্তা মারল। ওটার পিঠে বোঝাই করা বস্তাগুলো দড়ির বাঁধন খুলে এদিকে-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল।

রাস্তার এই জায়গাটায় দোকানপাট নেই বললেই চলে। হয়তো সেইজন্যেই মোটরবাইকের লোকগুলো মোবিল ফেলে আমাদের হেনস্থা করার জন্যে এই জায়গাটাই বেছে নিয়েছে। ওরা হয়তো চাঁদমণি গ্রাম থেকেই আমাদের পিছু নিয়েছিল।

এর পেছনে প্রিয়বরণের হাত আছে কি না কে জানে।

হঠাৎই টের পেলাম, কখন যেন আমি দাঁত দিয়ে নখ কাটতে শুরু করেছি।

ঝিমলি আমার হাত খামচে ধরে বলল, 'অন্তরা, ইনাফ ইজ ইনাফ। আমাদের কালই কলকাতা ব্যাক করা উচিত। এই আননোন গ্যাঙের লোকজন যেরকম ডেসপারেট দেখছি তাতে আমরা আজ জাস্ট লাকের জোরে বেঁচে গেছি।'

ঝিমলি যে ভয় পেয়েছে সেটা ওর কথায় বোঝা গেল। বোঝা গেল ওর শরীরের কাঁপুনিতেও।

ভেতরে-ভেতরে কাঁপছিলাম আমিও। ভয় করছিল ভীষণ। এই ভয়ের সঙ্গে

লড়াই করে আর কতদিন আমরা টিকতে পারব এখানে?

সেই মুহূর্তেই ঠিক করলাম, প্রিয়বরণের কাছে যা-যা শুনেছি, ওর সঙ্গে কাল গিয়ে সেই অদ্ভুত বনাঞ্চলে নদীতে যা-যা দেখেছি সব মিহিরদাকে বলব। প্রিয়বরণকে দেওয়া কথা না রাখলেও তেমন পাপ হবে না। কারণ, বাপির মৃত্যুরহস্য ভেদ করার জন্যে এরকম একলক্ষ শপথ ভাঙা যায়।

আগুনের শিখা লরির কাছে এগিয়ে এসে লকলক করে জ্বলছিল। আর এগোতে পারছিল না। নিশ্চয়ই সামনে পেট্রোল-ভেজা রাস্তা আর নেই।

দু-চারজন লোক ছুটে আসছিল লরি আর আমাদের টাটা সুমোর দিকে। সেটা দেখেই মিহিরদা চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠলেন ঃ 'গণপতি, শিগগির গাড়িতে স্টার্ট দাও—কুইক। আমাদের এক্ষুনি কেটে পড়তে হবে। নইলে আবার থানা-পুলিশের ঝামেলা।' আমার কাছে এগিয়ে এসে মিহিরদা চাপা গলায় বললেন, 'আবার সেই কেদার সেনাপতির খপ্পরে পড়তে হবে। তখন কে জানে, আজকের রাতটা হাজতেই কাটাতে হবে কি না।'

গণপতি ঝটিতি স্টার্ট দিয়ে ওর বাঘের বাচ্চাকে ব্যাক করে সমান জমিতে নিয়ে এল। মিহিরদার ইশারায় আমি আর ঝিমলি তড়াক করে উঠে পড়লাম বাঘের পিঠে।

মিহিরদা গণপতির পাশে বসে শুধু বললেন, 'যেদিকে খুশি চালাও কিন্তু জলদি চালাও! আমরা এখন "পথিক"-এর দিকে যাব না—এক-দু-ঘণ্টা এমনি এলোমেলো ঘুরব। তারপর, রাত হলে, তখন হোটেলে ফেরার কথা ভাবা যাবে।'

মিহিরদার কথার প্রথম লাইনটা শুনতে-শুনতেই গণপতি গাড়ি চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপর মিহিরদার বাকি কথাগুলো ওর কানে গেল। আর ও ছোটাল বটে ওর বাঘের বাচ্চাকে!

হু-হু করে ছুটে চলা ওর গাড়িতে বসে মনেই হচ্ছিল না যে, এ-গাড়িতে থাকলে আমরা কখনও ঘায়েল হতে পারি। অথচ একটু আগেই আমরা নেহাত কপালজোরে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি।

পনেরো-কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যেই আমাদের টাটা সুমো অকুস্থল থেকে এত দূরে চলে এল যে, মনে হচ্ছিল একটু আগের দুর্ঘটনাটা অন্য কোনও গ্রহের ঘটনা।

মিহিরদা বাঁ-হাতটা চেপে ধরে মাঝে-মাঝেই 'উঃ-আঃ' করছিলেন। সেটা দেখে আমি গণপতিকে বললাম, 'পুরুলিয়া স্টেশনের দিকে চলো—সেখানে মিহিরদাকে একটু ডাক্তার দেখাতে হবে।'

মিহিরদা 'না, না, দরকার নেই—' বলে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি মিহিরদার কথায় পাত্তাই দিলাম না। বললাম, 'এ ব্যাপারটা আমার ওপরে

ছেড়ে দিন, প্লিজ।' তারপর গণপতির দিকে ফিরে ঃ 'গণপতি, জলদি—।'

ঝিমলি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার মিনমিন করে বলল, 'অন্তরা, হু আর দে—দৌজ মোটরবাইক গাইজ?'

'জানি না। তবে মনে হয় স্বর্ণভূষণ তরফদারদের দলের লোক। ওইসব সিক্রেট ওয়ারশিপার্‌স।'

এবারে মিহিরদা কথা বললেন, 'সিক্রেট ওয়ারশিপার্‌স তো সবাই, অন্তরা। স্বর্ণভূষণ, প্রিয়বরণ, এমনকী মলিনও।'

মিহিরদার কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি। তবুও কেন জানি না, আমি ওই তিনজনকে একসারিতে বসাতে পারছিলাম না। কারণ, প্রিয়বরণের মধ্যে আমি দোলাচল দেখেছি। আর মলিন তো নিতান্তই বাচ্চা ছেলে!

একটু সময় নিয়ে থেমে-থেমে বললাম, 'মিহিরদা, আমার মনে হয়, মলিনকে নিয়ে একটু বেশি খোঁজখবর করলেই বাপির ভাষায় ওই "কেঁচো খুঁড়তে সাপ" বেরিয়ে পড়বে।'

কথাটা বলার পরেই আমার শরীরে কাঁটা দিল। মনে হল, আমি অজান্তেই এক অমোঘ সত্য উচ্চারণ করে বসে আছি। নতুন একটা ভয় আমাকে সিঁটিয়ে দিল। তখন মনে-মনে নতুন একটা প্রতিজ্ঞা করলাম ঃ আজ রাতে হোটেলে ফিরে মিহিরদাকে সব কথা খুলে বলতেই হবে।

সেইসঙ্গে মধুদাকেও বাদ দিলে চলবে না। কারণ, একমাত্র ওই বুড়ো প্রতিবন্ধী মানুষটাই সেই অপদেবতার সঙ্গে সুদীর্ঘ প্রত্যক্ষ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

॥ বাইশ ॥

বেলা দুটো নাগাদ গণপতি সূত্রধরের টাটা সুমো নিয়ে আমি আর ঝিমলি বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার পিচ গরমে কালো হয়ে গেছে। দুপাশের পাথুরে জমিতে যেন খটখটে আগুন জ্বলছে। দেখে বোঝা যায় না এখন বর্ষাকাল।

একটু পরেই আমাদের গাড়িতে উঠে পড়বে মধুসূদন। 'ছেলের অসুখ' এই অজুহাতে মধুদা দুপুরের পর সুখেন্দু পালের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

আসলে মধুদা বাড়ি যায়নি। কাল রাতেই ও গণপতির সঙ্গে কথা বলে রেখেছিল। সুখেন্দু পাল তখন নেশায় চুর। মধুদা আমাদের প্ল্যান শুনে বলেছিল, 'দুপুর দুটো নাগাদ তোমরা রওনা হয়ে যেয়ো, দিদিমণিরা—আমি মাঝপথে তোমাদের

সঙ্গে মিলে যাব। আমি আগেভাগে বেরোব। রহম রোহোম চলে-চলে জানে-তানে পোহনচে যাব। ঠিক দেখা হয়ে যাবেক।'

ব্যাপারটা গণপতি আর মধুদা বোঝাপড়া করে নিয়েছে।

মধুদা গাড়িতে উঠলে আমরা রওনা হয়ে যাব বাঘমুন্ডি পাহাড়ের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখা করব সেই গুণিনের সঙ্গে—যে মধুদাকে জলপড়া দিয়েছে অপদেবতার সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে।

খানিকটা পথ গিয়েই গণপতি গাড়িটাকে বাঁ-দিকের একটা কাঁচা রাস্তায় ঢুকিয়ে দিল। সেখানে পাতা ছাওয়া কয়েকটা ছোট-ছোট ঘর। মাঝে-মাঝে কয়েকটা বড়-বড় গাছ।

একটা ঘরের লাগোয়া একটা ছোট মুদিখানাগোছের দোকানে মধুসূদন দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের গাড়ি দেখতে পেয়েই দোকানদারকে কীসব বলে গাড়ির কাছে চলে এল। সামনের দরজা খুলে উঠে বসল গণপতির পাশে।

মিহিরদা আমাদের সঙ্গে আজ বেরোতে পারেননি। সকাল থেকে মাইগ্রেনের ব্যথায় কাহিল হয়ে আছেন। তা ছাড়া, বাঁ-হাতের কনুইয়ে ব্যান্ডেজ থাকায় ভালো করে চলাফেরা করতে পারছেন না। আমরা যখন বেরোচ্ছি তখন বারবার করে বলেছেন, 'খুব কেয়ারফুল থাকবে। কোনও রিস্ক নেবে না। বিপদ দেখলেই গাড়ি নিয়ে সটকে পড়বে। আর ফিরতে বেশি দেরি করবে না। অন্ধকার হওয়ার আগেই হোটেলে ব্যাক করবে।'

মিহিরদার দুশ্চিন্তা আমি বুঝতে পারি। শুধু আমার জেদের কাছে তিনি হেরে গেছেন বলেই এখনও আমরা কলকাতা ফিরে যাইনি। কিন্তু কাল রাতের ঘটনার পর আমার মনে হচ্ছে আমরা শেষের খুব কাছে এগিয়ে এসেছি। যদিও সেই শেষটা কী তা বলতে পারি না। আর এও জানি না, সেই শেষে পৌঁছনোর পর আমরা কী দেখব, আর সেই 'দেখা' ব্যাপারটা বাপির মতো কোনও ডায়েরিতে লিখে যাওয়ার সময় কিংবা সুযোগ পাব কি না।

গতকাল রাতে মোটরবাইক ছুটিয়ে যাওয়া লোকগুলো আমাদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। হতে পারে, ওরা হয়তো সেই অপদেবতার পূজারি। হতে পারে, ওরাই হয়তো পাহাড়ি পথে প্রিয়বরণের বাইক থামিয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। গত রোববার রাতে মশাল নিয়ে যে-মিছিল দেখেছি, ওরা হয়তো সেই মিছিলেও সামিল ছিল।

কাল রাতে অনেকক্ষণ আমরা গোল-টেবিল বৈঠকে বসেছিলাম। এতদিন ধরে নোট নেওয়া সব কাগজপত্র আর বাপির ডায়েরি নিয়ে আমরা বহু আলোচনা করেছি। সেই আলোচনার সময় মধুদাকে বলে দু-রাউন্ড চা-ও খেয়েছি।

আমি বাইরে স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ভয় পাচ্ছিলাম। আমরাও কি বাপির মতো 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' বের করতে চলেছি?

একেবারে পরীক্ষার পড়ার মতো আমরা মিহিরদার বিছানার ওপরে হুমড়ি খেয়ে ছড়ানো কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখছিলাম। মিহিরদা বারবার বলছিলেন, 'ভালো করে দ্যাখো, ডেফিনিট পয়েন্ট কী-কী পাও। আমি কোনও স্পেকুলেশান বা ওপিনিয়ান চাইছি না—শুধু ফ্যাক্ট্স চাইছি। সেগুলো নিয়ে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করব। এই ব্রিফ রিপোর্টটা আমাদের মাথায় থাকলে এক্সপ্লোর করার কাজটা অনেক সহজ হবে।'

তো কাগজপত্র আর স্মৃতি ঘেঁটে অনেক কাটাকুটি করে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করলাম। লিস্টটা তৈরি করে সেটার দিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। লিস্টের সবই আমাদের জানা তথ্য—তবে সেই তথ্যগুলো একসঙ্গে চোখের সামনে রেখে অপদেবতার আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে গেলে মনটা কেমন যেন শিউরে ওঠে। আমরা তিনজনেই লিস্টটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলাম ঃ

১। অপদেবতা শিস দেয়।

২। সে অদৃশ্য হতে পারে। 'পথিক' হোটেল থেকে সুরঞ্জন মজুমদারের ডেডবডি নিয়ে আসার সময় মিহির গাঙ্গুলি মধুসূদনের সঙ্গে অদৃশ্য কোনও অপশক্তির লড়াই দেখেছেন।

৩। অপদেবতা সাধারণত মাটির নীচে থাকে। তবে সুরঞ্জন মজুমদারের ডেডবডি নিয়ে জিপে করে যাওয়ার সময় সেই অপদেবতা সম্ভবত অদৃশ্য হয়ে মিহির গাঙ্গুলি আর মধুসূদনকে ধাওয়া করেছিল—এবং তখন বোধহয় সে মাটির ওপরেই ছিল।

৪। অপদেবতার আক্রমণে যদি কারও অঙ্গহানি হয় তা হলে অপদেবতা তাকে আর আক্রমণ করে না বা গ্রাস করে না। মধুসূদন এই কথাই মিহির গাঙ্গুলিকে বলেছিল। অপদেবতার কোপে ডান পা খুইয়েছে বলেই মধুসূদন অপদেবতাকে আর ভয় পায় না। বলির পশু যেমন খুঁতহীন হওয়া প্রয়োজন, এই অপদেবতাও কি সেরকম খুঁতহীন শিকার চায়?

৫। যারা অপদেবতার পুজো করে, তারা চায় না যে, এই অপদেবতার ব্যাপারটা জানাজানি হোক। তাই তারা সুরঞ্জন মজুমদারের

ডায়েরিটা ফেরত চেয়ে বারবার ভয় দেখায়, হুমকি দেয়। ছুটন্ত গাড়ির সামনে বেপরোয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৬। অপদেবতার ভক্তদের কেউ-কেউ ব্ল্যাক ম্যাজিক জানে। যেমন কলকাতার কফিহাউসে দেখা হওয়া স্বর্ণভূষণ তরফদার। সে হয়তো অন্তরা আর ঝিমলিকে ফলো করে পুরুলিয়ায় এসেছে।

৭। 'পথিক' হোটেলের মালিক সুখেন্দু পাল বলেছে, এখানে অনেক পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়। এর বেশি কিছু না বললেও মনে হয় সে অপদেবতার গোপন পুজোর ব্যাপারটা জানে।

৮। শিসের শব্দ ছাড়াও অপদেবতার কয়েকটা লক্ষণ আঁচ করা যায়। যেমন, তার গা থেকে একধরনের মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। সেই গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে। সবুজ শ্যাওলা অপদেবতার আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। এই শ্যাওলা বা জেলি আঠালো। এর একটা গন্ধ আছে—চিনি জাল দেওয়ার সময় এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। এ ছাড়া সবুজ আলোও অপদেবতার আর-একটা লক্ষণ।

৯। অপদেবতা মাঝে-মাঝে 'প্রসাদ' গ্রহণ করে। প্রসাদ মানে জীবন্ত মানুষ। এ কি অনেকটা দেবতার থানে পশু উৎসর্গ করার মতন? এই মানুষগুলোর আর কখনও খোঁজ পাওয়া যায় না। ওরা 'হারিয়ে' যায়।

১০। ময়না সরেন যেখানে উধাও হয় সেই শাল-জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া লকেটটার সঙ্গে অপদেবতার কি কোনও সম্পর্ক আছে?

১১। মলিনের সঙ্গে এসব ঘটনার সম্পর্ক কী? একমাত্র সম্পর্ক ওই লকেট—একটা লকেট মলিন কুড়িয়ে পেয়েছিল। কিন্তু ও কি সত্যি-সত্যিই জাতিস্মর?

১২। অপদেবতার সংখ্যা কত? কারণ, ময়না সরেন আর চুনারাম মাহাত একই জায়গা থেকে নিরুদ্দেশ হয়নি। তা ছাড়া, মধুসূদন যে-কুয়োতে সে-রাতে জলপড়া ছিটিয়েছিল সেটাও অন্য জায়গায়। আবার প্রিয়বরণের সঙ্গে গিয়ে অন্তরা যে-ঢেউখেলানো নদী দেখেছে, যদি সেই নদীর নীচে অপদেবতা থেকে থাকে, সেটা তো অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক দূরে।

১৩। অপদেবতার সঙ্গে বোধহয় ঠান্ডা অথবা শীতের একটা সম্পর্ক আছে। অন্তরা আর প্রিয়বরণ যে-

ঢেউখেলানো নদী দেখেছিল, তা থেকে বরফের কুচি অন্তরার গায়ে ছিটকে এসেছিল। তা ছাড়া সেই নদীর পরিবেশে হঠাৎ করেই শীত নেমে এসেছিল।

লিস্টটা আমরা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। তখন মিহিরদা হঠাৎই ওটা টেনে নিয়ে নীচে একটা মন্তব্য লিখলেন ঃ প্রিয়বরণ সরকার একটা মিস্ট্রি।

মন্তব্যটা দেখামাত্রই ঝিমলি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছে, 'কী রে, মিহিরদা ঠিক লিখেছেন? যদি ঠিক হয়, তা হলে সেই মিস্ট্রি পসিব্‌লি তুই সল্‌ভ করতে পারবি।'

আমি ছোট্ট করে বলেছি, 'চেষ্টা তো করছি—।'

হঠাৎই খেয়াল করলাম, আমাদের গাড়ির দুপাশে ঘন গাছপালা। আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আর শুধু তাই নয়, আমাদের টাটা-সুমো গোঁ-গোঁ করতে-করতে খাড়াই আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে উঠছে।

চড়া রোদে গাছপালার আড়াল গাঢ় ছায়া তৈরি করেছে। গাছের পাতা তেমন নড়ছে না—ফলে বোঝা যায় বাতাস শান্ত। রুক্ষ পাহাড়ের অনেকটাই গাছপালায় ঢাকা বলে রুক্ষতার ওপরে সবুজের কোমল প্রলেপ পড়েছে।

গাড়ি চালাতে-চালাতে গণপতি জানাল, এই জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার আছে। তখন মধুসূদন বলল, বিষধর সাপও এখানে কম নয়। প্রত্যেক বছর সাপের কামড়ে পাঁচ-ছ'গণ্ডা করে লোক মারা যায়।

আমি আর ঝিমলি টুকটাক কথাবার্তা বলছিলাম আর গাড়ির জানলা দিয়ে দুপাশের ছবি দেখছিলাম।

এবড়োখেবড়ো পথের পাশে খানাখন্দ চোখে পড়ছিল। কখনও দেখতে পেলাম খাদের মতো গহ্বর। কোথাও আবার ঝরনার দেখা পেলাম। গণপতি বলল, সারা বছর এসব ঝরনা শুকনো থাকে। শুধু বর্ষাকালেই একটু যা দাপট দেখা যায়। টুরিস্টরা এখানে খুব ঘুরতে আসে।

আরও আধঘণ্টা পর আমরা প্রায় অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেলাম। গণপতি বলল, অযোধ্যা পাহাড়টা বাঘমুণ্ডি থানার মধ্যেই। আর যেটাকে আমরা বাঘমুণ্ডি পাহাড় বলি সেটা আসলে অযোধ্যা পাহাড়েরই একটা অংশ। অযোধ্যার হায়েস্ট পিক গজবরু। দু-হাজার ফুটের ওপর উঁচু। আর এই অযোধ্যা পাহাড়কে ঘিরে আছে চারটে ব্লক ঃ ঝালদা, বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর আর আরষা।

মধুসূদন এবার পথ দেখাতে লাগল আর গণপতি ওর কথামতো গাড়ি চালাতে লাগল।

হঠাৎই গাছে ঘেরা একটা রুক্ষ অঞ্চলে গাড়ি ঢোকাতে বলল মধুসূদন। বলল, 'দিদিমণিরা, আমরা প্রায় এসে গেছি...।'

আমি আর ঝিমলি তাড়াতাড়ি অ্যাটেনশান হয়ে বসলাম। উঁচু-নিচু জমিতে গাড়ি লাফিয়ে-লাফিয়ে খুব ধীরে এগোচ্ছিল। কখনও-কখনও চাকার তলায় গাছের ডাল ভাঙার শব্দ পেলাম।

এইভাবে কিছুটা এগোনোর পর দেখলাম, গাছগাছালিতে সামনের পথ প্রায় বন্ধ।

মধুসূদনের কথায় গণপতি গাড়ি থামাল। মধুদা নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ওর দেখাদেখি আমি আর ঝিমলিও নেমে পড়লাম।

মধুদা বলল, 'এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।'

গণপতিকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা তিনজন সাবধানে পা ফেলে এগোতে শুরু করলাম।

চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বড়-বড় গাছের ছায়ায় জায়গাটা কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে আর ঠান্ডা। বাতাসে ভেসে আসছে অচেনা পাখির ডাক। আমার বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। ঝিমলির হাত ধরে থেকেও তেমন ভরসা পেলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ পথ চলার পর পাথরের তৈরি একটা ঢিবির মুখোমুখি হলাম। সেই ঢিবির মধ্যে বড়সড় একটা অন্ধকার গর্ত। ঢিবিটা যদি মানুষের তৈরি না হত তা হলে গর্তটাকে গুহা বলতে কোনও অসুবিধে ছিল না।

ঢিবির ওপরে রাজ্যের লতাপাতা জড়ো করা। সময়ের কামড়ে তার কিছু-কিছু শুকিয়ে গেছে। গর্তের মুখে কয়েকটা সবুজ আর বাদামি লতা লম্বা-লম্বা ঝালরের মতো ঝুলছে।

ঢিবির সামনে কয়েকটা গাছের ডাল ছড়িয়ে আছে। তারই মাঝে একটা বড় কালো পাথর। পাথরটায় তেল মাখানো—চকচক করছে। আর তার ওপরে সবুজ পাতা আর বুনো ফুল ছড়ানো।

ঢিবিটা গুণিনের আস্তানা বলেই মনে হল। কিন্তু গুণিন কি সবসময় ওই গর্তের ভেতরে সেঁধিয়ে থাকেন? আর ওই তেল মাখানো কালো পাথরটা কোনও দেবতার প্রতীক হতে পারে। যদিও তার আকৃতি ঠিক শিবলিঙ্গের মতো নয়।

গর্তের সামনে খানিকটা জায়গা বেশ ফাঁকা। তবে ফাঁকা বলতে ওইটুকুই। কারণ, ঢিবির দুপাশে আর পেছনে জঙ্গল আরও নিবিড় হয়েছে।

কট-কট করে কোনও পোকা বা ওই জাতীয় কিছু ডাকছিল। ঝিমলি দেখি কাতর চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। ভাবটা এমন, যেন এই পরিস্থিতি থেকে

ওকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে ও আমার কেনা হয়ে থাকবে। আমি চোখের পাতা ফেলে থুতনি সামান্য নেড়ে ওকে ধৈর্য ধরতে ইশারা করলাম।

মধুসূদন আমাদের ছেড়ে এগিয়ে গেল সামনে। ওর চলাফেরা দেখে মনেই হচ্ছিল না যে, ওর একটা পা কাঠের।

ওর সঙ্গে যে একটা বটুয়া ছিল সেটা আগে খেয়াল করিনি। সেটার ফাঁস খুলে কিছু খুচরো পয়সা আর কিছু কুচো ফুল বের করল মধুদা। তারপর সেই কালো পাথরটার সামনে আচমকা হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। পয়সা আর ফুল দু-হাতে ছড়িয়ে দিল পাথরের ওপর। মাটিতে কোলাব্যাঙের মতো থেবড়ে বসে জড়ানো গলায় কান্নার সুরে ইনিয়েবিনিয়ে কীসব বলতে লাগল।

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কোনও প্রার্থনা কিংবা মন্ত্র-তন্ত্র হবে। কিন্তু ওই থমথমে নির্জন জঙ্গলে ওই অদ্ভুত কান্নার সুর শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিল। আমি আর ঝিমলি ঢিবির গর্তটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। কিছুতেই চোখ সরাতে পারছিলাম না।

দশ কি পনেরো সেকেন্ড পেরোতে-না-পেরোতেই একটা খসখস শব্দ পেলাম। যেন মাটিতে কোনও কিছু ঘষটে নিয়ে আসা হচ্ছে।

রুক্ষ জমির ওপর দিয়ে কেউ কি কোনও থলে কিংবা বস্তা টেনে নিয়ে আসছে বাইরে?

শব্দটা গর্তের ভেতর থেকেই শোনা যাচ্ছিল—ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে।

আমাদের কান ছিল শব্দটার দিকে, আর চোখ ঢিবির গর্তের দিকে। বেশ খেয়াল করতে পারছিলাম, শব্দটা ঠিক একটানা নয়—বরং মর্স কোডের ডট-ড্যাশের মতো। কেউ যেন বস্তাটা টানছে, থামছে—তারপর আবার টানছে।

একসময় শব্দটা গর্তের মুখে এসে শেষ হল। গাছের পাতার কোন অলৌকিক কারসাজিতে একখাবলা রোদ এসে পড়েছিল গর্তের মুখে। সেই রোদের ফলায় গর্তের ভেতর থেকে উড়ে আসা ধুলোর কণা ভেসে বেড়াচ্ছিল।

গর্তের মুখে শেষ পর্যন্ত যে-জিনিসটা এসে থামল তাকে ঠিকঠাক বর্ণনা করা বেশ কঠিন। তবে এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'জিনিস'টাকে গুণিন না বলে অপদেবতা বললেই বোধহয় বেশি মানায়।

টকটকে লাল কাপড়ে জড়ানো অষ্টাবক্র একটা রোগা শরীর। কেঁচোর মতো বুকে হেঁটে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এসেছে গুহার বাইরে। রোগা টিংটিঙে শরীরটা এমনভাবে জট পাকিয়ে আছে যে, হাত-পাগুলো ঠিক যে কোথায় সেটাই ঠিকমতো ঠাহর করা মুশকিল। আর তার লাল পোশাকটা সারা দেহে এলোমেলো ব্যান্ডেজের মতো জড়ানো। কোথায় যে সেই পোশাকের শুরু, আর কোথায় যে শেষ, তার

হদিস পাওয়াই ভার। তবে পোশাকটার সর্বত্র ধুলো-মাখা আর নানান জায়গায় পাখির ময়লা লেগে আছে। এ ছাড়া যেখানে-সেখানে যেমন-তেমনভাবে ছিঁড়েখুঁড়েও গেছে।

পোশাকের বাইরে গুণিনের যেটুকু দেখা যাচ্ছিল সেটা হল শিরা-ওঠা হাত, কবজির খানিকটা, পায়ের পাতা, গোড়ালি ছাড়িয়ে পায়ের কিছুটা অংশ—ব্যস এইটুকুই। মানুষটার হাত-পায়ের রং ঘোর কালো—আর হাড়ের ওপরে যেন শুধু চামড়া জড়ানো।

গুণিনের মুখের ওপরে চোখ পড়তেই আমি একটা বিশাল ধাক্কা খেয়েছি। মানুষের মুখ যে এত বীভৎস হতে পারে তা কোনওদিন কল্পনাও করিনি।

মাথার বড়-বড় চুল যে অযত্নে জটপাকানো হবে এটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। গুণিন-টুনিনদের এরকম হতেই পারে। কিন্তু মুখ? এরকম মুখ সামনাসামনি দেখলে রক্ত হিম হয়ে যেতে চায়।

গুণিন সরীসৃপের মতো মাটিতে উপুড় হয়ে ছিল বটে, কিন্তু মুখটা উঁচু করে আমাদের দিকে দেখছিল।

ঝিমলির ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কীভাবে যেন বুঝতে পারলাম আমার মুখের অবস্থাটাও একইরকম।

গুণিনকে দেখে মধুসূদন হাঁটুগেড়ে উঠে বসেছিল। ও জোড়হাত করে সামনে-পেছনে দুলে-দুলে পাঁচালির মতো সুরে কীসব বলছিল—তার একটা বর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। তা ছাড়া, আমার কানও ঠিকঠাক কাজ করছিল না। গুণিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত চেতনা বোধহয় অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

জটবাঁধা বড়-বড় চুলের গুছি কপালের ওপরে নেমে এসেছে। তার নীচে বুনো ঝোপের মতো কাঁচা-পাকা ভুরু। ডান ভুরুর নীচে কালো আর লাল মেশানো একটা একটা গর্ত—যে-গর্তে কোনওসময় চোখ বলে কিছু একটা ছিল।

সেই চোখটা যে কেমন ছিল সেটা বোঝা যায় অন্য চোখটার দিকে তাকিয়ে। ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ সেই চোখে সূর্যের আলো পড়ে চোখের মণি ঝিলিক দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, সেই চোখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে তেজ। অপার শক্তিমান সেই তেজ যে-কোনও শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে।

গুণিনের মুখটা ভীষণ লম্বাটে। দু-গাল বসা। থুতনিতে শণের মতো সাদা একখাবলা দাড়ি—দেখে মনে হয় নকল, আঠা দিয়ে লাগানো। আর সারা মুখে বীভৎস কাটা-ছেঁড়ার দাগ। কেউ যেন ওই মুখে পাগলের মতো ক্ষুর চালিয়ে তারপর কোনওরকমে কাটা জায়গাগুলো জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমার পা দুটো মাটিতে গেঁথে গিয়েছিল। দিনদুপুরে নিঝুম রাতের ভয় আমাকে ঘিরে ধরল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো গুণিনের ভয়ংকর মুখের দিকে তাকিয়ে

রইলাম। গুণিনের একচোখের তীব্র বর্শা আমাকে ক্রমাগত বিদ্ধ করতে লাগল।

গুণিন ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসেছিল কালো পাথরটার সামনে। একইসঙ্গে মধুদা হাঁটুগেড়ে থাকা অবস্থাতেই পায়ে-পায়ে পিছিয়ে এসেছিল আমাদের কাছে।

গুণিন কালো পাথরটাকে আঁকড়ে ধরে থুতনিটা তার ওপরে রাখল। তার শরীর আর পোশাকের আড়ালে পাথরের ফুল-পাতা ঢাকা পড়ে গেল। তারপর কালো সরু ডানহাতটা শূন্যে তুলে গুণিন একটা মিহি চিৎকার করল।

মধুদা হাতজোড় করে মাথা নিচু করে বলল, 'গড় করি, বাবা।'

গুণিন ডানহাতটা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে এগিয়ে দিল, মিহি গলায় বলল, 'আমি আছি, কোনও ভয় নাই।'

গুণিনকে দেখে আমার যে খুব একটা ভরসা হল তা নয়। তবে হঠাৎ করে কেন জানি না মনে হল, ভয়ংকর দিয়েই ভয়ংকরকে খতম করতে হবে।

কিন্তু খতম কি হবে? এই গুণিনই জলপড়া দিয়েছিল মধুদাকে। সেই জল অপদেবতার গায়ে ছিটিয়ে মধুদা অপদেবতার তেজ স্তিমিত করতে পেরেছিল মাত্র—তার বেশি কিছু নয়। সেটাই কি এই গুণিনের ক্ষমতার সীমা? তাই যদি হয়, তা হলে এই গুণিন আমাকে খুব বেশি সাহায্য করতে পারবে না। তা ছাড়া, মধুদা বলেছিল, গুণিন সবসময় কথা বলে না—খেয়াল হলে পর বলে।

হতাশ ভাবটা সবে মনে ছড়াতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই গুণিন আমাকে লক্ষ করে কথা বলতে শুরু করল। তার কথায় আঞ্চলিক টান থাকলেও কথা বুঝতে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। দেখলাম, মধুসূদন মুখ হাঁ করে অবাক হয়ে গুণিনের দিকে তাকিয়ে আছে।

এক চোখের দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে গুণিন মিহি গলায় বলল, 'জানতাম একদিন-না-একদিন তুই আমার কাছে আসবি। তোর অন্দরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। তুই পারবি। তোর শোধের আগুন নিভে যাবে—ধকরপকর নিভে যাবে। তোর যা নিস্‌কপট চেষ্টা...ফল পাবি...অপদেব্‌তা নাস্‌ হবে নিস্‌চোএ।'

গুণিনকে দেখে আমার মধ্যে কোনও ভক্তিভাব আসেনি। কিন্তু আমি মন দিয়ে তার কথা শুনছিলাম। তার শুরুর কথাগুলো শুনে মনের মধ্যে আশা জাগছিল।

এরপর গুণিন আমাকে নানান প্রশ্ন করল। আমরা কবে এসেছি, কী-কী দেখেছি, কলকাতায় কী-কী ঘটনা ঘটেছে—সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে নিল। তবে আশ্চর্য, মানুষটা ঝিমলিকে একটা কথাও জিগ্যেস করল না।

যতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা চলল, ততক্ষণ মধুসূদন হাত জোড় করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

যখন আমি ভাবতে শুরু করলাম, গুণিন আমাকে কোনও পথের হদিস দিচ্ছে

না কেন, ঠিক তখনই মানুষটা আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার মনের প্রশ্নের জবাব দিল।

'এইবার তোকে পথটি বলে দিই...।'

গুণিন আমাকে পথ বলতে লাগল।

পথ আমাকে সে বলছিল বটে, কিন্তু আমি মধুদাকে সেটা মন দিয়ে শোনার জন্যে ইশারা করলাম। কারণ এ-অঞ্চলের পথঘাট তো আমি কিছুই চিনি না।

গুণিন বলল, পাহাড়ি পথে উত্তরদিকে মাইলখানেক নেমে গেলে একটা ঝরনা দেখতে পাওয়া যাবে। ঝরনাটার নাম টমক। এককালে নামের একটা কাঠের ফলক লাগানো ছিল, কিন্তু প্রকৃতির রোষে সে আর নেই। তবে ঝরনাটা চেনার পথ হল, ওর ঠিক পাশেই তিনটে উঁচু-উঁচু পাথর আছে—ঠিক যেন তিন ভাই। ওই তিন পাথরের কোল ঘেঁষে নীচের দিকে বয়ে গেছে ঝরনাটা। ঝরনার মুখটা গাছপালা আর ঝোপে ঢাকা। সেসবের আড়াল ডিঙিয়ে ঝরনায় পৌঁছতে হবে।

ঝরনা যেদিকে বয়ে গেছে সেখানে দেখা যাবে এক বিশাল গহ্বর—অনেকটা সুড়ঙ্গের মতো—পাক খেয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। সেই অন্ধকার পথ ধরে অনেকটা গেলে—প্রায় পাতালের কাছাকাছি—দেখা পাওয়া যাবে পাতালদেবতার। তবে আমরা সেখানে যেতে পারব না। কারণ, গেলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু যদি আমাদের সঙ্গে এমন কেউ থাকে যে পাতালদেবতাকে ভয় পায় না, তা হলে আর কোনও চিন্তা নেই।

সবই তো বুঝলাম, কিন্তু পাতালের সেই অপদেবতাকে বিনাশ করা যাবে কীভাবে?

এ-কথা জিগ্যেস করতেই গুণিন একচোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড কী যেন চিন্তা করল। তারপর চোখ খুলে ধীরে-ধীরে বলল, ওই আঁধার পাতালে একটা ঝকঝকে সবুজ পাথর আছে—তার সঙ্গে আছে একটা পুঁথি। পাতালদেবতা এগুলো যখের মতো পাহারা দেয়। ওই পুঁথি আর পাথর হল অপদেবতার প্রাণ। যদি ও-দুটো জিনিস কেউ ধ্বংস করতে পারে, তবেই অপদেবতার বিনাশ হবে। কিন্তু যে-সে লোকের পক্ষে ওগুলো নষ্ট করা সম্ভব নয়। এমন কাউকে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে যাকে পাতালদেবতা আক্রমণ করতে পারবে না।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার প্রিয়বরণের কথা মনে পড়ল। আমার কথায় প্রিয় নিশ্চয়ই ঝুঁকি নিতে রাজি হবে।

গুণিন আমার ভাবনা বোধহয় টের পেল। কারণ সে বলে উঠল, 'ভালো বন্ধু পেয়ে গেছিস বলে তোরা এখনও টিকে আছিস—নইলে কবে খতম হয়ে যেতি।'

গুণিনের ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হল না। বুকের ভেতরে যে-অজানা ভয়

একটা চাপ তৈরি করছিল সেটা যেন হঠাৎই খানিকটা ফিকে হয়ে এল।

সময় কীভাবে কেটে যাচ্ছিল খেয়াল ছিল না। হঠাৎই আকাশ থেকে গুড়গুড় শব্দ শোনা গেল। মেঘ ডাকছে। তবে শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হবে কি না কে জানে!

ওপরদিকে চোখ তুলে তাকালাম। নীল আকাশ ঢেকে যাচ্ছে ছাইরঙা মেঘে।

গুণিন বাঁ-হাতটা ওপরে তুলল ঃ 'মেঘের ডাকের সঙ্গে সুর মেলাএ বলি। তু কতদুর থেকে এসেছিস বাপটার কথা জানতে—খোতরা হেলাপেলা করে। তোকে মোর সব দেব। যা ক্ষমতা সব। আমার বাপকে এই পাতালদেব্‌তা খেয়েছিল—হাড়-মাস সব...।'

এ-কথায় আমি রীতিমতো কেঁপে উঠলাম। গুণিন বলে কী! গুণিনের সঙ্গে আমার এত মিল! তাই কি সে আমার মনের সব কথা বুঝতে পারছে?

আমার শরীরটা শিরশির করে উঠল।

এ কী অলৌকিক খেলা! কী অপরূপ সৌভাগ্য আমার! স্বর্গলোকের পুষ্পবৃষ্টির মতো সাহায্য আর সহানুভূতির স্বর্ণকণিকা ঝরে চলেছে আমার ওপরে। মিহিরদা, মধুসূদন, প্রিয়বরণ, ঝিমলি, আর সবশেষে এই গুণিন—ওরা সবাই আমাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আমি গুণিনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করলাম ঃ 'আশীর্বাদ করুন, বাবা....।'

আমার বাপির কথা মনে পড়ল। মায়ের কথাও।

গুণিন এবার ডানহাতের তালু উঁচিয়ে ধরল আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। অচেনা ভাষায় সুর করে কীসব মন্ত্র পড়ল। তারপর বলল সবচেয়ে ভয়ংকর কথা।

'মোর মুখের এই কাটা-ছেঁড়া, একটা মরা চোখ, এই হামান-ছেঁচাও দেহ্—সব ওর কাজ, ওর কীর্তি। বলেছিলাম শোধ নিব। আজ আরাম লাগছে। তুই পারবি...শোধ নিতে পারবি...।'

অনেকক্ষণ ধরে এই কথাগুলো বারবার আওড়ে গেল গুণিন।

গুণিনের গলা ক্রমেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে আসছিল। তার একটা চোখ কেমন আর্তভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল। মরুভূমিতে দীর্ঘ দিন জল-না-পাওয়া পথচারী যেভাবে একবোতল জলের দিকে তাকায়।

আকাশে আবার মেঘ ডাকল।

গুণিন থুতনি তুলল কালো পাথরের ওপর থেকে। বাঁকাচোরা শরীরটাকে কষ্ট করে ঘস্‌টে-ঘস্‌টে নিয়ে চলল গুহার মুখের দিকে। তখনও সে মিহি গলায় বিড়বিড় করে কীসব বলছিল।

গুণিন গুহার ভেতরে ঢুকে যেতেই মধুসূদন সেদিক লক্ষ করে গড় হয়ে প্রণাম

করল। আর ঠিক তখনই মিহি ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে শুরু করল ওপর থেকে।

মধুসূদন কাঠের পা টেনে-টেনে আমাদের কাছে এসে বলল, 'দিদিমণিরা, চলুন—।'

একটু চুপ করে থাকার পর মধুদা আমাকে বলল, 'তোমাকে দেখে বাবা খুব খুশি হয়েছে।'

আমি মনে-মনে চিন্তার জট ছাড়াচ্ছিলাম। তাই মধুদার কথার কোনও জবাব দিলাম না। তবে লক্ষ করলাম, মধুদা অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর নজরে শ্রদ্ধা আর ভক্তি ঝরে পড়ছে।

ঝিমলি আমার পোশাকে টান মেরে জানতে চাইল, 'কী রে, এখন কী করবি?'

আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। তাই প্রথমবারে ঝিমলির প্রশ্ন আমার কানে ঢোকেনি। ও দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করতেই আনমনা সুরে বললাম, 'টমকের খোঁজ করব। খোঁজ পেলে ওই সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকব, পাতালদেবতার সঙ্গে দেখা করব...।'

ঝিমলির বোধহয় মনে হল আমি নেশার ঘোরে কথা বলছি। তাই আমার গায়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে ও বলে উঠল, 'কীসব উলটোপালটা বলছিস! ফিরে চল —ওখানে গিয়ে আর কাজ নেই। মিহিরদা চিন্তা করবে—।'

আমি 'উঁ' করে একটা অস্পষ্ট শব্দ করলাম। তারপর আমরা তিনজনে গাড়ির খোঁজে রওনা হলাম।

এখন বাতাস বইতে শুরু করেছে। গাছের পাতারা আবার কথা বলতে শুরু করেছে। বৃষ্টিটা আরও কমজোরি হয়ে মিহি পাউডারের গুঁড়োর মতো আমাদের গায়ে ভেসে আসছে। তারই মধ্যে কোন এক ফাঁকফোকর দিয়ে একফালি সূর্য বেরিয়ে পড়ল। একটা অপরূপ আলো ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে, বনাঞ্চলে। সেই মায়াময় আলোয় হেঁটে যেতে-যেতে বাপির মুখটা সহসা আমার চোখের সামনে চলে এল।

গাড়ির কাছাকাছি এসে মধুদাকে বললাম, 'এখন আমরা টমকের দিকে যাব, মধুদা। তুমি তো গুণিনের কাছে পথ বুঝে নিয়েছ...।'

মধুদা কেমন যেন অবাক চোখে আমাকে দেখছিল। আমি ওর অবাক হওয়ার কারণ বুঝতে পারছিলাম।

মধুদা আমাকে বলেছিল, গুণিন সবসময় কথা বলে না—চুপ করে থাকে। খেয়ালখুশি হলে কাউকে কিছু দেয়। কিন্তু আজ গুণিন যেরকম প্রগলভ হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, তাতে মধুদা স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

অবাক আমিও হয়েছি।

গুণিনের বাবা এই অপদেবতার হাতে খতম হয়েছে—আমার বাপির মতো।

আর গুণিন নিজেও সেই ভয়ংকরের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। নেহাতই হয়তো প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় এই বিকৃত শরীর নিয়ে এত কষ্ট করে এখনও বেঁচে আছে। আমার মতো সমব্যথী কাউকে সে হয়তো মনে-মনে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এমন একজন, যার মধ্যে প্রতিশোধের জেদ আর আগুন লকলক করছে।

নিজেকে এরকম ভাবতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আসলে বোধহয় আমি তাই।

গুণিন তার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে আমাকে তার ডেরায় টেনে নিয়ে এসেছে। হয়তো তার মতন করে বুঝেছে আমার মনের সাধ। তাই এত কথা বলেছে আমার সঙ্গে। আর শেষে বলেছে ওই সর্বনেশে কথাগুলো ঃ '...আজ আরাম লাগছে। তুই পারবি...শোধ নিতে পারবি...।'

গাড়িতে উঠে আমি মধুদাকে বললাম, 'মধুদা, গণপতিকে টমকে যাওয়ার পথ বুঝিয়ে দাও—।'

ঝিমলি বলল, 'অন্তরা, আজ থাক। কাল মিহিরদাকে সঙ্গে নিয়ে তারপর যাব—।'

আমি ঘাড় ফিরিয়ে ঝিমলির দিকে একবার তাকালাম শুধু—কোনও কথা বললাম না।

আমার তাকানোয় ঝিমলি কেমন অস্বস্তি পেল। ওর ভিতু মন আমার কাছে বোধহয় ধরা পড়ে গেছে। ও চোখ সরিয়ে নিল। হাতে হাত বুলিয়ে বৃষ্টির জল মুছতে লাগল।

ততক্ষণে আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মধুসূদনের কথামতো গণপতি উত্তরদিকের পাহাড়ি পথের ঢাল বেয়ে ধীরে-ধীরে নেমে চলেছে।

বৃষ্টি এখন থেমে গেছে। গাছপালায় ঘোলাটে রোদ। পথের ধারে ঝোপের পাশে দুটো কাঠবেড়ালি চোখে পড়ল। কালচে রঙের একটা বড়সড় সাপও দেখতে পেলাম।

এগুলো দেখাটা শুভ না অশুভ কে জানে!

প্রায় মিনিট-পনেরো গাড়ি চলার পর মধুদা বলল, 'দিদিমণি, আমরা এসে পড়েছি। তবে গাড়ি বোধহয় আর যাবে না। খানিকটা পথ আমাদের হাঁটতে হবে।'

দেখা গেল সত্যিই তাই।

গণপতি মধুদার কথায় গাড়ি থামাল। ঝোপঝাড়ে ঠাসা একটা খাঁজের মধ্যে গাড়ির নাক ঢুকিয়ে দিয়ে কোনওরকমে গাড়িটাকে সাইড করল।

আমরা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। গাছপালার আড়ালের মধ্যে ঢুকে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চললাম। মধুসূদন বারবার পেছন ফিরে তাকিয়ে

আমরা তিন ভাইকে দেখতে পেলাম।
বিশাল পাথর—পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।
রের আনন্দে আমার বুক নেচে উঠল। সেইসঙ্গে ভয়
নেই। প্রিয়বরণও নেই।
গুলোর চারপাশটা ঘন গাছপালায় ঢাকা। কিন্তু জলের
শব্দ আমাদের কানে এল।
ঝিমলিকে কিছু একটা বলতে যাব, ঠিক তখনই চারজ
জঙ্গলের আড়াল থেকে।

॥ তেইশ ॥

থাটা আমার মনে হল, চারজন লোককে একইরক
ওদের একইরকম দেখতে নয়।
ওদের যে একে অপরের জেরক্স কপি মনে হচ্ছিল,
। দ্বিতীয় কারণ ওদের গায়ের রং। আর তিন ন

সাদা হাফশার্ট। একটু ময়লা গোছের।
কালচে রঙের ফুলপ্যান্ট। দেখে সস্তা বলেই মনে
রং বেশ কালো। তবে তাতে একটা চকচকে ভ
খের ভাব মরা মাছের মতো। চোয়াল শক্ত করে
হাড়টা উঁচু হয়ে রয়েছে। চোখ ছোট-ছোট। অথচ
ায় অভিসন্ধি।
ভয় পেয়ে গেল। বোধহয় পড়ে যাচ্ছিল, একটা
গলা তুলে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার? কী চাই
গলা কেঁপে গেল। মধুদা ভয় পাওয়া চোখে আম
আমরা কোনও কথা বলতে পারলাম না। তবে
যেন শুকিয়ে গেছে। আর ঝিমলির দিকে তাকিয়ে বু

লোক আমাদের সামনে অর্ধবৃত্তের ঢঙে দাঁড়িয়ে।

একজন একটা সরু গাছের ডাল নিয়ে তার ডগাটা চিবোচ্ছিল—অনেকটা নিম-দাঁতনের মতো।

মধুদা আবার ভাঙা গলায় জিগ্যেস করল, 'কী—কী চাই তোমাদের?'

এই প্রশ্নের উত্তরে চারজনের মধ্যে তিনজন লোক একটু-একটু করে পিছিয়ে গেল। অন্তত পাঁচ-ছ'হাত করে পেছোনোর পর ওরা এক-একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর যে-লোকটা দাঁতন করছিল সে শুধু এগিয়ে এল আমাদের আরও কাছে। আমার দিকে তাকিয়ে থু-থু করে ডালের চোঁচ ছিটকে দিল। তারপর দাঁতের পাটি বিকশিত করে হাসল।

আমি ভয়ে একটু পিছিয়ে গেলাম।

লোকটা ঠোঁট ছুঁচলো করে চুমু খাওয়ার মতো 'চুক' শব্দ করল। তারপর আমাকে লক্ষ করে মেয়েলি ঠমকে কটাক্ষ হানল। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে অদ্ভুত এক শব্দ করল ঃ 'উঁ-উ। উঁ-উ।'

শব্দের চরিত্রটা শরীরের লোভে কাতর কোনও পশুর মতো।

আমি ভয় পেয়ে ঝিমলির হাত আঁকড়ে ধরলাম। ডুকরে উঠলাম চাপা গলায়।

কিন্তু ঝিমলি আমাকে ভরসা দেবে কী, ও নিজেই তখন ভয়ে পাথর।

লোকটা আমার আরও কাছে এগিয়ে এল। এত কাছে যে, হাত বাড়ালেই ও আমাকে ছুঁতে পারে।

আমার গা-ঘিনঘিন করে উঠল। বুঝতে পারছিলাম, আমার শরীর কাঁপছে।

লক্ষ করলাম, লোকটার গলায় কালো সুতোয় বাঁধা সেই লকেট। ওর বাকি তিন সঙ্গীর গলাতেও বোধহয় একই লকেট ঝুলছে—দূর থেকে সেটা চোখে পড়ছে না।

মনের যত সাহস অতিকষ্টে একজায়গায় জড়ো করে শক্ত গলায় বলতে চাইলাম, 'এসব কী হচ্ছে? কী চাই আপনাদের?'

আমার গলাটা এত ভাঙা এবং কর্কশ শোনাল যে, আমি নিজেই বেশ অবাক হয়ে গেলাম।

লোকটা আমার প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে হাসল। ঘাড় ঘুরিয়ে তিনসঙ্গীর দিকে একপলক করে তাকাল।

তারপর আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে আচমকা মাথা নেড়ে ঢং করল, শরীর নোংরাভাবে দুলিয়ে চোখ নাচিয়ে আবার আগের শব্দটা করল ঃ 'উঁ-উ। উঁ-উ।'

ঝিমলি হঠাৎই যেন গলার হারানো স্বর ফিরে পেল। অনুনয়ের সুরে বলল, 'আমাদের ছেড়ে দিন—প্লিজ।'

লোকটা আগের মতোই শব্দ না করে হাসল। হাতের কচি ডালটা ঢং করে ছুঁড়ে দিল ঝিমলির গায়ে। বলল, 'মিষ্টি। তোরা মিষ্টি।'

লোকটার কথা বলার ন্যাকা মেয়েলি সুর আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। ওর ঠান্ডা স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কেমন যেন হিপ্‌নোটাইজ্‌ড হয়ে যাচ্ছিলাম।

ওর কাটা-কাটা মুখ-চোখ, শক্তিশালী হাতের পেশি, ধুলোমাখা পা—সবই আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলাম। যেন এ ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।

লোকটাও আমাকে দেখছিল। নাকি বলব, চাটছিল। আমার শরীরের এক বর্গ ইঞ্চিও ওর নজরের বিষ থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। আমি পায়ে ঝিঁঝি ধরার মতো একটা চিনচিনে অনুভূতি টের পাচ্ছিলাম সারা শরীরে।

লোকটা এবার হাত বাড়াল আমার দিকে। ওর এগিয়ে আসা ডানহাতের ডগায় আঙুলগুলো কাঁকড়াবিছের দাঁড়ার মতো নড়ছিল। স্পর্শকাতর হয়ে আকুলিবিকুলি করছিল।

মধুসূদন একটু দূরে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো সবকিছু দেখছিল। ওর চোখে অক্ষমের আক্রোশ। হয়তো মধুদা হারানো পা আর যৌবনের কথা ভাবছিল।

কোনও একটা গাছের আড়াল থেকে কোকিল ডাকল, 'কু-উ, কু-উ...।'

আমার সামনের লোকটা সেই ডাক নকল করে ডেকে উঠল, 'উঁ—উ।' ডাকের তালে-তালে শরীরটাকেও সামনে-পেছনে দোলাল।

লোকটার ঠোঁট সামান্য ফাঁক করা—দাঁত দেখা যাচ্ছে। আর চোখে কামজর্জর হাসি।

জানি না কোকিলটা আমাদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে ডেকে উঠেছিল কি না। কিন্তু এই নির্জন জঙ্গলে ওর ডাকে যে কোনও কাজ হবে না সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না আমার।

চারপাশটা বড় বেশি নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যা হতে চলেছে তা স্রেফ আমার হঠকারিতার ফল। এই অভিযানে ঝিমলিকে সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি বলে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল।

শেষ পর্যন্ত লোকটা আমার গায়ে হাত দিল।

আঙুল বাড়িয়ে আমার চিবুক ছুঁল ও।

মনে হল, পাঁচ পা-ওয়ালা একটা কালো মাকড়সা হেঁটে বেড়াচ্ছে আমার চিবুকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গর্জন শুনলাম আমি।

কোনও মানুষের মুখ থেকে যে এইরকম শব্দ বেরোতে পারে তা ভাবা কঠিন। যদি আবার সেই মানুষটা বৃদ্ধ হয়, চেহারা রোগা-সোগা হয়, এবং তার

একটা পা না থাকে।

আদিবাসী যোদ্ধার রণহুঙ্কারটা বেরিয়ে এসেছে মধুদার মুখ থেকে।

মধুদার দিকে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মা-দুর্গার ত্রিশূলের মতো হাতে একটা অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছে মধুসূদন। অস্ত্রটা ওর কাঠের পা।

একপায়ে দাঁড়িয়ে কালো মানুষটা ডানহাতে কাঠের পা-টা উঁচিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ফ্রিজ শটের মতো স্থির হয়ে আছে।

ওই অবস্থায় মধুদাকে দেখে বনদেবতা বলে মনে হল আমার।

সেই বনদেবতা একপায়ে লাফাতে-লাফাতে অস্ত্র উঁচিয়ে ধেয়ে এল আমার অপমানকারীর দিকে। গর্জে উঠল আবার ঃ 'ছেড়ে দাও দিদিমণিকে!'

আমার সামনে দাঁড়ানো শয়তানটা এই অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে কয়েক মুহূর্ত ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই ওর শয়তানী হিংস্র সত্তাটা সামনে চলে এল। ক্রূর চোখে মধুদার দিকে তাকিয়ে ও রুখে দাঁড়াল।

ওর সঙ্গী তিনজন গাছে ঠেস দিয়ে যেমন নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল।

মধুদা কাঠের পা-টা চালিয়ে দিল লোকটার মাথা লক্ষ করে। ওর মাথার সঙ্গে কাঠের সংঘর্ষ হল। চোখের পলকে কপালের একপাশটা ফেটে গিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল।

কিন্তু লোকটা যেন পাথরের মূর্তি। বলতে গেলে ও একরকম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই মধুদার 'লাঠি'র বাড়িটা খেল। এমনকী ওর যে কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে, সেটাও যেন হুঁশ নেই।

সংঘর্ষের ঝাঁকুনিতে মধুদার হাত থেকে কাঠের অস্ত্রটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও নিরস্ত্র মধুদা শূন্যে ঝাঁপ দেওয়া লোকের মতো আঁকুপাঁকু করতে-করতে আমার শত্রুর গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ল। চেষ্টা করল দু-হাতে আঁচড়ে-কামড়ে ওকে কাবু করে দিতে।

এতক্ষণে শত্রুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

শত্রু দাঁত বের করে হাসল—নিঃশব্দ হিংস্র হাসি। তারপর ডানহাতটা তুলে মধুদার টুঁটি টিপে ধরল। মধুদাকে ঠেলে দিল দূরে, কিন্তু হাতের বাঁধন ছাড়ল না।

বাপির কথা মনে পড়ে গেল আমার। 'ডব্লিউ ডব্লিউ ই' প্রোগ্রামে বাপি যখন লড়াই দেখত তখন মাঝে-মাঝেই আমাকে ডেকে বিভিন্ন যোদ্ধার নানারকম মারপ্যাঁচ দেখাত। বলত, 'অন্তু, কুইক, দেখবি আয়—কীরকম স্পেশাল প্যাঁচ দিয়েছে!'

এইরকমই একজন পালোয়ানকে চিনিয়ে দিয়েছিল বাপি। তার নাম আন্ডারটেকার।

আন্ডারটেকারের স্পেশাল প্যাঁচ প্রতিপক্ষের টুঁটি টিপে ধরা। আন্ডারটেকারকে আমি বহুবার দেখেছি, স্রেফ টুঁটি ধরে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাহিল করে তারপর তাকে শূন্যে তুলে মেঝেতে প্রচণ্ড আছাড় মারছে। এবং সেখানেই লড়াই শেষ।

আমার সামনে দাঁড়ানো পাথরের মতো লোকটা মধুদাকে খানিকটা দূরত্বে ঠেলে দিলেও বজ্রশক্তিতে মধুদার টুঁটি টিপে ধরে রইল। ঠিক আন্ডারটেকারের মতো।

মধুদার চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছিল। চোখের তারা উঠে যাচ্ছিল কপালের দিকে। বুঝতে পারছিলাম, মধুদার এবার সাংঘাতিক কিছু একটা হয়ে যাবে।

আমি চিৎকার করতে চাইছিলাম, কিন্তু চোয়ালে যেন তালা লেগে গিয়েছিল। আর তার সঙ্গে গলা শুকিয়ে কাঠ।

কোকিলের ডাক শোনা গেল আবার ঃ 'কু-উ, কু-উ।'

মধুদাকে অবলীলায় ধরে রেখেই মুখ তুলে গাছের মাথাগুলোর দিকে তাকাল লোকটা। কোকিলের ডাকটা নকল করে ডাক ছাড়ল ঃ 'কু-উ। উঁ-উ।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। চোখে ন্যাকা দুষ্টুমির ভঙ্গি করে জিভ ভ্যাঙাল। শরীরটা সামান্য দুলিয়ে চাপা গলায় বলল, 'মিষ্টি—তোরা বড় মিষ্টি।'

কথাটা শেষ করেই মধুদার রোগা শরীরটাকে এক ঝটকায় পেছনে ছুড়ে দিল লোকটা।

মধুদা কামানের গোলার মতো ছিটকে গেল পেছনে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেল একটা গাছের গুঁড়িতে। এবং অসাড় হয়ে মাটিতে খসে পড়ে গেল।

গলা টিপে ধরা হাঁসের মতো একটা চাপা শব্দের টুকরো বেরিয়ে এল ঝিমলির ঠোঁট চিরে।

লোকটা হিংস্রভাবে থুতু ছেটাল মাটিতে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মধুদার সুর নকল করে ন্যাকা গলায় বলল, 'ছেড়ে দাও দিদিমণিকে! ছেড়ে দাও দিদিমণিকে!'

তারপর আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে হাততালি দিয়ে হাত ঝাড়ল ঃ 'লড়াই খতম। এবার তোর আর আমার ঝটাপটি শুরু—।'

লোকটার মুখটাকে ক্লোজ-আপে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।

ওর মুখে ঘামের ফোঁটা আর লোভ চকচক করছে। মুখের একপাশে রক্তের দাগ। জুলজুলে চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

লোকটা প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল, 'এতবার আমরা মানা করেছি। ফোনে কতবার ভয় দেখিয়েছি। তবু শুনলি না!'

কথাটা শুনে আমি শিউরে উঠলাম। আমরা কি তাহলে সত্যি-সত্যি এবার হানা দিতে পেরেছি ওদের পরম গোপনীয়তায়! তাই এই হিংস্র লোকগুলো আমাদের শাস্তি দিতে এসেছে!

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমাদের ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাস! এত সাহস! এখন তোদের ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে।'

লোকটা হঠাৎই ছোবল মেরে আমার ওড়না খামচে ধরল। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওড়না দিয়ে ওর মুখের রক্ত আর ঘাম মুছে নিল। তারপর ওড়নার সেই অংশটা মুঠো করে ছুড়ে মারল আমার মুখের ওপরে।

আমি ঘেন্নায় মুখ সরিয়ে নিতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। ওর ঘামের গন্ধ, রক্তের গন্ধ ঢুকে পড়ল আমার নাকে।

আমার চোখে জল এসে গেল। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হল।

লোকটা এবারে আমার গালে হাত দিল, আলতো করে হাত বোলাতে লাগল। আর মুখে ছোট্ট করে শব্দ করতে লাগল ঃ 'উঁ-উ। উঁ-উ...।'

আমি সিঁটিয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। ঝিমলির ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার শব্দ পেলাম। কিন্তু আমি সেদিকে তাকাতে পারলাম না। আমার চোখ লোকটার মুখের দিকে স্থির। যেন ওর দিক থেকে চোখ সরালেই আমি বিপদে পড়ব।

অলৌকিকে আমি কখনও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু বাপির ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার পর আমি বুঝতে পেরেছি, আমার আগের ধারণায় ভুল ছিল। লৌকিক যেখানে শেষ, সেখান থেকেই অলৌকিকের শুরু। গত কয়েকদিন ধরে আমরা অলৌকিকের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলে চলেছি।

যদি তা-ই সত্যি হয়, তা হলে এখন, এই বিপদের মুহূর্তে, অলৌকিক কিছু ঘটে গিয়ে আমাদের কেউ রক্ষা করছে না কেন? কেন চারপাশের এই বিশাল গাছগুলো আচমকা ভেঙে পড়ছে না এই শয়তানগুলোর মাথায়? কোনও দেবতা কি অপদেবতা কেন শুনতে পাচ্ছে না আমাদের নীরব প্রার্থনা? কেন দেখছে না আমাদের হেনস্থা আর চোখের জল?

এমনসময় মোটরবাইকের শব্দ আমাদের কানে এল।

শব্দটাকে এই মুহূর্তে স্বর্গীয় বলে মনে হল আমার।

স্বর্গীয় বলে মনে হওয়ার কারণ শব্দটা ক্রমশ আমাদের কাছে এগিয়ে আসছিল।

তা ছাড়া, সব মোটরবাইকের শব্দ একইরকমের মনে হলেও তাদের মধ্যে কিছু ফারাক থাকে, শব্দগুলোর মধ্যেও থাকে নিজস্ব চরিত্র। ঠিক মানুষের পায়ের শব্দের মতন।

সেইজন্যেই এই মোটরবাইকের শব্দটা আমি চিনতে পারলাম।

প্রিয়বরণের মোটরবাইক।

জঘন্য ঘিনঘিনে লোকটা আমার গালে আঙুল বোলাচ্ছিল আর মোটরবাইকটা আমাদের আরও, আরও কাছে এগিয়ে আসছিল।

আমার গালে একটা আরশোলা কিংবা শুঁয়োপোকা রোঁয়াওলা পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। ঘেন্নায় গা-শিরশির করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোটরবাইকের শব্দ শুনে আমার চোখে বোধহয় কোনও আশার ঝিলিক বিদ্যুতের মতো চমকে উঠেছিল। কারণ, ঝিমলির দিকে চোখ পড়তেই সেটা আমি টের পেলাম। অকূল পাথারে ডুবে যাওয়া মানুষ আচমকা কোনও জাহাজ দেখতে পেলে যেভাবে আকুল হয়ে ওঠে, ঝিমলির চোখে সেই তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি। হয়তো আমার চোখের সংকেত পড়ে নেওয়ার পরক্ষণেই ও নিজেও প্রিয়বরণের বাইকের শব্দ চিনতে পেরেছে।

আড়চোখে ঝিমলির দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ আমার মায়া হচ্ছিল। ওর ফরসা লম্বাটে করুণ মুখে কোনও উচ্ছল আলো নেই—যেমনটা সবসময় থাকে। তার বদলে চোখের কোণ থেকে অশ্রুর রেখা গড়িয়ে পড়ছে। তার সঙ্গে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

সব মিলিয়ে শুধু বিষণ্ণতা আর হতাশা।

কিন্তু এখন ওর নিষ্প্রাণ চোখ দুটোয় প্রাণ ফিরে এসেছে। কারণ, প্রিয়বরণ আসছে।

সেই মুহূর্তে আমার এটা মনে হয়নি যে, প্রিয়র চেহারা রোগা, দুর্বল—এই চার-চারটে মুশকো লোকের সঙ্গে ও শক্তিতে কিছুতেই পেরে উঠবে না।

এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

বাইকের শব্দটা আমাদের খুব কাছাকাছি এসেও আবার যেন দূরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হল।

ঝিমলিরও বোধহয় সেটা মনে হয়েছিল। কারণ, ও সরু তীক্ষ্ণ গলায় 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল। ওর ছিপছিপে শরীরের ভেতরে যে এত তেজি চিৎকারের ক্ষমতা লুকিয়ে আছে সেটা আমি কখনও কল্পনাও করিনি।

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন লোকের মধ্যে দুজন চিৎকারের চোটে চোখ বুজে মুখ কুঁচকে কানে আঙুল দিল। আমার সামনে দাঁড়ানো লোভাতুর শয়তানটাও ঝিমলির চিল-চিৎকারে স্পষ্ট কেঁপে উঠল।

আমাদের কাছাকাছি যদি কাচের জানলা কিংবা জিনিসপত্র থাকত, তা হলে ঝিমলির মিহি চিৎকারে সেগুলো নিশ্চয়ই ঝনঝন করে চুরমার হয়ে যেত।

ঝিমলির দ্বিতীয় চিৎকারটা আরও অবাক করার মতো।

তীব্রতায় চিৎকারটা প্রথম চিৎকারের চেয়ে আরও অনেক জোরালো। না, তাতে আমি অবাক হইনি। আমি অবাক হয়েছি এবার ও প্রিয়বরণের নাম ধরে চিৎকার করেছে বলে।

'প্রিয়ব-র-ণ! প্রিয়ব-র-ণ! বাঁচাও!'

কত সহজে ও অল্পদিনের চেনা এই ছেলেটার নাম ধরে ডেকে উঠল! অথচ

আমি পারিনি। যদি-বা পারতাম তা হলে তারপরই একটা অস্বস্তি আর সংকোচ কাজ করত আমার মনে।

মোটরবাইকের শব্দটা প্রায় থেমে গিয়েছিল ঝিমলির প্রথম চিৎকারের পরই। তবে দ্বিতীয় চিৎকারের পর ফটফট শব্দটা হঠাৎই জোরালো হল। তারপর গাঁকগাঁক শব্দ তুলে পাগলা হাতির মতো ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

বাইকের এই রাগী আওয়াজটা নিস্তব্ধ বনাঞ্চল একেবারে কাঁপিয়ে দিল। কয়েকটা পাখি ভয় পেয়ে গাছের আশ্রয় ছেড়ে ছিটকে উড়ে গেল আকাশে।

'প্রিয়বরণ' নামটা শোনার পরই আমার সামনে দাঁড়ানো লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওর তিন সঙ্গীর দিকে। চোখে-চোখে কিছু কথা হল যেন। কিন্তু ওরা খুব একটা ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না।

কারণ, প্রিয়বরণ একা, আর ওরা চারজন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রিয়বরণের রাগী বাইক ঝড়ের মতো ধেয়ে চলে এল অকুস্থলে—আমাদের একেবারে সামনে।

ধুলো আর শুকনো ঝরাপাতা বাইকের পেছনে অস্থির ঢেউ তুলে শূন্যে পাক খেয়ে ছুটে এল। কিছুক্ষণের জন্যে আমার দৃষ্টি আড়াল হয়ে গেল। শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম প্রিয়র বাইকের গোঁ-গোঁ শব্দ।

প্রিয় বোধহয় প্রথম নজরেই আমাকে দেখতে পেয়েছিল। আর আমার সামনে দাঁড়ানো লোকটাকেও। কারণ, ধুলোর পরদা সরে যেতেই প্রিয়বরণের মুখে যে-ভাব দেখলাম সেটা রাগ আর বিরক্তির।

এমন সময় আড়াল থেকে কোকিলটা ডেকে উঠল দুবার।

কিন্তু আমার কাছে দাঁড়ানো লোকটা ডাকটা আর নকল করল না। ও এতক্ষণ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিল প্রিয়বরণের দিকে। এবার ধীরে-ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে। উজ্জ্বল চোখ সাপের মতো ঠান্ডা, স্থির।

বাইক থেকে নেমে পড়ল প্রিয়বরণ। বাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিল। রুক্ষ জমিতে পড়ে থাকা মধুসূদনের অচেতন দেহটাও ওর নজরে পড়ল।

আমার আর ঝিমলির দিকে একপলক করে দেখে নিয়ে ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার কাছে।

প্রিয়বরণের গায়ে গোলাপি রঙের একটা ফুলশার্ট। পায়ে হালকা ছাই রঙের কটন প্যান্ট। কোমরে সরু বেল্ট। আর সঙ্গে ওর চিরাচরিত চড়া পারফিউমের গন্ধ।

প্রিয়বরণের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম।

এ কোন প্রিয়বরণকে দেখছি আমি!

ওর মুখ যেন পাথরে খোদাই করা। দু-চোখ থেকে ঝিলিক মারছে তীব্র রাগ। যেন শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েই ও চিরে ফেলবে আমার সামনে দাঁড়ানো শয়তানটাকে।

ও ধীরে-ধীরে পা ফেলে এগিয়ে আসছিল আমার কাছে, আর আমি যুদ্ধের দামামা শুনতে পাচ্ছিলাম।

গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি তিনটে লোককেও আমি লক্ষ করছিলাম। ওদের মধ্যে শুধু দুটো পরিবর্তন নজরে পড়ল।

ওরা গাছে হেলান দেওয়া আরামের ভঙ্গিটা ছেড়ে সামনে দু-তিন পা এগিয়ে এসেছে। আর ওদের মুখের নির্লিপ্ত আত্মবিশ্বাসী ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে খানিকটা সতর্ক ভাব দেখা দিয়েছে।

বাতাসের একটা ঢেউ বয়ে গেল হঠাৎ। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ভেসে বেড়ানোর পথে সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্যে আড়াল করে দিল।

প্রিয়বরণ আমার কাছাকাছি এসে নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'এখানে আপনারা কী করছেন, ম্যাডাম?'

ওর মুখে 'ম্যাডাম' শব্দটা এই মুহূর্তে যে কী অপূর্ব শোনাল কী বলব! অথচ আগে এই শব্দটা নিয়ে আমি আর ঝিমলি কত ঠাট্টাই না করেছি!

ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি কেঁদে ফেললাম। দম আটকে থাকা একটা চাপা কান্নার ঢেউ আমার বুকের ভেতর থেকে জলপ্রপাতের মতো ঝাঁপিয়ে হঠাৎই বাইরে চলে এল।

প্রিয়কে আমি কী যে বলতে চাইছিলাম জানি না। আমার সমস্ত কথা কান্নায় মিশে জড়িয়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। শুধু তীব্র কান্নার ঢেউটাই সত্যি হয়ে রইল। আমি অসহায়ের মতো হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

প্রিয় আমার খুব কাছে এসে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর সামনে আঙুল বাড়িয়ে আমার চোখের নীচ থেকে জল মুছে দিল।

সেই স্পর্শে কী যে অদ্ভুত আশ্বাস ছিল জানি না, কিন্তু আমার মন থেকে সমস্ত ভয় মুছে গেল। অথচ তবুও আমার কান্নাটা থামতে চাইছিল না।

আমার চোখের জল মুছে নিয়ে প্রিয় বলল, 'আর ভয় নেই। আমি দেখছি—।'

আমাদের প্রধান শত্রুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল প্রিয়বরণ, জিগ্যেস করল, 'কী চাই? ম্যাডামদের বিরক্ত করছ কেন?'

প্রশ্ন দুটো খুব স্বাভাবিক হলেও প্রিয়বরণের মুখে একটু যেন অস্বাভাবিক শোনাল। কারণ, কোথায় যেন অফিসের বড়বাবুর মতো একটা চাপা সুর মিশে ছিল সেখানে। ওর মুখের একটা পাশ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। কালো জড়ুলটাও

আমার নজরে পড়ছিল।

যে-প্রশ্নটা আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেটা হল, প্রিয় কি এই চারটে শয়তানের সঙ্গে পেরে উঠবে!

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা শত্রু প্রিয়বরণকে লক্ষ করে হাত চালাল।

সাপের মতো ক্ষিপ্রতায় প্রিয়বরণ লোকটার কবজি চেপে ধরল। লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলল, কিন্তু প্রিয়বরণকে নড়াতে পারল না, আর কবজির বাঁধন ছাড়াতেও পারল না।

দৃশ্যটা আমার অবিশ্বাস্য মনে হল।

রোগাপটকা প্রিয়বরণ এই দশাসই কালো জোয়ানটার সঙ্গে কেমন করে লড়ছে! ভেতরে-ভেতরে ওর তা হলে এত শক্তি!

শুধু আমি কেন, ঝিমলি আর লোকটার বাকি তিন শাগরেদও এই তাজ্জব দৃশ্যটা দেখছিল। যতই সময় যাচ্ছিল ওদের মুখের ভাব ততই বদলে যাচ্ছিল।

হিংস্র লোকটা মুখ বিকৃত করে প্রিয়বরণের দিকে আগুনঝরা চোখে তাকিয়ে ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, এই ল্যাকপ্যাকে ছেলেটার প্রতিরোধের সঙ্গে পেরে না ওঠায় একটা অপমানের জ্বালা ওর বুকে ধিকিধিকি আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। ওর কপাল থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত কখন যেন ছিটকে পড়েছে গায়ের সাদা শার্টে। ওই কটকটে রক্তের দাগ এই নীরব লড়াইটাকে একটা অন্য মাত্রা দিল।

লোকটা হঠাৎই অশ্রাব্য গালিগালাজ ছুড়ে দিল প্রিয়বরণকে। আর প্রিয় তক্ষুনি লাথি কষিয়ে দিল ওর তলপেটে। একবার নয়—পরপর তিনবার।

লাথি খেয়ে মুশকো লোকটার মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছিল। প্রিয়বরণ আচমকা লোকটা হাত ছেড়ে দিয়ে সপাটে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল ওর বাঁ-গালে। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে টাল খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গালাগালের বন্যা ছুটিয়ে তেড়ে এল প্রিয়বরণের দিকে।

আর প্রিয়বরণ এখন যেন অন্য মানুষ। মানুষ নয়, বিদ্যুৎ-অবতার। কারণ, ওর হাত-পা চালানোর গতি যেরকম দেখছিলাম তার সঙ্গে একমাত্র বিদ্যুতেরই তুলনা চলে।

কোথা থেকে ও এত শক্তি পেল কে জানে! এই মুহূর্তে যেন প্রথম বুঝলাম, রোগাসোগা চেহারাটা আসলে ওর ছদ্মবেশ।

বিদ্যুৎগতিতে লোকটার তলপেটে লাথি চালাল প্রিয়। লোকটা 'আঁক' শব্দ করে সামনে ঝুঁকে পড়তেই ওর চুলের মুঠি চেপে ধরল। তারপর পরপর দুটো

লাথি চালাল লোকটার দু-মালাইচাকি লক্ষ করে।

'ফট', 'ফট' শব্দ শোনা গেল দুবার। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে হাঁটু চেপে ধরে বসে পড়ল লোকটা—তারপর শুয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল। বোধহয় ওর একটা মালাইচাকি গেছে।

লাথি মেরেই এক-পা পিছিয়ে এসেছিল প্রিয়বরণ। ডানহাত শূন্যে তুলে কবজি নেড়ে ফুলশার্টের হাতাটা যেন ঠিক করে নিল। তারপর শরীরটাকে সামান্য পেছনে হেলিয়ে পরের আঘাতের জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

আমি আর ঝিমলি অবাক হয়ে প্রিয়বরণকে দেখছিলাম।

কে বলেছে এই দুনিয়ায় অলৌকিক বলে কিছু নেই! প্রিয়বরণের এই কর্মকাণ্ডের কাছে খঞ্জের গিরিলঙ্ঘনও বোধহয় তুচ্ছ ঘটনা। কারণ, লড়াইটা যেভাবে শুরু হয়ে শেষ হওয়ায় কথা, হল তার ঠিক উলটোভাবে।

অন্তত লড়াইয়ের প্রথম ধাপটা।

যেখানে স্বাভাবিক প্রথা অনুযায়ী প্রিয়বরণের মেঝেতে পড়ে ছটফট করার কথা সেখানে শুকনো ঝরাপাতার বিছানায় শুয়ে হাঁসফাঁস করছে কালো মুশকো লোকটা!

তখনও আমরা জানি না, এই লড়াইয়ের আরও চমকদার, আরও অবিশ্বাস্য, একটা দ্বিতীয় ধাপ আছে।

সেটা শুরু হল বাকি তিনজন লোকের একজনকে দিয়ে।

সর্দারকে পড়ে যেতে দেখে বাকি তিনজন রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিল। তবে ঘাবড়ে গেলেও ওরা ভয় পায়নি। বরং ওদের মুখে একটা মরিয়া ভাব ফুটে উঠেছিল।

ওদেরই একজন চট করে পাশে সরে গিয়ে একটা বিশাল গাছের গুঁড়ির পেছনে হাত বাড়াল।

হাত যখন ফিরিয়ে নিয়ে এল তখন লোকটার মুঠোয় ধরা একটা তরোয়াল। ইতিহাসের রাজারাজড়াদের যেমন শৌখিন তরোয়াল সিনেমায় বা ছবিতে দেখা যায় এই তরোয়ালটা ততটা সুদর্শন নয়। তবে তারই অনুকরণে পাড়ার কামারশালায় তৈরি করা একটা অশোভন সংস্করণ।

তরোয়ালের হাতলটা লোহার ওপরে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে তৈরি। আর বাঁকানো ফলার লোহার রং বেশিরভাগটাই কালচে হলেও ফলার ধারালো দিকটা অসম্ভব ঝকঝকে। দেখেই বোঝা যায়, রাজারাজড়াদের তরোয়ালের তুলনায় এই অস্ত্রটা লাবণ্যহীন হলেও দক্ষতায় খুব একটা পিছিয়ে নেই। এই তরোয়ালের এক কোপে ধড় এবং মুন্ডু অনায়াসেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

তরোয়াল উঁচিয়ে লোকটা যখন 'যুদ্ধং দেহি' ঢঙে রুখে দাঁড়াল তখন ওকে

অনেকটা ইতিহাস বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা ছবির মতো দেখাল।

কালো শরীরের সঙ্গে মানিয়ে গেছে কালো তরোয়াল। শুধু সাদা শার্ট, তরোয়ালের ফলা, আর সামনের পাটির কয়েকটা সাদা দাঁত ঝকঝক করছে।

তরোয়াল হাতে লোকটা খুব সাবধানে পা ফেলে প্রিয়বরণের দিকে এগিয়ে এল।

এতক্ষণ লড়াই করে প্রিয়বরণ বেশ হাঁপাচ্ছিল। শার্টের আড়াল থাকা সত্ত্বেও ওর পাতলা বুকের ওঠা-নামা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই ও ঘাড় ঘুরিয়ে তেরছা নজরে নতুন শত্রুর দিকে তাকিয়ে ছিল, তার এগিয়ে আসা দেখছিল।

আমি প্রিয়বরণের জন্যে ভয় পাচ্ছিলাম। আমাদের বাঁচাতে গিয়ে ও চরম বিপদে পড়বে না তো!

একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ অবাক লাগছিল ঃ লড়াই শুরু করা ইস্তক প্রিয় একটি কথাও বলেনি, টুঁ শব্দটিও করেনি। শুধু নিঃশব্দে নিজের কাজ করে গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর অশ্রাব্য গালিগালাজও ওকে বিচলিত করতে পারেনি।

আমি ভয়ে আর উত্তেজনায় প্রিয়বরণের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলাম। ও ডানহাতের তর্জনী তুলে ইশারায় আমাকে থামতে বলল, কিন্তু ওর শত্রুর দিক থেকে চোখ সরাল না।

মাটিতে পড়ে থাকা সর্দার তখনও ছটফট করছিল, চাপা গলায় প্রিয়কে শাসাচ্ছিল, গালাগাল দিচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে প্রিয়র কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ও একমনে তরোয়াল-হাতে শত্রুর মাপজোখ নিচ্ছিল। আঁচ করতে চাইছিল প্রথম আঘাতটা ঠিক কীভাবে আসবে।

যখন লোকটা সত্যি-সত্যিই তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল তখন আমাদের সবাইকে অবাক করে প্রিয়বরণ কথা বলল।

'এখনও যদি না থামো, তা হলে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি। আমি যা-যা করব সবই দেবতার নির্দেশে করব। আমাকে যেন কেউ দোষ না দেয়...।'

এ কী অদ্ভুত ঘোষণা। কে কাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছে! এই ঝিকিয়ে ওঠা তরোয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে রোগাপটকা প্রিয় এখন নতুন কী করবে?

ওরা কেউই প্রিয়র কথার উত্তর দিল না। শুধু মাটিতে পড়ে ছটফট করা সর্দার চাপা গোঙানির স্বরে বলল, 'সালা, শয়তানের বাচ্চা!'

আর তরোয়াল উঁচিয়ে ধরা লোকটা চওড়া করে ঠোঁট বেঁকাল। ওর আরও কয়েকটা দাঁত দেখা গেল।

পরক্ষণেই বাতাস কেটে শিস তুলল তরোয়ালের ফলা। ওপর থেকে কোনাকুনিভাবে নেমে এল প্রিয়র দিকে।

প্রিয়বরণ চোখের নিমেষে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর মাথার ফুটখানেক ওপর দিয়ে ঝলসে গেল তরোয়ালের ফলা। ফলে মুণ্ডপাত হওয়া থেকে ও বেঁচে গেল।

কিন্তু ওর ডানহাতটা বাঁচল না।

প্রিয় চিত হয়ে পড়ে যাওয়ার সময় ওর ডানহাতটা যে-করে-হোক উঠে গিয়েছিল শূন্যে। তরোয়ালের শাণিত ফলা ওর কবজির কাছটা ছুঁয়ে চলে গেল।

তরোয়ালের ধার এতই ছিল যে, ওর গোলাপি শার্ট যে চিরে গেছে সেটা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। আর শার্ট চিরে গিয়ে যদি কবজির কাছটা কেটে গিয়েও থাকে, তরোয়ালের ধারের জন্যে প্রিয়বরণ সেটা তক্ষুনি টের পেল না।

প্রিয় শুয়ে পড়েছিল, আর একইসঙ্গে শত্রুর দু-পায়ে লাথিও মেরেছিল। ফলে তরোয়াল চালানোর প্রক্রিয়া শেষ হতে-না-হতেই ফলো থ্রু এবং প্রিয়র লাথি—এই দুইয়ের কম্বিনেশানে লোকটা সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

প্রিয় বিদ্যুৎগতিতে সরে গেল একপাশে। জঙ্গলের পাতায় খচমচ শব্দ হল।

লোকটা প্রিয়র পাশেই উপুড় হয়ে পড়ল, কিন্তু তরোয়ালটা ওর মুঠো থেকে মোটেই আলগা হল না। বরং ও আবার সেটা শূন্যে তুলে ধরল দ্বিতীয় আঘাতের জন্যে।

প্রিয়বরণের ফুলশার্টের ডান হাতাটা এবার লাল হয়ে যাচ্ছিল। লক্ষ করলাম, যন্ত্রণার ভাঁজ পড়েছে ওর মুখে।

সেটা দেখে ওর শত্রু খুশি হল। প্রথম আঘাতটা যে একেবারে ব্যর্থ হয়নি এই তথ্যটা তাকে একঝলক নতুন উৎসাহ জোগাল।

প্রিয়বরণ এবার যা করল সেটা ভারী অদ্ভুত।

ও একঝটকায় একটা পাক খেয়ে চলে এল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রায় গায়ের ওপরে। আচমকা চুমু খাওয়ার ভঙ্গিতে ওর মুখ চেপে ধরল লোকটার মুখে। ব্যাপারটা অনেকটা যেন জলে-ডোবা মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টায় 'মাউথ টু মাউথ' দেওয়ার মতন।

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা একটা ভয়ংকর আর্তনাদ করে উঠল। প্রবল বেগে হাত-পা ছুড়তে লাগল।

আর্তনাদের ধরনটা এমন যে, শরীরের মজ্জা পর্যন্ত শিউরে কেঁপে ওঠে, একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায় শিরায়-শিরায়। স্পষ্ট বোঝা যায়, এটা অবশ্যই কারও শেষ আর্তনাদ। এরপর পড়ে থাকে শুধু স্তব্ধতা আর শূন্যতা।

আর্তনাদের সঙ্গে-সঙ্গে হাতের তরোয়াল ছিটকে পড়েছিল। সারা শরীর প্রচণ্ড এক আক্ষেপে কুঁকড়ে গিয়েই আবার টান-টান হয়ে গেল। মাথাটা ঝটকা দিল

এপাশ-ওপাশ। যেন দম আটকে যাওয়া কোনও মানুষ একবিন্দু বাতাসের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

তারপরই সব শেষ।

প্রিয়বরণ মুখ সরিয়ে নিয়েছিল। খুব বেশি হলে পাঁচ সেকেন্ড ও লোকটার মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে ছিল। কিন্তু তাতেই যা কাজ হওয়ার হয়েছে—শত্রু খতম হয়েছে।

প্রিয়র মুখটা সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল। ও ক্লান্ত শরীরে হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে বসল। তারপর আমার দিকে তাকাল।

তখন বিকেলের আলোয় ওর হাঁ করা মুখের ভেতরে আমি যা দেখলাম তাতে আমার চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটা ওলটপালট হয়ে গেল। আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল থরথর করে। সারা শরীর ঘামতে লাগল। আর একটা বরফের সাপ পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল বুকের ভেতরে।

॥ চব্বিশ ॥

ব্যাপারটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম একপলকের জন্যে। কিন্তু যা দেখেছি তাতে ওই একপলকই যথেষ্ট।

আমার শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চোখ ছাড়া অন্য কোনও ইন্দ্রিয় আর কাজ করছিল না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছিলাম, যা দেখেছি সেটা অন্য কাউকে বলাও যাবে না। কারণ, ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব।

জানি না, বাপি এরকম কিছু দেখেছিল কি না। অথবা প্রিয়বরণের মতো কারও সঙ্গে বাপির পরিচয় হয়েছিল কি না।

প্রিয়বরণ এবার উঠে দাঁড়াল। তখনও সামান্য হাঁপাচ্ছিল।

আমার মুখের অবস্থা যে ফ্যাকাসে কিংবা ওইরকম কিছু হয়ে গিয়েছিল সেটা বুঝতে পারলাম প্রিয়র চোখ দেখে।

প্রথমে ওর চোখে ফুটে উঠেছিল আশঙ্কা—কোনও গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়। কিন্তু তারপরই ওর দৃষ্টিতে চলে এসেছিল নীরব অনুনয়। ও কোনও কথা না বললেও আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম ওর আলতো ফিসফিসে স্বর ঃ 'কাউকে যেন বলবেন না, ম্যাডাম। প্লিজ।'

চোখের সামনে যে-দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিলাম তার দিকে পুরোপুরি মন লাগিয়ে

আমি প্রিয়বরণের মুখের ভেতরের দৃশ্যটা ভুলতে চাইছিলাম।

বাকি দুজন শত্রু পায়ে-পায়ে পেছিয়ে গিয়ে কখন যেন দুটো গাছের গুঁড়িতে আবার হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ বড়-বড় করে শুকনো গাছের পাতার বিছানায় শুয়ে থাকা সঙ্গী দুজনকে দেখছে। ওদের মুখের ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ওরা আর লড়াই করবে না। তবে এই মুহূর্তেই ছুটে পালাবে কি না তা নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে।

মাটিতে পড়ে থাকা সর্দার কোনওরকমে শরীরটাকে পাশ ফিরিয়ে একটু দূরে পড়ে থাকা অসাড় সঙ্গীকে দেখছিল।

সঙ্গীর স্বাস্থ্যবান দেহটা চিত হয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। যেন ভীষণ অবাক হয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখছে।

প্রিয়বরণ পকেট থেকে রুমাল বের করে নিয়েছিল। সেটা ডানহাতের কবজির কাটা জায়গাটায় একহাতে বেঁধে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

আমি কিছু করে ওঠার আগেই ঝিমলি এগিয়ে গেল ওর কাছে। রুমালটা কবজিতে বেঁধে দিতে-দিতে জিগ্যেস করল, 'খুব জ্বালা করছে?'

প্রিয় যন্ত্রণায় চোখ কুঁচকে বলল, 'ভীষণ...।'

'তাড়াতাড়ি ফিরে চলুন। কোনও মেডিসিন শপে গিয়ে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে।'

প্রিয় ঘাড় নেড়ে বলল, 'হুঁ—।'

এমনসময় মাটিতে পড়ে থাকা সর্দার গর্জে উঠল, 'দেবতার থানের কাছে বিস্‌ওআস্‌ উড়িয়ে দিলি। মনে রাখিস, দেবতার দানে তুই বিসাল হয়েছিস। দেবতা তোর চেয়েও বড় বিসাল। তুই নিজেদের পরান নিলি! পুর্‌ঠা বলে দিচ্ছি—দেবতা শোধ লিবে। শোধ লিবে বটে!'

প্রিয়বরণ রুক্ষ চোখে সর্দারের দিকে তাকাল। ঝিমলির কাছ থেকে সরে গিয়ে ধীরে-সুস্থে সর্দারের কাছে গেল।

সর্দার প্রিয়কে চোখে-চোখে রাখছিল। তাই প্রিয় যখন ওর মাথার ঠিক পাশটিতে এসে দাঁড়াল তখন সর্দার চিত হয়ে প্রিয়র চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রিয় দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, 'প্রাণ নিলে প্রাণ আর ফেরত হয় না। মেয়েদের ইজ্জত নিলে সেটাও আর ফেরত দেওয়া যায় না। এ দুটো সমান। এটা বুঝে নাও—।'

এ-কথা বলেই ও সর্দারের মুখের ওপরে একদলা থুতু ফেলল। লোকটা মুখ সরাতে চেষ্টা করল, কিন্তু এড়াতে পারল না। দু-হাতে সেই থুতু মুছতে-মুছতে নোংরা গালাগালের ফোয়ারা ছোটাল।

প্রিয় সর্দারের প্রতিক্রিয়া গ্রাহ্য না করে বাকি দুই শাগরেদের দিকে দু-পা এগিয়ে

গেল। তীব্র চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে কেটে-কেটে বলল, 'দেবতার পুজো করলেই মেয়েদের ইজ্জত নেওয়ার লাইসেন্স পাওয়া যায় না। দেবতা এইসব বাজে লোকদের শাস্তি দেন।' ওদের সঙ্গীর মৃতদেহের দিকে ইশারা করল।

লোকদুটো ভয়ের চোখে তাকাল প্রিয়বরণের দিকে। ওদের মধ্যে একজন হোঁচট খাওয়া গলায় জানতে চাইল, 'ধুরমল... কী করে...মইরল? কী করে...মইরল...ধুরমল?'

প্রিয়বরণ বাঁ-হাতটা মাথার ওপরে তুলে ধরে বলল, 'সে দেবতা জানে। মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছটাং-পটাং করলে জানের ভয়। যাঃ—এখন পালা।'

আশ্চর্য! প্রিয়বরণের হুমকিতে লোকদুটো স্রেফ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

প্রিয় এবার ঘুরে তাকাল মাটিতে পড়ে থাকা সর্দারের দিকে। তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, 'এখানে পড়ে থাক সারারাত। যদি সাপে না কাটে, বনবেড়াল খুবলে না খায়, গোসাপ ছোবল না দেয়, তা হলে কাল সকালে লোক পাঠাব। তোকে তুলে নিয়ে গিয়ে সদর হাসপাতালে জমা করবে—।'

সর্দারের উত্তর শোনার জন্যে প্রিয় অপেক্ষা করল না। ও তাড়াতাড়ি আমার কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'ম্যাডাম, চলুন, আপনাদের সঙ্গে ফিরব—চটপট ফিরতে হবে। নইলে আর আধঘণ্টার মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে। ফেরার অসুবিধে হবে।'

আমি বললাম, 'আপনার বাইক?'

'ও পরে এসে নিয়ে যাব—।'

ঝিমলি বলল, 'মধুদার কী হবে?'

প্রিয় বলল, 'মধুসূদনকে আমি তুলে নিচ্ছি। আপনারা চলুন...।'

আকাশে আলো কমে আসছিল। সূর্য নীচে নামতে-নামতে গাছপালার আড়ালে চলে গেছে। দু-তিনরকম পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে একটা পাখির শিসের সুরেলা আওয়াজটা এমন, যেন মনে হল জানতে চাইছে, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?'

প্রিয় মধুদাকে কাঁধে তুলে নিল। মধুদার কাঠের পা-টা একটু দূরে অবহেলায় পড়ে ছিল। আমি ওটা কুড়িয়ে নিলাম।

আমরা জঙ্গলের পথ ধরে হাঁটা দিতেই পেছন থেকে সর্দারের কাতর চিৎকার শুনতে পেলাম, 'মোরে লিয়ে যা! বাঁচায়ে লিয়ে যা...!'

প্রিয়বরণ ফিরেও তাকাল না। চাপা গলায় বলল, 'দেবতা তোকে বাঁচাবে।'

আমরা রওনা হলাম। টমকের চাপা কুলকুল শব্দ ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল।

একটু পরেই আমরা টাটা সুমোর কাছে পৌঁছে গেলাম। আমাদের দেখে গণপতি তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে এল। আমি ওকে মাঝের দরজাটা খুলতে বললাম। দরজাটা খুলে ধরতেই প্রিয়বরণ মধুদাকে মাঝের লম্বা সিটটায় শুইয়ে দিল। তারপর গণপতির কাছ থেকে জলের বোতল চেয়ে নিয়ে মধুদার চোখে-মুখে জলের

ছিটে দিল। কিন্তু মধুদা সেটা টের পেল বলে মনে হল না।

প্রিয়র হাত থেকে জলের বোতলটা নিয়ে গণপতি পেছনের দরজাটা খুলে দিল আমাদের জন্যে। আমি আর ঝিমলি উঠে পড়লাম গাড়িতে। প্রিয় তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। দু-একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ও গণপতির পাশে বসার জন্যে গাড়ির সামনের দিকে রওনা হল।

ঝিমলি পেছনের দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, আমি ওর হাতে হাত রেখে ওকে থামালাম। তারপর ডাকলাম প্রিয়কে।

'প্রিয়, আপনি এখানে আসুন—আমাদের সঙ্গে বসবেন আসুন।'

আমার ডাকে প্রিয় থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল আমার দিকে।

ওর এই ঘুরে তাকানোটা স্লো-মোশান ছবির মতো আমি বারবার দেখতে পেলাম।

ওর চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি আমাকে কী যেন বলতে চাইল। সে-দৃষ্টিতে আমি আনন্দ, তৃপ্তি আর পূর্ণতা খুঁজে পেলাম। যদিও এই পূর্ণতা কাকে বলে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

প্রিয়র দৃষ্টিতে একইসঙ্গে ছিল কৃতার্থ ভাব। অসহ্য তাপতরঙ্গে ঝলসে যাওয়া মাটি বহুদিনের অপেক্ষার পর যখন অঝোরধারায় বৃষ্টির স্বাদ পায় তখন মাটির মনের অবস্থা যেমনটা হয় তেমন।

হতেই পারে। কারণ, এই প্রথম আমি ওকে নাম ধরে ডেকেছি।

প্রিয়বরণ চটপট চলে এল গাড়ির পেছনদিকে। উঠে বসল আমার পাশে। তারপর দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

টাটা সুমো চলতে শুরু করতেই ঝিমলি প্রিয়কে জিগ্যেস করল, 'ওই লোকটা হঠাৎ মরে গেল কেমন করে? ওকে কী করলেন আপনি?'

লক্ষ করলাম, প্রশ্নটা করার সময় ঝিমলির কপালে দুটো ভাঁজের রেখা ফুটে উঠেছে। আর চোখের ভাষাও সুস্বাগতম নয়।

অথচ মনে পড়ল, একটু আগে, আমাদের চরম বিপদের সময়, ঝিমলি প্রিয়বরণের নাম ধরে পরিত্রাহি চিৎকার করছিল।

বিপদের সময় যে-নামটা ধরে নির্লজ্জভাবে বারবার ডাকা যায়, বিপদ কেটে গেলে সেই বিপত্তারণের নাম যেন আর মুখে আনা যাবে না! সে-নাম উচ্চারণ করলেই সর্বনাশ!

মূল্যবোধহীন এইরকম আজগুবি তত্ত্ব সুরঞ্জন মজুমদার কখনও আমাকে শেখায়নি। মা-ও না। হয়তো সেইজন্যেই আমি প্রিয়বরণকে নাম ধরে ডেকেছি। আমার পাশে বসতেও বলেছি।

প্রিয় ডানহাতের আহত কবজিটা বাঁ-হাতে শক্ত করে চেপে ধরেছিল। যন্ত্রণায় কষ্ট পেলেও ওর মুখ দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না।

ও শান্ত চোখে ঝিমলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তো ধুরমলকে কিছু করিনি! যা করার দেবতা করেছেন। আমাদের দেবতা অধর্ম সইতে পারেন না। তাই সুবিচার করে দেন। তবে বিচারের রায়টা তাঁর কোনও ভক্তকে দিয়ে...ভক্তকে দিয়ে...ফলিয়ে দেন।'

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, প্রিয়বরণ বেশ অসুবিধের মধ্যে ঝিমলির কথার উত্তর দিচ্ছে। ওর মুখ-চোখে যথেষ্ট বিব্রত ভাব। বারবার ওর দৃষ্টি ছিটকে আসছিল আমার দিকে। আমি পাশে বসেছিলাম বলে ওকে বারবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে হচ্ছিল।

ঝিমলি আবার প্রশ্ন করল, 'জঙ্গলে ফেলে আসা ওই ডেডবডিটার কী হবে? পুলিশ যদি জানতে পারে?'

প্রিয়বরণ ঠান্ডা গলায় বলল, 'না, পারবে না। দেবতা ওটার সৎকার করবেন। ওই লোকটা কখনও যে ছিল, এমন কোনও চিহ্ন আর থাকবে না।

প্রিয়বরণ যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝিমলির প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল সেটা বুঝতে পারছিলাম।

কেন জানি না, আমার মনে হল, এই মুহূর্তে প্রিয়বরণকে সাহায্য করা দরকার। তাই বললাম, 'আপনি আজ না এসে পৌঁছলে কী হত কে জানে! আমি আর ঝিমলি হয়তো কাউকে আর কোনওদিন মুখ দেখাতে পারতাম না। হয়তো আমাদের সুইসাইডই করতে হত।'

আমি মনে-মনে যা চাইছিলাম সেটাই হল। কথাবার্তার বাঁক ঘুরে গেল। প্রিয় আমাকে জিগ্যেস করল, 'এখানে আপনারা হাজির হলেন কেমন করে?'

তখন আমি মধুদার কথা বললাম। বললাম জলপড়ার কথা, অষ্টাবক্র গুণিনের কথা।

কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিলাম, প্রিয়বরণকে আর বেশি কিছু না বলার জন্যে ঝিমলি আমাকে চোরা ইশারা করছে। কিন্তু সব বুঝেও সেই ইশারা আমি উপেক্ষা করলাম।

প্রিয়কে আমি টমকের কথা বললাম, পাশাপাশি তিনটে পাথরের কথাও বললাম। সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখে চারটে লোক যে আচমকা এসে হাজির হয়েছিল, সে-কথাও বাদ দিলাম না। শুধু কী ভেবে গুণিনের বলা ঝকঝকে পাথর আর পুঁথির কথাটা চেপে গেলাম।

এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে চলছিল। আমি মধুদার দিকে মাঝে-মাঝেই খেয়াল রাখছিলাম, ঝাঁকুনিতে মধুদার অচেতন শরীরটা যেন সিট থেকে নীচে

পড়ে না যায়। গণপতিকে একবার ডেকে বললাম, 'আস্তে চালাও—মধুদা পড়ে যাবে।'

ঠিক তখনই গাড়ির একটা জোরালো ঝাঁকুনিতে প্রিয়বরণ আমার প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল। এবং ফিসফিস করে কয়েকটা কথা চট করে ঢেলে দিল আমার কানে।

'এক্ষুনি কয়েকটা কথা আপনাকে বলা দরকার।'

আমি প্রিয়র চোখে একবার তাকালাম শুধু। তাতেই ও বুঝে গেল, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

হঠাৎই মধুদার 'উঃ! আঃ!' শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আমি গণপতিকে গাড়ি থামাতে বললাম।

এর মধ্যেই আমাদের গাড়িটা পাহাড় থেকে প্রায় নীচে নেমে এসেছে। দূরে রাস্তার এবং দোকানপাটের আলো চোখে পড়ছে।

গণপতি গাড়িটা সাইড করে দাঁড় করাতেই ওকে বললাম, 'মধুদার চোখে-মুখে আর-একবার জলের ছিটে দাও...।'

গণপতি সিটে শোয়ানো জলের বোতল হাতে নিয়ে স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে পড়ল। মাঝের দরজা খুলে মধুদার মাথায় মুখে জলের ছিটে দিতে লাগল।

সেদিকে তাকিয়ে প্রিয় অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আজ আপনারা খুব জোর বেঁচে গেছেন।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আপনি না এসে পড়লে...।'

প্রিয় আমাকে হাত তুলে বাধা দিল ঃ 'না, না, ওটা নয়। যদি আমি না আসতাম।...যদি...ওই চারটে লোক...না আসত...তা হলে বিরাট বিপদ হত...।'

'কেন?'

'তা হলে আপনারা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়তেন...।'

'তা হলে কী হত?' ঝিমলি জিগ্যেস করল।

'আপনারা আর ফিরতে পারতেন না।'

এ-কথার পরই প্রিয় মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল। আমার আর ঝিমলির পরপর কয়েকটা উতলা প্রশ্ন যেন ও শুনতেই পেল না।

মধুদা ধীরে-ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল। গণপতির কাছ থেকে বোতল চেয়ে ঢকঢক করে জল খেল। তারপর এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

আমি মধুদাকে চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম। আর গণপতিকে বললাম, গাড়িটা তাড়াতাড়ি একটা ওষুধের দোকানে নিয়ে যেতে।

দশমিনিটও পুরো হয়নি, গণপতির গাড়ি হাইওয়েতে নেমে এল। সেটা পার হয়ে একটা বড়সড় ওষুধের দোকানের সামনে ও গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল।

সেখানে আমাদের আধঘণ্টা মতন লাগল।

প্রিয়বরণের কবজিতে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন ডাক্তারবাবু। মধুদাকেও দুটো ট্যাবলেট খেতে দিলেন।

চিকিৎসার পালা শেষ হলে আমি ঝিমলিকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললাম, 'শোন, তুই মধুদাকে নিয়ে হোটেলে ফিরে যা। আমি প্রিয়র সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে তারপর যাব।'

এ-কথায় ঝিমলি একেবারে আঁতকে উঠল ঃ 'না, না, আমি যাব না। তোর সঙ্গে থাকব। তুই কথা যা বলার বলে নে—তারপর আমরা একসঙ্গে ফিরব।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'নাথিং ডুয়িং, ঝিমলি। আজ তোকে আমার কথা শুনতেই হবে—প্লিজ। কারণ, আমার একটা আনক্যানি ফিলিং হচ্ছে যে, ব্যাপারটা একটা শেষের দিকে...মানে, কনভার্জ করে আসছে।'

কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থেকে ঝিমলি বলল, 'মিহিরদাকে কী বলব তা হলে?'

'কিছুই বলবি না। আমি ফিরে গিয়ে যা বলার বলব।'

'যদি তোর কথা জিগ্যেস করেন? যদি বলেন, অন্তরা কোথায়?'

'বলবি মা-কে আর কয়েকজন রিলেটিভকে ফোন করে তারপর আসছে...।'

এ-কথা শুনে ঝিমলি কী একটা বলতে যাচ্ছিল। আমি ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'প্লিজ, ঝিমলি, মিহিরদাকে তুই যা খুশি বল, কিন্তু আমাকে প্রিয়র সঙ্গে একটু একা কথা বলতে দে।'

ঝিমলি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'বুঝেছি। অ্যাক্স এফেক্ট।' এবং খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমিও হাসি চাপতে পারলাম না। আর আশ্চর্য, একমুহূর্তের জন্যেও তখন মনে পড়ল না, একটু আগেই আমি, ঝিমলি আর মধুদা কী ভয়ংকর বিপদ থেকে বেঁচে ফিরেছি।

ঝিমলি আর মধুদা গাড়িতে করে রওনা হয়ে গেল 'পথিক'-এর দিকে। আমি আর প্রিয় চলে-যাওয়া গাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর প্রিয়র দিকে ফিরে বললাম, 'কোনও চায়ের দোকান-টোকানে গিয়ে বসা যাক।'

প্রিয়বরণ এমনভাবে একটা ছোট্ট নিরিবিলি চায়ের দোকান চট করে খুঁজে বের করল যে, বোঝা গেল অঞ্চলটা ওর চেনা।

সেখানে ঢুকে ভাঙা বেঞ্চিতে বসে আমরা বিস্কুট আর চায়ের গ্লাস হাতে নিলাম। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে প্রিয়কে বললাম, 'নিন, কী বলবেন বলুন—।'

দোকানে একটা বাল্‌ব হলদে আলো ছড়াচ্ছিল। কিন্তু ভোল্টেজ কম থাকায়

বেড়া দিয়ে তৈরি দোকানঘরের নানান জায়গায় বাঁশে
াতা উনুনের পাশে বছর তিরিশের দোকানি বসে অ
ন খদ্দের বসে ছিল তাদের চেহারা আর পোশাক
াকাল'। যখন তারা মাঝে-মধ্যে কথা বলছিল তখ

দোকানের সঙ্গে অনেকটা খাপ খেয়ে গেলেও আ
'। এখানকার হতমান চায়ের দোকানে চুড়িদার পরা
মাছে—এটা ভাবাই যায় না।
চায়ের গ্লাসে শব্দ করে চুমুক দিয়ে দোকানের টালি
যেন গভীর মনোযোগে সেখানকার ঝুলকালি পরীক্ষা
র দিকে তাকাল। নিচু গলায় বলল, 'ম্যাডাম, আজ
। এসেছে...।'
করে রইলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম।
বলে চলল। ওর কথাগুলো যেমন অভিনব তেমনই
যেন একটা বিষণ্ণতার সুর মাখানো ছিল। লক্ষ ক
গিয়েও ও ধরাল না।
কথা শুনছিলাম আর বাপির ডায়েরির কথা ভাবছিল
াপি লিখেছিল, '...মলিন সামন্তের রোলটা খুব মি
কু বাচ্চার এরকম মেজর রোল!...ভাবা যায় না। জন্
ন তা আগে বুঝিনি। মলিনের কেসটা আমাদের
তে পারে। ওটা সিরিয়ালাইজ্ড হলে আরও ভালো
যাবে। মিহির আর প্রকাশদার সঙ্গে ব্যাপারটা ডিসক
রালে আমাদের কাগজের র‍্যাঙ্কিং আকাশছোঁয়া হয়ে
াবিকাঠি...।'
গোপন চাবিকাঠির রহস্যটা বাপি লিখে যেতে পা
পারেনি, নয়তো জেনেও লিখে যাওয়ার সময়
তো আগেই বলেছি, ম্যাডাম, যে আমি অপদেবতা
মামাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। এটা বি
া—এটা আমাদের বিশ্বাস। এই দেবতার রূপ এমন
তখন তাঁকে দেখা যায় না, আবার কখনও তিনি
থাকেন—অর্থাৎ, তখন তাঁর রূপ কিছুটা দেখা

থাকে অদৃশ্য। তিনি বাস করেন মাটির তলায়—অন্ধকার গভীর পাতালে...।'

প্রিয়বরণ একটু থামল।

আমি ওকে লক্ষ করছিলাম। মাথা নিচু করে ও কথা বলছিল। একটানা তাকিয়েছিল গ্লাসের কালচে চায়ের দিকে। বাল্‌বের আলো ওর ছেলেমানুষ মুখে পড়ে গাঢ় আলো-ছায়া তৈরি করেছে।

প্রিয়বরণ অপরাধীর মতো থেমে-থেমে কথাগুলো বলছিল বটে কিন্তু ভীষণ উসখুস করছিল। সেটা বোধহয় এই কারণে যে, বহু ভক্ত মিলে শপথ নিয়ে আগলে রাখা অপদেবতার গোপন কথা ও আমার সামনে ধীরে-ধীরে প্রকাশ করছিল।

আমি প্রিয়কে দেখছিলাম, প্রিয়র কথা শুনছিলাম, আর বাপির কথা ভীষণ মনে পড়ছিল।

প্রিয়বরণ চকিতে চোখ তুলে আমাকে একবার দেখল। তারপর চায়ের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিয়ে তিনজন খদ্দেরের দিকে একপলক তাকাল। বোধহয় মনে-মনে তাদের দূরত্ব আঁচ করে নিল। তারা যে ওর কথা শুনতে পাবে না সেটা যেন হিসেব কষে বুঝতে পারল। তারপর গলা নামিয়ে বলতে শুরু করল।

'আমাদের দেবতা এ-অঞ্চলে প্রথম কবে দেখা দেন জানি না। তবে আমি এখানে চাকরি করতে আসা থেকেই এই ছ'বছর ধরে দেখছি তাঁর বহু ভক্ত এখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আমি ধীরে-ধীরে...।'

আমি প্রিয়কে বাধা দিয়ে জানতে চাইলাম, 'একটা জিনিস আমাকে বলুন। এই পাতালদেবতা আপনাদের মতো ভক্তদের কী উপকারে লাগে?'

প্রিয়বরণ তাকাল আমার দিকে। ওর চোখে কেমন একটা অবশ দৃষ্টি। ও বিড়বিড় করে আমার প্রশ্নটাই উচ্চারণ করল আবার, 'আমাদের কী কাজে লাগে? ওই যে বললাম, বিপদ-আপদ থেকে আমাদের বাঁচায়...' তারপর দু-এক লহমা চুপ করে থেকে চোয়াল শক্ত করে বলল, 'ম্যাডাম, আমি যদি একটা খারাপ প্রশ্ন করি, আপনি তার উত্তর দিতে পারবেন?'

ওর প্রশ্ন করার ঢং দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হল। তবুও বললাম, 'কী প্রশ্ন?'

'আপনাদের ভালো-ভালো দেবতাগুলো আপনাদের কোন কাজে লাগে?'

ওর প্রশ্নে আমি নাড়া খেয়ে গেলাম। কারণ, পাগলের মতো মাথা খুঁড়ে তেমন কোনও জুতসই জবাব খুঁজে পেলাম না।

সত্যিই তো, আমাদের দেবতারা আমাদের কী কাজে লাগে?

আমার বিভ্রান্ত অবস্থাটা প্রিয় আঁচ করতে পারল। মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ করে হেসে উঠল ও। তারপর ঃ 'ভুলেও ভাববেন না, আমি আপনার দেব-দেবীর বিশ্বাসকে আঘাত করতে চেয়েছি, কিংবা আপনাকে অপমান করতে চেয়েছি।

আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? যুক্তি দিয়ে ভাবতে গেলে দেবতারা আমাদের কোনও কাজে আসে না। বহুদিনের পুরোনো আচার-বিশ্বাস আর ধর্ম জড়িয়ে ব্যাপারগুলো আমাদের সবার মজ্জায় ঢুকে গেছে, আমাদের রোজকার জীবনের সঙ্গে লতানে গাছের মতো জড়িয়ে গেছে। আমরা ভাবতে ভালোবাসি, আমাদের জীবনের যত ভালো-ভালো ঘটনা সবই দেবতার আশীর্বাদে হয়। আর খারাপ-খারাপ ঘটনাগুলো আমরা অদৃষ্ট কিংবা নিয়তির ঘাড়ে চাপাই। আবার কখনও-কখনও বদমাস পাপী-তাপী লোক হঠাৎ করে অকালে মারা গেলে আমরা বলি দেবতার শাপে সে মারা গেল—মানে, দেবতা তাকে শাস্তি দিলেন।

'কিন্তু আমার আঠেরো বছরের ছোট বোনটা যে হঠাৎ করে মারা গেল, ও কোন পাপ করেছিল? কার ক্ষতি করেছিল ও? আপনি কি মনে করেন এই দুর্ঘটনার দায় আমি নিয়তির ঘাড়ে চাপাব?'

শেষ দিকে প্রিয়বরণের গলা ভেঙেচুরে গেল, কেঁপে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে মাথা নিচু করল ও।

আমার মনখারাপ হয়ে গেল। আমি যেন ধীরে-ধীরে অন্য এক প্রিয়বরণের দেখা পাচ্ছিলাম। ও আগে কখনও আমাকে ওর ব্যক্তিগত কথা বলেনি, আর আমিও জানতে চাইনি। চাষজমিতে বীজ ছড়ানোর মতো কেউ যেন দুঃখ ছড়িয়ে দিচ্ছিল আমার মনে। সেই দুঃখ নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর প্রিয়বরণ নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তুলল।

আমি নরম গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছিল আপনার ছোট বোনের?'

প্রিয় হাতে-ধরা চায়ের গ্লাস বেঞ্চিতে নামিয়ে রাখল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরের কালো রাস্তার দিকে। অন্ধকার রাস্তায় মাঝে-মাঝে ঝলসে উঠছিল ছুটন্ত গাড়ির হেডলাইট। আর কখনও-কখনও দু-একটা সাইকেল চলে যাচ্ছিল দোকানের সামনে দিয়ে। হাওয়ার সঙ্গে একটা উষ্ণ ভাপ রাস্তার দিক থেকে ভেসে আসছিল।

প্রিয়বরণ একবার কেশে নিয়ে বলল, 'রানি প্রথম মা-কে বলেছিল ওর পায়ের চেটোয় ব্যথা করছে। তারপর—।'

'রানি?'

'আমার বোন।...তারপর ওর চোখ দুটো ভীষণ লাল হয়ে গেল। তার সঙ্গে ঘুসঘুসে জ্বর। আমি আর মা—বাবা তো সেই কোন ছোটবেলায় চলে গেছে—আমি আর মা ওকে নিয়ে পাগলের মতো ডাক্তার-হাসপাতাল করলাম। কিন্তু আড়াই দিনেই সব শেষ হয়ে গেল। রানির পা থেকে প্যারালিসিস শুরু হয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি সেটা পৌঁছে গিয়েছিল বুকে। আর তখনই সব শেষ। ডাক্তারবাবুরা বলেছিলেন, এই রোগটা খুব রেয়ার। নাম গুলেনবেরি সিনড্রোম। একবার হলে না

কি কেউ আর বাঁচে না। যদি কেউ বাঁচে তবে সেটাকে মিরাক্‌ল বলতে হবে। তো এইভাবে...আমাদের কাঁদিয়ে...রানি চলে গেল।'

প্রিয় আবার কেঁদে ফেলল। বাঁ-হাতে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখে চেপে ধরল।

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম। অবাক হয়ে অন্যরকম প্রিয়বরণকে দেখতে লাগলাম। ওর ভেতরে যে এত শোক-আঘাত জমা হয়েছিল তা আগে কখনও বোঝা যায়নি।

ওকে আমি কী বলে সান্ত্বনা দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। লক্ষ করলাম, একজন খদ্দের দোকান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় অবাক চোখে প্রিয়কে কয়েক ঝলক দেখল।

আমি প্রিয়বরণের কাঁধে হাত দিলাম। বললাম, 'একটু সামলে নিন...প্লিজ। লোকজন দেখছে। প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথা আমি জানি। লাস্ট মে মাসে আমার বাপি এখানে একটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং-এর কাজে এসে মারা গেছে।'

'তার মানে? কী বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। রসময়বাবুর বাড়িতে বসে যে-রিপোর্টারের কথা আমরা বলছিলাম, তাঁর নাম সুরঞ্জন মজুমদার—আমার বাবা—আমার বাপি। মলিন সামন্তের জন্মান্তর নিয়ে স্টোরি করতে কলকাতা থেকে পুরুলিয়ায় এসেছিলেন...।'

কথাটা শুনেই 'ওঃ মাই গড!' বলে প্রিয়বরণ মাথায় হাত দিয়ে মাথা ঝোঁকাল।

কিছুক্ষণ পর ও মাথা তুলল। এপাশ-ওপাশ সামান্য মাথা নাড়ল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী হল?'

বুঝতে পারছিলাম না, বাপির কথা শুনে প্রিয় এত অবাক হল কেন।

প্রিয়বরণ বিড়বিড় করে বলল, 'সুরঞ্জন...মজুমদার...আপনার...বাবা! সেইজন্যেই আপনি আমাদের দেবতার পেছনে এমনভাবে পড়ে আছেন! কোনও ভয় নেই, ভ্রুক্ষেপ নেই...আশ্চর্য!' একটু চুপ করে থেকে তারপর ঃ 'উনি আপনার বাবা ছিলেন!' আক্ষেপের শব্দ করে মাথা নাড়ল ও ঃ 'কী আর হবে! আমার মতো আপনারও দেখছি কপাল পোড়া। আমার বোন...আর...আপনার বাবা...। কিন্তু আমার বোনটার বয়েস মাত্র আঠেরো ছিল। জীবনকে দেখার আনন্দ অনেক বাকি ছিল ওর। কী হাসিখুশি ছিল! সবসময় মজা করত, হইহুল্লোড় করত, মা-কে আর আমাকে খ্যাপাত...।'

আমি বললাম, 'ওসব কথা আর মনে করার দরকার নেই—কষ্ট পাবেন।'

'কষ্ট তো সবসময় পাচ্ছি। সেই কষ্ট ভুলতেই তো পাতালদেবতার শরণ নিয়েছি।'

আবার ফুঁপিয়ে উঠল প্রিয়বরণ।

একটু পরে মুখ তুলে আমাকে দেখল। ওর ভেজা চোখ লালচে হয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে ও বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে আমার কষ্ট এখনও শেষ হয়নি।'

'মানে?'

'রানির জন্যে কেঁদে-কেঁদে বুক ভাসিয়ে তিন মাসের মধ্যে আমার মা-ও চলে গিয়েছিল। অথচ জানেন, আমার মা কী ধার্মিক ছিল! দিন-রাত "ঠাকুর-ঠাকুর" করে মেতে থাকত। যখন মায়ের ওরকম হল, আমার সব বিশ্বাস ভেঙে গেল। বুঝলাম, দেবতা আমাদের কোনও কাজে লাগে না। শুধু ভয় আর বিশ্বাস থেকে একটা কাউকে আঁকড়ে ধরার জন্যে দেবতাকে দরকার...।'

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, প্রিয়র ব্যাপারটা ঠিক আস্তিক আর নাস্তিকের ব্যাপার নয়। একটা বিশ্বাস আর ভরসা ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়াতেই ছেলেটা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

প্রিয়বরণ বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'মা চলে যেতেই আমি কলকাতার পাট চুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চাকরি নিয়ে এখানে চলে এলাম। এখানে এসে রসময়দাদের সঙ্গে আলাপ হল। ওদের ছেলে মলিনের বয়েস তখন সবে তিন বছর।'

প্রিয় একটু থামল। তারপর আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, এক্ষুনি যেন কোনও সাংঘাতিক কথা বলবে।

আর ও বললও তাই।

'এখানে এসে একরাতে...আপনাদের মতো সবুজ আলো...দেখতে পেলাম। তারপর...তারপর যোগাযোগ করলাম...ভক্তদের সঙ্গে...। দিনের-পর-দিন যেতে লাগল। আমি...সেই...সেই অপদেবতার ভক্ত হয়ে গেলাম। দেখলাম, অপদেবতা অনেক কাজের দেবতা।'

'ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'বলছি—।'

॥ পঁচিশ ॥

'সত্যিই অপদেবতা অনেক কাজের দেবতা, ম্যাডাম।' উদাস গলায় বলতে শুরু করল প্রিয়, 'সবরকম বিপদে উনি ওঁর ভক্তদের ভরসা জোগান। যেমন, গলুসুতো গ্রামের

সৃষ্টিধর মাজি ওর চরম বিপদে আমাদের দেবতার কাছে বিরাট ভরসা পেয়েছিল। ওর বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে গোপালু হঠাৎই সিরকাবাদের আখের খেতে খুন হয়ে গেল। টাঙ্গি দিয়ে কে যেন ছেলেটার ঘাড়ে কোপ মেরেছিল। ঘাড় একেবারে দু-ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। খেতের পলিমাটির ওপরে কী-রক্ত, কী-রক্ত।

'আমরা সব দল বেঁধে ওই ডেডবডি আনতে গিয়েছিলাম। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। সৃষ্টিধরের তিনকুলে আর কেউ ছিল না—ওই এক ছেলে গোপালু ছাড়া। ওর বুক চাপড়ানি কান্না চোখে দেখা যায় না। একেবারে জবাই করা শুয়োরের মতো হাত-পা দাপাচ্ছিল। তারপর...।'

প্রিয় একটু থামল। আমার দিকে তাকাল। খানিকটা দোনামনা করে জিগ্যেস করল, 'আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো?'

আমি গল্পের ঘোরের মধ্যে ছিলাম। চমকে উঠে চায়ের দোকানে আবার ফিরে এলাম।

'না, না—আপনি বলুন...।'

'সৃষ্টি আমাদের দেবতার পুজো করত। ও এক রাতে একটা **শুকনো কুয়োর** মুখের কাছে গিয়ে একেবারে কেঁদে পড়ল—।'

'কুয়োর মুখের কাছে মানে? কোন কুয়োর মুখে?'

আমার মনে পড়ে গেল, একদিন রাতে আমি আর ঝিমলি মধুসূদনের সঙ্গে একটা কুয়োর কাছে গিয়েছিলাম—অপদেবতার গায়ে জলপড়া দিতে। পরদিন সকালেও আমরা সেই কুয়ো দেখতে গেছি।

প্রিয়বরণ কি সেই কুয়োটার কথাই বলছে?

কিন্তু প্রিয়বরণের উত্তর আমাকে অবাক করে দিল। ও বলল, 'ম্যাডাম, আমাদের এই পুরুলিয়াতে অনেক শুখা কুয়ো আছে। তার যে-কোনও একটার কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করলে আমাদের দেবতার দেখা পাওয়া যায়। কারণ, শুকনো কুয়োগুলো তাঁর যাতায়াতের পথ...।'

হঠাৎই আমার গা-শিউরে উঠল। রাতের বাতাসের কণাগুলো ঠান্ডা ছুঁচের মতো হয়ে আমার গায়ে বিঁধতে লাগল। একটা অসহ্য ভয় আর কৌতূহল দম বন্ধ করে দিতে চাইল।

কোনওরকমে প্রশ্ন করলাম, 'যাতায়াতের পথ মানে?'

প্রায় বিড়বিড় করার মতন করে প্রিয় বলল, 'মানে...ওই পথগুলো দিয়ে তিনি কখনও-কখনও উঠে আসেন। আবার...কখনও-কখনও জমিতে ফাটল ধরিয়ে। কখনও বা...নদীর জলের নীচ থেকে।'

প্রিয়বরণ মাথা ঝাঁকাল। ওর ডানহাতের কবজির ব্যান্ডেজের ওপরে আলতো

করে দুবার আঙুল বোলাল। একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আকাশ বাদে... জলে-স্থলে-পাতালে...সব জায়গাতেই তিনি আছেন। কখনও তাঁকে দেখা যায়...কখনও আবার দেখা যায় না...। সত্যি, তাঁকে পুরোপুরি চেনা খুব মুশকিল।'

আমি মুগ্ধ হয়ে প্রিয়র অদ্ভুত কাহিনি শুনছিলাম। ওর কথায় ময়না সরেনের কথা মনে পড়ল আমার। সেই ভয়ানক রাতে পাতালদেবতা তা হলে জমিতে ফাটল ধরিয়ে দেখা দিয়েছিলেন! পরদিন সকালে যে-ফাটলে কান পেতে আমি শিসের শব্দ শোনার চেষ্টা করেছি!

সৃষ্টিধরের ঘটনায় ফিরে এসে জানতে চাইলাম, 'সৃষ্টিধর কুয়োর মুখের কাছে কেঁদে পড়ার পর কী হল?'

'গলুসুতোর জগবান ওঝা নামে একটি ছেলেকে কে যেন জলের তলায় টেনে নিয়ে গেল। ছেলেটার মতিগতি বরাবর বেঠিক। কালা কাজ—চুরি, রেলডাকাতি এসব করত। একদিন সন্ধের সময় ও গাঁয়ের পুকুরে চান করতে নেমেছিল। হঠাৎ কী হল, কোন কুটুম ওকে নাচাতে-নাচাতে জলের তলায় টেনে নিয়ে গেল। ওর ছটফটানি আর চিৎকারে পুকুরপাড়ে দু-দশজন লোক জড়ো হয়েছিল, কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পায়নি। শুধু জগবানের হাতের চাপড়ে ছিটকে ওঠা জলের ফুলকি ছাড়া কিছুই কারও নজরে পড়েনি।

'কেউ বলল, জগবানকে কুমিরে টেনে নিয়েছে, কেউ বলল হাঙর। কিন্তু ওই ছোট্ট পুকুরে কুমির কোথা থেকে আসবে? আর হাঙরের তো কোনও প্রশ্নই নেই।

'যাই হোক, খোঁজখবর করে শেষ পর্যন্ত জানা গেল, জগবানই গোপালুকে খুন করেছিল। পুরোনো কী একটা কাজিয়ার হিসেবনিকেশ করতে। পুলিশের তদন্ত ঠিকমতোই এগোচ্ছিল—জগবান ওভাবে মারা যেতে সব প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে গেল। আমরা বুঝলাম, সৃষ্টির ডাকে দেবতা সাড়া দিয়েছেন।...বলুন, ম্যাডাম, সৃষ্টিধরের কাছে এটা কি কম সান্ত্বনা!'

আমি সম্মোহিত শ্রোতার মতো প্রিয়বরণের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এত গোপন কথা ও জানে! ওর মুখ দেখে আগে কখনও তো এ-কথা মনে হয়নি!

প্রিয় হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল, 'চলুন, ম্যাডাম—রাত হয়ে যাচ্ছে। এরপর হোটেলে ফিরতে অসুবিধে হবে।'

আমার ওঠার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে উঠতে হল। প্রিয়র পিছু-পিছু চায়ের দোকানের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

সামনের পিচ-রাস্তাটা মোটামুটি অন্ধকার। রাস্তার ধারে দাঁড়ানো লাইটপোস্টগুলো বেশ দূরে-দূরে। আর তাতে লাগানো বাতিগুলোর আলো কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়া।

সন্ধেবেলায় বাতাসে যে-গরম ভাবটা ছিল, এখন সেটা বেশ আরামের হয়ে উঠেছে। হয়তো বিকেলের বৃষ্টিটাই বাতাসকে মোলায়েম করেছে।

এখানকার দু-চারটে ঝুপড়ি দোকানের পর রাস্তাটা বেশ ফাঁকা। সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল প্রিয়বরণ।

ফাঁকা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে আমার একটু দুশ্চিন্তা হল ঃ কী করে ফিরব হোটেলে? প্রিয়র মোটরবাইক তো সেই পাহাড়ে—টমকের কাছে।

প্রিয়বরণ যেন আমার মনের কথা পড়ে নিল। বলল, 'আমার সঙ্গে সাইকেলে যেতে আপনার অসুবিধে? অসুবিধে হলে...দেখি, অন্য কোনও ব্যবস্থা করতে হবে।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না, অসুবিধে আবার কীসের? আপনি নিশ্চয়ই ভালো সাইকেল চালান। কিন্তু আপনার হাতে চোট রয়েছে...।'

'এ-চোট তেমন কিছু নয়। এরকম চোট থাকলেও আমি ভালো সাইকেল চালাই।' হাসল ও।

'কিন্তু সাইকেল পাবেন কোথায়?'

'সামনের ওই দোকানের দোকানদার আমার চেনা—' আঙুল তুলে একটা ঝুপড়ি-দোকানের দিকে দেখাল ঃ 'ওর সাইকেলটা ধার নেব...!'

প্রিয় আর আমি সেই দোকানটার দিকে এগোলাম। ওর পাশে হাঁটতে-হাঁটতে জিগ্যেস করলাম, 'পাতালদেবতা ভরসা জোগান জানলাম। কিন্তু আর কী কাজে লাগে বললেন না তো!'

'বলছি।' বলে মাথা ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে সরাসরি তাকাল ও ঃ 'কিন্তু আপনি ভয়-টয় পাবেন না তো?'

'না—' আমি হেসে বললাম। কিন্তু টের পেলাম, কথাটা বলার সময়, হাসার সময়, ঠোঁটে কেমন টান ধরল। শীতকালে গাল-ঠোঁট টেনে গেলে যেমন হয়।

'ম্যাডাম, আমাদের দেবতা নিজে বহুরকমের আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাতে পারেন। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি তাঁর কোনও-কোনও ভক্তকে, তাঁর মরজিমতন, কিছু-কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা দেন। কাকে যে তিনি কখন এই ক্ষমতা দেবেন, আবার কখন যে কেড়ে নেবেন—তা কেউ বলতে পারে না। এই ক্ষমতা যারা পায়, তারা পায়। আর যারা পায় না, তারা পায় না। যেমন, আজ আপনি আমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে ফেলেছেন...।'

আমি মাথা নেড়ে ব্যাপারটা অস্বীকার করে 'না' বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু প্রিয় থমকে দাঁড়িয়ে হাত তুলে হেসে বলল, 'প্লিজ, এভাবে মিথ্যে বলবেন না, ম্যাডাম। আপনার মুখে মিথ্যে শুনলে আমার খারাপ লাগবে। আমি জানি, আপনি দেখে ফেলেছেন।'

প্রিয়র কথা বলার সুরে যে-আন্তরিকতা আর আত্মবিশ্বাস ছিল তাকে আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। কেমন যেন কাবু হয়ে শূন্য চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর মুখের ভেতরে দেখা দৃশ্যটা মনে পড়ল। আমি কেঁপে উঠলাম। শরীরের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

'সরি, ম্যাডাম। এভাবে বললাম বলে প্লিজ কিছু মাইন্ড করবেন না।'

আমি কোনওরকমে বললাম যে, না, আমি কিছু মাইন্ড করিনি।

আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে প্রিয় দোকানটার কাছে এগিয়ে গেল।

পান-বিড়ি-সিগারেটের ছোট্ট দোকান। তার সঙ্গে বিস্কুট-লজেন্সও বিক্রি হচ্ছে। দোকানদার একটা টুলে উবু হয়ে বসে আছে। বাল্‌বের হলদে আলোয় কষ্টিপাথরের একটা মূর্তি যেন।

দোকানের গা-ঘেঁষে একটা সাইকেল দাঁড় করানো ছিল। প্রিয় দোকানদারকে কীসব বলে সাইকেলটা নিয়ে চলে এল আমার কাছে। বলল, 'সামনের রডের ওপরে উঠে বসুন।'

ছোটবেলায় সাইকেলে যে একেবারে চড়িনি তা নয়। কিন্তু এই বয়েসে এসে সাইকেলে চড়ে বসতে হবে, এটা ভাবিনি। অবশ্য এ ছাড়া কোনও উপায়ও তো দেখছি না!

আমাকে সামনে বসিয়ে দিব্যি সাবলীল ভঙ্গিতে সাইকেলে চড়ে বসল প্রিয়। তারপর মসৃণ রাস্তা ধরে নিঃশব্দে সাইকেল চালাতে লাগল।

ঝিমলি এ-অবস্থায় আমাকে দেখলে নির্ঘাত বলত 'অ্যাক্স এফেক্ট'। এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন হঠাৎই মনে হল, সত্যি-সত্যি ওই টাইপের কিছু নেই তো!

কথাটা ভেবে আপনমনেই আমার হাসি পেয়ে গেল।

প্রিয় জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

'কিছু না—।'

'ভয় করছে?'

'উঁহু—।'

'আপনার সাহসের তারিফ করতে হয়—।'

'কেন? এভাবে সাইকেলে চড়েছি বলে?'

'মোটেই না। একটা বিশাল মাপের ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও গত ক'দিন ধরে আপনি যেরকম সাহস দেখাচ্ছেন...এরকম দেখা যায় না...রেয়ার।'

'ওই যে, আমার বাপির কথা বললাম...। বাপির জন্যে আমি অনেক কিছু করতে পারি। আপনি বরং ওই ম্যাজিক পাওয়ারের কথা বলুন। যেতে-যেতে

শুনতে ভালো লাগবে।'

আমার স্বর্ণভূষণ তরফদারের কথা মনে পড়ল। কফি হাউসে এক গ্লাস জলে আঙুল ডুবিয়ে ও এরকম ম্যাজিক পাওয়ার দেখিয়েছিল। তারপর ঝিমলির কবজিতে কালো দাগের বালা পরিয়ে দিয়েছিল।

সাইকেল চলছিল। হাওয়ায় আমার চুল অল্প-অল্প উড়ছিল। আমি সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম প্রিয়র মুখ আমার কানের খুব কাছে। তা ছাড়া, ওর হাত সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরার সময় আমার পিঠ ছুঁয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ সাইকেল চালানোর পর প্রিয় হঠাৎই কথা বলতে শুরু করল।

'আসলে, ম্যাডাম, আমাদের মধ্যে অনেকেই পাতালদেবতার পুজো করে ক্ষমতার লোভে। ম্যাজিক পাওয়ারের লোভে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি কিন্তু সেই ক্ষমতা পাওয়ার লোভে...।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'জানি। কিন্তু ক্ষমতাটা যে আপনি পেয়েছেন সেটা বুঝলেন কবে থেকে?'

'সে প্রায় বছরতিনেক হবে। আমি সন্ধের ঠিক আগে বাঘমুন্ডি পাহাড় থেকে বাইক নিয়ে নামছিলাম। হঠাৎই একটা বুনো শুয়োরের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। জঙ্গলের সরু পথ—পাশ কাটিয়ে পালানোর উপায় নেই। বাইক থেকে নেমে ছুট লাগাব কি না ভাবছি, শুয়োরটা মাথা নিচু করে ছুটে এসে আমার বাইকে এক গোঁত্তা মারল। বাইক উলটে পড়ে গেল—সেইসঙ্গে আমিও।

'খানিকটা দূরে ছিটকে পড়েছিলাম। কপাল ভালো যে, বাইকটা আমার ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েনি। কিন্তু নিজেকে গুছিয়ে উঠে দাঁড়ানোর আগেই কালো রঙের মাংসের পাহাড়টা আমাকে ছুটে এসে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল। ওটার বাঁকানো দাঁতের খোঁচায় আমার কোমরের কাছটায় চিরে গেল।

'আমি আবার উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি, দেখি বুনো শুয়োরটা ফোঁসফোঁস করতে-করতে আবার ছুটে আসছে আমার দিকে। আমি ভয়ে কেঁপে উঠে আমার দেবতাকে স্মরণ করলাম। মনে হল, আজই আমার শেষদিন। ছোট বোন রানি আর মায়ের পর এবার আমার পালা।

'ঠিক তখনই সন্ধে-হয়ে-আসা আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা কেউ যেন ঝকঝকে বাঁকা তরোয়াল দিয়ে চিরে দিল। অথচ আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই! ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই মুখের ভেতরে কী একটা যেন টের পেলাম।

'চোখের নিমেষে সবকিছু ঘটে যাচ্ছিল। কী বলব আপনাকে, আমি আর কিছু

থই করতে পারছিলাম না। শুয়োরটা তখন মাথা নিচু করে আমার খুব কাছে এসে পড়েছে। তক্ষুনি কে যেন জোরে শিস দিয়ে উঠল। আর মাথার ভেতরে বলে উঠল, "তুই কম কীসে! জানোয়ারটাকে ছোবল মার!"

'ব্যস, আমি মুখ হাঁ করে ছোবল মারলাম। সঙ্গে-সঙ্গে সব শেষ...।'

আমি হঠাৎই থরথর করে কেঁপে উঠলাম। সাইকেলটা চলতে-চলতে টলে গেল। প্রিয়বরণ তাড়াতাড়ি ব্রেক কষে সাইকেল থামিয়ে দিল। রাস্তায় এক পা রেখে অন্য পা প্যাডেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম। কিন্তু সামনে একটা পা ফেলতে গিয়ে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল।

টলে হয়তো পড়ে যেতাম, কিন্তু প্রিয়বরণ আমাকে একহাতে ধরে ফেলল: 'ম্যাডাম! কী হল?'

প্রিয়র ছোঁয়ায় আমি শিউরে উঠলাম। আমার সারা গায়ে যেন শুঁয়োপোকা কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রিয় আবার ডাকল, 'ম্যাডাম—।'

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। একহাতে কপাল টিপে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাপি! বাপি! আমাকে শক্তি দাও। সাহস দাও। আমি যেন কিছুতেই ভয় না পাই—কিছুতেই না। আমাকে তোমার সাহস ধার দাও।

ঝাপসা চোখে দেখতে পেলাম, আকাশে মলিন চাঁদ। মিনমিনে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রুক্ষ প্রান্তরে, গাছপালায়, অ্যাসফাল্টের রাস্তায়।

তীব্র হেডলাইট জ্বেলে একটা মালবোঝাই ট্রাক ছুটে আসছিল। তুমুল গর্জন করে রাস্তা কাঁপিয়ে ওটা আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। ট্রাকটার শব্দ, আলো আর ঝাঁকুনি আমাকে যেন চেতনায় ফিরিয়ে নিয়ে এল।

প্রিয়বরণের আবছা মুখের দিকে তাকালাম।

এই নিরীহ রোগা ছেলেটা সত্যিই তা হলে ছোবল মারতে জানে! আজ পড়ন্ত বিকেলের আলোয় একপলকের জন্যে হলেও আমি ঠিকই দেখেছি।

ওর হাঁ করা মুখের ভেতরে লম্বা জিভটা কালো রঙের। তার ডগাটা চ্যাপটা হয়ে আচমকা ছুঁচলো হয়ে গেছে—অনেকটা সাপের ফণার মতো। সেই জিভের ডগায় কী মারণ-বিষ আছে কে জানে! কিন্তু ওই জিভ দিয়েই প্রিয়বরণ ওর শত্রুকে মরণছোবল মেরেছে। এবং তৎক্ষণাৎ শত্রু মারা গেছে।

আমি নয়, সুরঞ্জন মজুমদারের মেয়ে হঠাৎই ঠান্ডা গলায় বলে উঠল, 'হাঁ করুন। আপনার জিভটা দেখান। এক্ষুনি!'

প্রিয় থতমত খেয়ে বলে উঠল, 'কী বলছেন, ম্যাডাম!'

'যা বলছি শুনুন। মুখ হাঁ করে জিভটা এক্ষুনি আমাকে দেখান।'

প্রিয়বরণ মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বাধ্য ছেলের মতো হাঁ করল।

আমি দেখলাম।

॥ ছাব্বিশ ॥

আকাশে মলিন চাঁদের করুণ আলোতেও আমার দেখতে অসুবিধে হল না।

আশ্চর্য! কিছুক্ষণ আগে চায়ের দোকানের আলোয় দাঁড়িয়ে যে-চাঁদের আলোকে ভীষণ স্তিমিত মনে হচ্ছিল, এখন এই আলোহীন খোলামেলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই আলোকেই মনে হচ্ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কত বেশি।

প্রিয়বরণ হাঁ করে জিভটা বাইরে বের করে অনেকটা মা-কালীর ঢঙে দাঁড়িয়ে ছিল। অথবা মনে হচ্ছিল, আমি একজন ডাক্তার—রুগির জিভ দেখতে চেয়েছি।

না, এই জিভে কোনও মাহাত্ম্য নেই। অতি সাধারণ গোলাপি জিভ। চাঁদের আলোয় জিভের লালা চকচক করছে। প্রিয় জিভটাকে এপাশ-ওপাশ ওপর-নীচে নাড়াচ্ছিল। বোধহয় বোঝাতে চাইছিল আমার কাছে কোনও কিছু ও লুকোতে চায় না।

সাপের ফণার মতো যে-জিভটা আমি কয়েক ঘণ্টা আগে দেখেছিলাম, তার সঙ্গে এই সাধারণ জিভটাকে মনে-মনে তুলনা করছিলাম।

কয়েক সেকেন্ড পর প্রিয়বরণ জিভটা ঢুকিয়ে নিয়ে মুখ বন্ধ করল।

কিছুক্ষণ আমরা দুজনে চুপচাপ।

প্রিয় আমার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে। তবে কীসের প্রত্যাশা সেটা বলতে পারব না।

একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগছিল ঃ ও কখনও সরাসরি বা ঠারেঠোরে আমাকে পাতালদেবতার ভক্ত হওয়ার জন্যে বলেনি। মনে-মনে হিসেব কষে দেখলাম, প্রিয়বরণের সঙ্গে আমার আলাপ গত ৩১ আগস্ট বিকেলে—মলিন সামন্তের বাড়ি যাওয়ার পথে। আর আজ ৪ সেপ্টেম্বর। মাত্র এই চারদিনে কত ঘটনাই না ঘটে গেছে!

এত ঘটনা যে, প্রিয়কে মনে হচ্ছে কতদিনের চেনা। আমার আসল পরিচয়

ও আজ, একটু আগে, জেনেছে। কিন্তু তার আগে বহু সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ও কখনও আমার কাছে পাতালদেবতার গুণকীর্তন করে আমাকে ওর দলে টানার বা ভোলানোর চেষ্টা করেনি। শুধু ওর মনের কথা খুলে বলতে চেয়েছে। অকপটে অনেক কথা স্বীকার করতে চেয়েছে।

আমি খানিকটা অবাক হয়েই প্রিয়বরণকে দেখছিলাম। এই চারদিনের নানান ঘটনায় ও সত্যিই আমাকে বহুবার অবাক করে দিয়েছে।

এই তো রোগা-পাতলা চেহারা! নিরীহ। মুখচোরা। হালকা বাতাসে নাকে ভেসে আসছে ওর পারফিউমের গন্ধ। গন্ধটা যেন একটা মনে-করতে-না-পারা স্বপ্নের মতো। মনে হচ্ছে, আছে—কিন্তু নেই।

প্রিয় বলল, 'ম্যাডাম—চলুন। আমাদের দেরি হয়ে যাবে...।'

আবার সাইকেল। আবার পথ চলা।

একটু পরেই প্রিয়বরণ জানতে চাইল, 'ম্যাডাম, এখন কেমন ফিল **করছেন?** ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি। কেন?'

'আরও কয়েকটা কথা যে বলব...আমাদের দেবতাকে নিয়ে...।'

আমি সহজ গলায় বললাম, 'বলুন, আমি তো শুনতেই চাই।'

'আমাদের পাতালদেবতার বয়েসের কোনও গাছ-পাথর নেই, ম্যাডাম।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। ওঁর বয়েস হয়তো কয়েকশো বছর। কিংবা কয়েক হাজার বছর। আসল বয়েস কেউ জানে না।'

'কারও পক্ষে কি এত বছর ধরে বেঁচে থাকা সম্ভব? আপনি যেটা বলছেন সেটা হয়তো ইয়ে...আপনার...কিংবদন্তি গোছের। কিংবা আপনাদের মতো ভক্তদের বিশ্বাস...।'

আমার কথায় প্রিয়বরণ যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেটা টের পেলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও মুখ খুলল ঃ 'ঠিকই বলেছেন, ম্যাডাম। এত বছর তো কারও পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। আপনাকে যখন সবই বলছি তখন... এই সিক্রেটটাও খুলে বলব। আমাদের দেবতা নানানজনের প্রাণ ধার নিয়ে বেঁচে থাকেন। মানে, ওঁর শরীরটা একই থাকে...বিভিন্ন সময়ে উৎসর্গ করা প্রাণের শক্তিতে তিনি শরীরটাকে ধরে রাখেন। যেমন, ময়না সরেন, চুনারাম মাহাত। এ ছাড়া প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্যে তিনি অন্যের প্রাণ নিজের শরীরে নিয়ে নেন। মানে, নতুন একটা অল্পবয়েসি তাজা প্রাণকে নিজের আত্মার সঙ্গে মিশিয়ে নেন। তার আগে ওঁর নিজের যত অভিজ্ঞতা আর স্মৃতি ধীরে-ধীরে সেই নতুন

প্রাণের মধ্যে চালান করে দেন...।'

যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আমি প্রিয়বরণের কথা শুনছিলাম। ওর বলা প্রতিটি শব্দ আর বাক্যের মানে বুঝতে পারলেও সবমিলিয়ে মানেটা যে ঠিক কী, সেটাই মাথায় ঢুকছিল না। শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি, প্রাণের ক্ষয়-ক্ষতি, অন্যের প্রাণ, নিজের শরীর, আত্মার সঙ্গে মিশিয়ে নেন...নাঃ, সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

সে-কথাই প্রিয়বরণকে বললাম। তাতে ও বলল, 'আমি হয়তো আপনাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না, ম্যাডাম। আসলে ব্যাপারটা অনেকটা জন্মান্তরের মতন...।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল প্রিয়বরণ। তারপর আবার বিড়বিড় করে বলল, 'জন্মান্তর মানুষকে নতুন আর-একটা জীবন দেয়। এও অনেকটা সেইরকম। কাল বিকেলে আপনারা মলিনদের বাড়িতে একবার আসছেন তো?'

আচমকা প্রসঙ্গ পালটে যাওয়ায় আমি একটু চমকে গেলাম। কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে বললাম, 'যাওয়ার তো ইচ্ছে আছে। কিন্তু আজ ওই সুড়ঙ্গের ভেতরে যে ঢোকা হল না! সেখানে তো একবার যাওয়া দরকার...।'

'আপনার ভয়ডর এত কম যে, আমার অবাক লাগে।'

'অবাক লাগবে কেন? কেন কম সে তো আপনি জানেন! আমার যে থামলে চলবে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রিয়। বলল, 'হুঁ।' একটু সময় নিয়ে তারপর ঃ 'আমি আপনাদের টমকের পাশে ওই সুড়ঙ্গে নিয়ে যাব। তবে আমি ঠিক একা যাব না—সঙ্গে মলিন থাকবে।'

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'মলিন থাকবে কেন?'

প্রিয় যেন আপনমনেই একটা ঘোরের মধ্যে বলল, 'এখন সেপ্টেম্বরের শুরু। মলিনের সেই ব্যাপারটা আজ থেকে শুরু হয়েছে।'

'কোন ব্যাপার?'

'ওই যে—গা থেকে অদ্ভুত গন্ধ বেরোনোর ব্যাপারটা। এ সময়ে মলিন কোথাও বেরোয় না। আপনি তো জানেন! বেরোলেই কাকের সেই উৎপাত। কিন্তু কাল ওকে সঙ্গে নেব।'

আবার জিগ্যেস করলাম, 'ওইটুকু ছোট ছেলেকে সঙ্গে নেবেন কেন?'

প্রিয় একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, 'ও থাকলে আর ভয় নেই...।' কাল বিকেল—এই চারটে-সাড়ে চারটে নাগাদ—আপনারা তিনজনে মলিনদের বাড়িতে আসুন। ঠিক আসবেন কিন্তু। আমিও আসব...তখন দেখা হবে।'

প্রিয়র কথায় কেমন যেন তাড়ার গন্ধ পেলাম। তাই বললাম, 'এরকম

তাড়া দিচ্ছেন কেন?'

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার হাতে বোধহয় আর বেশি সময় নেই, ম্যাডাম। তাই...তাড়া দিচ্ছি...।'

তারপরই বাকি রাস্তাটা প্রিয় মুখে কুলুপ এঁটে বসল। যত প্রশ্ন করলাম, সবই কেমন যেন পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে গেল।

যখন ও আমাকে 'পথিক'-এর সামনে নামিয়ে দিল তখন দেখি সেই একই দৃশ্য ঃ মিহিরদা আর ঝিমলি হোটেলের দরজায় একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সারাটা রাত একফোঁটাও ঘুম এল না আমার।

কী করেই বা আসবে। বাপির ডায়েরিটা আমার হাতে আসার দিন থেকে পরপর ঘটনাগুলো সিনেমার মতো স্লো মোশানে আমার মনে ছায়া ফেলে গেছে। ঘরের একমাত্র বাল্‌বটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু ঘুম আসেনি। শুধু এপাশ-ওপাশ করেছি, ছটফট করেছি।

আমার পাশে হাঁটু ভাজ করে শুয়ে থাকা ঝিমলি আমার উসখুসুনি টের পেয়েছে। একবার ঘুমজড়ানো গলায় জিগ্যেসও করেছে, 'কী হল, অন্তরা? ফিলিং আনইজি?'

আমি উত্তরে চাপা গলায় বলেছি, 'না—কিছু না।'

ফিয়ারলেস মজুমদারের কথা আমার মনে পড়ছিল। একইসঙ্গে মনে পড়ছিল, বাপির অফিসের বন্ধুরা আমার ডাকনাম দিয়েছে ফিয়ারলেস জুনিয়ার। এই নিকনেমগুলো মনে পড়ার কারণ, পুরুলিয়ায় আসার পর থেকে যেসব ঘটনা ঘটেছে তাতে ভয় না পাওয়াটা সত্যিই খুব আশ্চর্যের।

আমি কিন্তু অবাক হচ্ছিলাম একটা কথা ভেবে ঃ বারবার আমার মনে হচ্ছিল, এ পর্যন্ত যেসব ঘটনার মুখোমুখি আমি হয়েছি সেগুলো যেন আমার জীবনের ঘটনা নয়—ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে অন্য কারও জীবনে...আমি শুধু নির্লিপ্ত দর্শক হয়ে সেগুলো দূর থেকে দেখছি।

আজ বিকেলে বাঘমুণ্ডি পাহাড়ে টমকের কাছে আমার জীবনে যে-চরম বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছিল সেটাও যেন আসলে আমার জীবন নয়—অন্য কারও জীবন। সব মিলিয়ে আকস্মিক বিপর্যয়ের এই ঘটনাগুলো আমাকে তেমন একটা ধাক্কা দিতে পারছিল না।

এর একটা কারণ হয়তো ফিয়ারলেস, মজুমদারের জিন। আর অন্য একটা কারণ প্রিয়বরণ সরকার কি না কে জানে। তা ছাড়া, এই অলৌকিক রহস্যের শেষটা

জানার কৌতূহল অন্য আবেগগুলোকে অনেক ভোঁতা করে দিয়েছিল।

যে-রহস্যের পেছনে আমি দিনের পর দিন পাগলের মতো ছুটেছি, আজ মনে হল সেই রহস্য আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে, 'অনেকদিন তোকে কষ্ট দিয়েছি—এবার চলে আয়—কোলে আয়...।'

সত্যিই একটা অপার্থিব টান পার্থিব শক্তি দিয়ে আমাকে টানছিল।

আমি ফিরে আসার পর থেকে মিহিরদা আর ঝিমলি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছে। স্বাভাবিক কারণেই মিহিরদার প্রশ্ন ছিল বেশি—ঝিমলির কম।

কোনওরকমে রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে মিহিরদার ঘরে গিয়ে যখন বসলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

মিহিরদার বকুনি আর প্রশ্নের মুখে ভেসে যেতে-যেতে বললাম, 'মিহিরদা, প্লিজ... আমার কথাটা একবার শুনুন। আমার মন বলছে, আমরা শেষের খুব কাছে চলে এসেছি।'

'কেন, মন বলছে কেন?'

'প্রিয়বরণের সঙ্গে কথা বলে আমার সেরকমই মনে হয়েছে। কাল আমাদের মলিনকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হবে। প্রিয় আমাদের টমকের কাছে নিয়ে যাবে... পাতালদেবতার কাছে।'

'তার মানে? কী বলছ তুমি!'

তখন আমি মিহিরদাকে সব বুঝিয়ে বলতে লাগলাম। আর ঝিমলি আমার গল্পের মাঝে-মাঝে সায় দিতে লাগল।

মিহিরদা পাতালদেবতার পাথর আর পুঁথির কথা আগেই ঝিমলির মুখে শুনেছেন। আমার কাছে জানতে চাইলেন, সে-ব্যাপারে প্রিয়বরণ কিছু আমাকে বলেছে কি না।

উত্তরে আমি মাথা নেড়ে বলেছি যে, না, আমার জিগ্যেস করা হয়নি।

শুধু সবুজ পাথর আর পুঁথির ব্যাপারে কেন, প্রিয়কে আমার অনেক কথাই জিগ্যেস করা হয়নি। ওর শেষদিকের কথাগুলোও আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি।

আমার সঙ্গে একঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কথা বলার পর মিহিরদার মাইগ্রেনের ব্যথা বোধহয় বেড়ে গিয়েছিল। কারণ, তিনি বারবার রগের কাছটা টিপে ধরছিলেন।

আলোচনা করে আমরা ঠিক করলাম যে, কাল বিকেলে আমরা মলিনদের বাড়িতে যাব। সেখানে প্রিয়বরণের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। তারপর ভাগ্য আমাদের যেদিকে নিয়ে যায়।

সারা রাত ধরে উথালপাথাল চিন্তা আমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলল। যেন

সাগরের বিশাল-বিশাল ঢেউয়ের মাথায় আমি উঠছি-নামছি, ভেসে বেড়াচ্ছি। এইরকম তোলপাড় আর দুলুনির মধ্যে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুমের মধ্যে বাপিকে স্বপ্নে দেখলাম—সেইসঙ্গে মা-কেও।

॥ সাতাশ ॥

বিকেলে মলিনদের বাড়িতে গিয়ে অন্য এক মলিনকে আবিষ্কার করলাম।

এমনিতে স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে ছেলেটা ঘরের মধ্যে আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি যেন পড়ে আছে অন্য জগতে। এ ছাড়া ওর গায়ের সেই গন্ধ—যে-গন্ধের কথা অনেকবার শুনেছি, কিন্তু নাকে এই প্রথম পেলাম।

এর আগে, রসময় সামন্ত যখন এই গন্ধটার কথা বলেছিলেন তখন মিহিরদা গন্ধটা কী ধরনের সেটা জানতে চেয়েছিলেন। রসময় সেটা ঠিকমতো বলতে পারেননি।

কিন্তু এখন, গন্ধটা নাকে আসার পর, আমি কোথায় যেন একটা চেনা ছাপ খুঁজে পেলাম। তাই মিহিরদা আর ঝিমলির দিকে তাকালাম।

ওরা আমার না-বলা প্রশ্ন যেন টের পেল। মিহিরদা হাতের সূক্ষ্ম ইশারায় আমাকে ধৈর্য ধরতে বললেন। আমি চুপ করে রইলাম। তবে মলিনকে খুব খুঁটিয়ে জরিপ করতে লাগলাম।

মিহিরদা রসময় সামন্তের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মলিন সম্পর্কে টুকটাক প্রশ্ন করছিলেন। আর আমি প্রিয়বরণের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এক্ষুনি হয়তো ও এসে পড়বে।

আজ সকালে উঠে বাপির ডায়েরিটা আবার পড়েছি। এখন আরও বেশি করে বুঝতে পারছি শেষদিকটায় এসে বাপি মারাত্মক কোনও সত্যের সন্ধান পেয়েছিল—কিন্তু সেসব কথা ডায়েরিতে লিখে যাওয়ার সময় বা সুযোগ পায়নি। যারা আমাদের ডায়েরিটা ফেরত চেয়ে টেলিফোনে ভয় দেখিয়েছে তারা এখনও জানে না, বাপির ডায়েরিতে কতটা লেখা আছে, আর কী লেখা আছে। হয়তো তারা ভাবছে, পাতালদেবতার ধ্বংসের সূত্র লেখা আছে ওই ডায়েরিতে।

না, ডায়েরিতে সে-কথা বাপি লিখে যায়নি কোথাও। কিন্তু সেই ধ্বংসের সূত্র আমি জানি। যদি অবশ্য বাঘমুন্ডি পাহাড়ের ওই অষ্টাবক্র গুণিনের কথা

সত্যি হয়।

মনে-মনে ঠিক করলাম, প্রিয়বরণকে পাথর আর পুঁথির কথা বলব না। দেখি ও সেগুলোর কথা আমাকে বলে কি না।

এ-কথাটা ভাবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মোটরবাইকের শব্দ পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, প্রিয় কি টেলিপ্যাথিও জানে!

প্রিয়বরণ এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই তাকাল আমার দিকে। সেই তাকানোর মধ্যে একটা চাপা টানাপোড়েন আর বেদনার ভাব আমাকে ছুঁয়ে গেল। বাইরে কোথাও কোকিল ডাকছিল। অকালের সেই ডাকটাকেও সেই মুহূর্তে কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হল আমার।

মলিন ছুটে গিয়ে প্রিয়কে জাপটে ধরল। পোষা ন্যাওটা মেনিবেড়ালের মতো প্রিয়র গায়ে মাথা-মুখ ঘষতে লাগল। প্রিয়ও ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল।

আমি প্রিয়বরণকে ভালো করে লক্ষ করছিলাম। অভ্যেসমতো সেজেগুজে এসেছে ও। গায়ে খয়েরি আর কালো চেক কাটা ফুলশার্ট। শার্টের দুটো হাতাই খানিকটা করে গোটানো। ডানহাতের কবজির ব্যান্ডেজটা অনেকটা টেনিস প্লেয়ারদের সাদা রিস্টব্যান্ডের মতো দেখাচ্ছে।

ব্যান্ডেজটা দেখে রসময় কিংবা সবিতা কোনও প্রশ্ন করলেন না দেখে বুঝলাম, কাল রাতে কিংবা আজ কোনওসময়ে প্রিয়বরণ এ-বাড়িতে এসেছিল।

ও খুব সহজভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'কেমন আছেন?' বলল। তারপর একইরকম সহজ ভঙ্গিতে রসময় সামন্তকে বলল, 'রসময়দা, আমরা মলিনকে নিয়ে একটু বেরোব।'

রসময় আর সবিতা প্রিয়বরণের দিকে চোখ ফেরালেন। রসময়ের কপালে ভাঁজ। সবিতার মুখে উৎকণ্ঠা।

প্রিয় আশ্বাসের ভঙ্গি করে বলল, 'চিন্তা করবেন না—আমি তো আছি।'

রসময় ইতস্তত করে বললেন, 'যদি কাক-টাক ওকে ঠোকরায়? এ সময় তো...।'

প্রিয় আবার ভরসা দিল ঃ 'সন্ধের মুখে আমরা বেরোব। তখন কাক-চিল বাসায় ফিরে যাবে। তা ছাড়া, আমি তো ওর পাশে-পাশে থাকছি। নিশ্চিন্ত থাকুন—।'

প্রিয়বরণের চোখে-মুখে একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ ছিল। সেটা দেখে রসময় আর সবিতা যেন বুঝতে পারলেন ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এ-সিদ্ধান্ত আর পালটানো যাবে না।

তবুও মায়ের মন। সবিতা হোঁচট খাওয়া গলায় জানতে চাইলেন, 'মলিনকে নিয়ে...কোথায় যাবেন?'

হাসল প্রিয় ঃ 'এই অযোধ্যা আর বাঘমুন্ডি একটু ঘুরে-ফিরে দেখব। তারপর—' আমাদের দিকে ইশারা করল ঃ 'ওঁদেরও একটু নানান জায়গা ঘুরিয়ে দেখাব।'

প্রিয় এবার মলিনের মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করল, 'কীরে, মলিন, আমার সঙ্গে যাবি না?'

মলিন উৎসাহে একেবারে লাফিয়ে উঠে বলল, 'যাব! যাব! যাব!'

তারপর একছুটে মায়ের কাছে চলে গেল মলিন। শাড়ি আঁকড়ে ধরে বায়না করার সুরে বলল, 'মা, আমি কাকুর সঙ্গে বেড়াতে যাব। বেড়াতে যাব, মা...।'

প্রিয়বরণ দু-হাত বাড়িয়ে মলিনকে ডাকল, 'আয়, কোলে আয়—।'

মলিন মায়ের শাড়ি ছেড়ে ছুটে এল প্রিয়র কাছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর দু-হাতের আশ্রয়ে। আর প্রিয়বরণও অতবড় খোকাকে কোলে তুলে নিল। ওর মাথায় গালে চুমু খেল। তারপর ওকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে আমাদের লক্ষ করে বলল, 'চলুন, সময় হয়ে গেছে—।' আর মলিনকে বলল, 'যা, চট করে একটা জামা গায়ে দিয়ে আয়।'

মলিন একছুটে পাশের ঘরে চলে গেল। একটু পরেই একটা হালকা নীল হাফশার্ট গায়ে দিয়ে ফিরে এল। তারপর প্রিয়র কাছে গিয়ে ওর হাতে চেপে ধরল।

আমরা উঠে পড়লাম। দেখলাম, রসময় আর সবিতা বারবার মলিনের দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু মলিনের সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ও বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহে প্রিয়বরণের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে।

বাইরে আকাশের আলো পড়ে এসেছে। পশ্চিমের দিকটা রাঙা হয়ে আছে। বাতাসে গরম ভাব। মাথার ওপরে সাদাটে নীল আকাশ। মাটি থেকে তাপ উঠছে। পাথর-কাঁকর সব যেন জলপিপাসায় হা-হা করছে। দেখে মনেই হয় না কাল দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে।

কাছেই দুটো ঝাঁকড়া গাছের নীচে গণপতির টাটা সুমো দাঁড়িয়ে ছিল। আমি প্রিয়বরণের সঙ্গে পা ফেলে হাঁটছিলাম। ওকে জিগ্যেস করলাম, 'এখন কেমন আছেন?'

ও হেসে বলল, 'ভালো। আপনি?'

'ভালো। কাল যেভাবে আমাকে আর ঝিমলিকে সেভ করেছেন, তার জন্যে...।'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রিয়বরণ বলল, 'ওসব কথা ছাড়ুন।'

'হাতের কাটা জায়গাটা কেমন আছে?'

'একটু ব্যথা আছে। এ ছাড়া মোটামুটি ঠিক আছে।'

'আপনার বাইক তো নিয়ে এসেছেন দেখছি—।'

'হ্যাঁ। আজ সকালে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা নিয়ে এসেছে।'

'ওরা মানে কারা?'

হাসল প্রিয় ঃ 'ওরা মানে যারা আমাদের দেবতাকে মানে, আবার আমাকেও মানে।'

শুনে আমার মনে হল, পাতালদেবতার যারা ভক্ত তাদের মধ্যেও বোধহয় কমবেশি দলাদলি আছে।

'আমরা কি এখন টমকের কাছে যাব?'

'হ্যাঁ—তাই তো যেতে চেয়েছেন আপনি!' আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ও।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। ওই সুড়ঙ্গে ঢুকব। দেখব আপনি কার পুজো করেন—।'

প্রিয় একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, 'দেবতা যদি দেখা দিতে চান তবে আপনি ওঁর দেখা পাবেন। দেখা যাক, ভাগ্যে কী আছে।'

আমরা গাড়ির কাছে এসে পড়েছিলাম। মিহিরদা মাঝের দরজাটা খুলে দিয়েছিলেন। ঝিমলি গাড়িতে না উঠে আমাকে আর প্রিয়কে দেখছিল।

হঠাৎই সামনের একটা গাছ থেকে কয়েকটা কাক কা-কা করতে-করতে উড়ে এল মলিনের দিকে। ওকে ঠোকরাতে চেষ্টা করল।

মলিন ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। দু-হাত শূন্যে ছুড়ে ও প্রিয়বরণকে জাপটে ধরল। আর প্রিয় সঙ্গে-সঙ্গে ওকে টেনে নিয়ে লাফিয়ে পৌঁছে গেল গাড়ির কাছে। সামনের দরজাটা এক হ্যাঁচকায় খুলে তড়িঘড়ি মলিনকে ঠেলে তুলে দিল গাড়িতে। তারপর নিজেও ওর পাশে উঠে বসল। 'দড়াম' শব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। জানলার কাচটা তুলে দিল ঝটপট।

কাকগুলো মলিনকে তাড়া করে উড়ে গিয়েছিল। যেভাবে ওরা ডাকাডাকি করছিল আর ডানা ঝাপটাচ্ছিল তাতে প্রিয়বরণ জানলার কাচ তুলে না দিলে ওরা হয়তো গাড়ির ভেতরেই ঢুকে পড়ত।

আমি, ঝিমলি আর মিহিরদা তাড়াতাড়ি মাঝের সিটটায় উঠে বসলাম।

প্রিয় ততক্ষণে চেঁচিয়ে গণপতিকে গাড়ি স্টার্ট দিতে বলেছে।

মিহিরদাও বললেন, 'জলদি চালাও!'

গণপতির গাড়ি এক ঝটকা দিয়ে ছুটতে শুরু করল। জানলা দিয়ে দেখলাম, কয়েকটা কাক তখনও গাড়ির পেছন-পেছন উড়ে আসছে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের

মধ্যেই ওরা অনেক পিছিয়ে পড়ল।

আমরা যখন পিচের রাস্তায় এসে পৌঁছলাম তখন কাকের ডাক আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু মলিনের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ভয়। ও প্রিয়বরণকে আঁকড়ে ধরে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। একবার বড়-বড় চোখ করে গাড়ির জানলার দিকে দেখছে, আবার পরক্ষণেই কোন এক অজানা আতঙ্কে চোখ বুজছে। ওর গায়ের গন্ধটা এখন আরও জোরালো। গন্ধটাকে ঠিক সুগন্ধ বলা না গেলেও দুর্গন্ধ কিছুতেই বলা যাবে না। বরং গন্ধটার মধ্যে একধরনের রহস্য যেন মিশে আছে।

আমি সামনের রাস্তার দিকে তাকালাম। কালো ফিতের মতো পিচের রাস্তা দিগন্ত পর্যন্ত গা এলিয়ে পড়ে আছে। তারপরই আকাশ। সেখানে স্লেট রঙের ফাঁকে-ফাঁকে লাল রঙের ছুরির ফলা। বিকেল আর সন্ধের সন্ধিক্ষণ। দিনের মৃত্যু আর রাতের জন্ম। এই অদ্ভুত সন্ধিক্ষণের দিকে তাকিয়ে মনে হল আকাশে কেমন এক বিষণ্ণতার তুলি বোলানো। আমরা হয়তো এখন, এই মুহূর্তে, এক দুঃখস্রোতের দিকে এগিয়ে চলেছি।

মিহিরদা একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সেটাতে টান দিয়েই তিন-চারবার কেশে উঠলেন। তারপর নিজেকে সামলে প্রিয়র হাতে টোকা দিলেন।

প্রিয়বরণ সামান্য পাশ ফিরে ঘুরে তাকাল মিহিরদার দিকে।

মিহিরদা বললেন, 'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোনও ভয় নেই তো?'

প্রিয়বরণ আমার চোখে একবার তাকাল। তারপর জানলার বাইরে উদাস চোখ মেলে বলল, 'ভয়?' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ঃ 'নাঃ, ভয় নেই। আর ভয় নেই।' হাসল ও ঃ 'আমরা যাঁর কাছে যাচ্ছি...তাঁকে ভয়ও ভয় পায়। ওঁর কাছে গেলে আমাদের আর কোনও ভয় থাকে না।'

প্রিয়র কথার হেঁয়ালি আমার মাথার মধ্যে জট পাকাচ্ছিল। ওকে আমি নানান রূপে দেখতে পাচ্ছিলাম। কখনও ও রসময় সামন্তের নিরীহ প্রতিবেশী, কখনও মলিনের ভালোবাসার 'কাকু', কখনও আমার প্রতি নরম...দুর্বল, আবার কখনও-বা তরোয়ালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করার মতো অসমসাহসী সুপটু যোদ্ধা।

আমার মনে হচ্ছিল, এই এক-একটা প্রিয় এক-একরকম—কোনওটার সঙ্গে কোনওটার মিল নেই।

আর এখন যে-প্রিয়বরণকে দেখছি!

শান্ত, উদাসীন, চোখে-মুখে আশঙ্কার লেশমাত্র নেই। ভবিতব্যকে এই প্রিয় এককণাও ডরে না।

আমাদের গাড়িটা মসৃণ পিচের রাস্তা ছেড়ে কখন যেন পাহাড়ি পথের দিকে বাঁক নিয়েছিল। সেটা খেয়াল করতে পারলাম চাঁদ দেখে। কালো আকাশে নেইলকাটার

দিয়ে কাটা রুপোলি নখের একটা টুকরো। অথচ ওইটুকু বক্ররেখার মধ্যেই কেমন যেন একটা বাঁকানো আঙুলের হাতছানির আভাস ছিল। আমাদের ডাকছে।

ঝিমলি চাপা গলায় আমাকে জিগ্যেস করল, 'মিস্টার অ্যাক্স এফেক্ট কী বলল কিছু বুঝতে পারলি?'

আমি জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রেখেই বললাম, 'উঁহু—সব ট্যান হয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'ঠিক বলেছিস। দিস ফেলো মাস্ট বি ক্রেজি।'

আমি এর কী জবাব দেওয়া যায় ভাবছিলাম। কিন্তু কিছু ভেবে ওঠার আগেই দূরে একটা আলোর শিখা দেখতে পেলাম।

অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। তবে তারই মধ্যে আরও গাঢ় গাছপালার অবয়বগুলো বোঝা যাচ্ছিল। আমাদের গাড়িটা ছোট-বড় গাছের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে ওপরে উঠছিল। পাশে তাকালে বেশ নীচে হলদে ফুটকির মতো লাইটপোস্ট কিংবা ঘর-বাড়ির আলো চোখে পড়ছিল। আর সামনে গভীর ছাই রঙের অন্ধকার।

এখন সেই অন্ধকারের বুক চিরে ফুটে উঠেছে কাঁপা আলোর শিখা।

আমাদের গাড়ি আরও বিশ কি তিরিশ গজ এগোতেই বুঝতে পারলাম, আলোটা মশালের আলো।

আলো যে একটা নয়, বেশ কয়েকটা, সেটা বুঝতে দু-মিনিট আর দু-চারশো গজ কেটে গেল।

মিহিরদা চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'গণপতি, গাড়ি থামাও!'

গণপতি সঙ্গে-সঙ্গে ব্রেক কষল। আমরা ঝাঁকুনিতে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

ঝিমলি চিৎকার করে উঠল, 'কী হল? কী হল?'

আমি বেসামাল শরীরটাকে আয়ত্তে নিয়ে এসে তাকালাম মিহিরদার দিকে: 'কী ব্যাপার, মিহিরদা?'

মিহিরদা সিগারেটটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে দম বন্ধ করা গলায় বললেন, 'অন্তরা, তোমরা—তুমি আর ঝিমলি—মধুসূদনের সঙ্গে একটা কুয়োর ভেতরে জলপড়া দিতে গিয়েছিলে মনে পড়ে?'

আমি মিহিরদার অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁর চোখের দৃষ্টি দেখতে চাইলাম। কিন্তু চশমার কাচের স্তিমিত চকচকানি আমাকে বাধা দিল। বললাম, 'হ্যাঁ—তো কী?'

'সে-রাতে তোমরা একটা মশালের মিছিল দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...।'

একটু দম নিয়ে মিহিরদা বললেন, 'এরা তারা। বোধহয় মশাল নিয়ে আমাদের পথে রুখে দাঁড়িয়েছে।'

মনে পড়ছিল সবই। মাত্র চারদিন আগের ঘটনা। সে-রাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছিল। গুনগুনিয়ে কেমন এক অদ্ভুত সুরে মিছিলের মানুষগুলো অপদেবতার পাঁচালি পড়ছিল। আর সেই মিছিলে ছিল স্বর্ণভূষণ তরফদার।

মিহিরদা ঠিকই বলেছেন। দূর থেকে মশালের আলোগুলো ধীরে-ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। আলোগুলোর ছন্দময় ওঠা-নামা যে লোকগুলোর চলার তালে-তালে, সেটাও আমি ভালোই বুঝতে পারছিলাম। যদিও একটি মানুষকেও আলাদা করে বোঝা যাচ্ছিল না।

'গণপতি, গাড়িটা ঘুরিয়ে নেওয়া যায়?' মিহিরদা যেন প্রশ্ন নয়, চাবুকের 'সপাং' ছুড়ে দিলেন।

'এখানে গাড়ি ঘোরানো অসম্ভব—।'

গণপতির কথা শেষ হতে-না-হতেই প্রিয়বরণ এতক্ষণ পর মুখ খুলল, 'আর কিছু করার নেই, মিহিরবাবু। ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দিন...।'

কথা বলতে-বলতে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল প্রিয়। নিজে নামল, মলিনকেও হাত ধরে টেনে নামাল। বিড়বিড় করে বলল, 'ওরা মোকাবিলা চাইছে। তো হোক মোকাবিলা। আমার কোনও দোষ ধোরো না গো, দেবতা...।'

আমি টেনশান আর সহ্য করতে পারছিলাম না। 'খটাং' করে ডানদিকের দরজা খুলে মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম।

মিহিরদা চেঁচিয়ে বললেন, 'অন্তরা! অন্তরা, কী করছ? গাড়ি থেকে নেমো না!'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পেছন ফিরে মিহিরদার দিকে তাকালাম।

তখনই প্রিয়বরণ কর্কশ গলায় প্রায় ধমকে উঠল, 'আপনারা শিগগির গাড়ি থেকে নেমে পড়ুন! গাড়িটা এবার বিপদে পড়বে...।'

কী করে বুঝল প্রিয়? কী করে বুঝল?

প্রশ্নটা মনের মধ্যে চলছিল, ধাক্কা মারছিল বারবার। তার মধ্যেই দেখলাম, ঝিমলি আর মিহিরদা লাফিয়ে নেমে পড়ছে গাড়ি থেকে। ঝিমলি আমার পাশে এসে প্রায় জাপটে ধরল আমাকে। মিহিরদা ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে জ্বাললেন। তারপর আলোটা উঁচিয়ে ধরলেন সামনের দিকে।

তক্ষুণি প্রিয় গাড়ির ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'টর্চ নেভান! টর্চ নেভান!'

সামনে টাটা সুমোর আড়াল থাকায় প্রিয়বরণ বা মলিনকে আমরা দেখতে

পাচ্ছিলাম না। কিন্তু প্রিয়র ফরমান কানে আসামাত্রই মিহিরদা টর্চ নিভিয়ে দিলেন।

মিহিরদার টর্চের আলো সামনে ছিটকে পড়লেও সেই আলোয় তেমন কিছু প্রকাশিত হয়নি। শুধু একঝলক দেখা গেছে গাছপালা, রুক্ষ রাস্তা, আর পাথর।

প্রিয় আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই গাড়ি ছেড়ে সামনে এগিয়ে চলুন! শিগগির! আর দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে! নামুন গাড়ি থেকে!'

শেষ আদেশটা গণপতিকে লক্ষ করে। ও একাই গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে ছিল।

প্রিয়বরণের শেষ কথাটায় এমন এক তীব্র জোর ছিল যে, গণপতি একলাফে স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে এল মাটিতে।

প্রিয় মলিনকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে সামনে এগোল। আমাদেরও বলল, চটপট সামনে এগোতে।

ঠিক তখনই আকাশে নীল বিদ্যুতের তরোয়াল ঝিলিক মারল। ক্যামেরার ফ্ল্যাশগানের মতো সেই আলো আমাদের গায়ে ঝলসে উঠল। তারপরই শোনা গেল বাজ পড়ার ভয়ঙ্কর কড়কড় শব্দ। সেই ভীষণ আওয়াজ পৃথিবীকে যেন ফুটিফাটা করে চৌচির করে দিল। শব্দে আমাদের কানে তালা লেগে গেল।

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি চাঁদ আর নেই। গোটা আকাশটা এক অলৌকিক মেঘে ছেয়ে গেছে। অলৌকিক এই কারণে যে, একটু আগেও আকাশে কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না।

প্রথমবারের ঘোর কাটতে-না-কাটতে নীল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আবার। আবার পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল।

আমরা তখন পড়িমরি করে সামনে ছুটছি। অন্ধকারে অন্ধের মতো ছুটে চলেছি। কখনও হোঁচট খাচ্ছি, কখনও দিক ভুল করে ফেলছি। শুনতে পাচ্ছি, নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। কামারশালায় যেন হাপর চলছে।

ঠিক তখনই আকাশ থেকে একটা বিদ্যুতের শিখা তীরের মতো নীচে নেমে এল। এবং সেই হানাদার বিদ্যুৎ আমাদের গাড়িটাকে ছোবল মারল।

চোখের পলকে টাটা সুমোটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গাড়িটা ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছিটকে গেল। গাড়ির আগুনে জঙ্গলে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল।

আকাশ থেকে বিদ্যুৎশিখাটা নেমে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আমি পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম। আগুন এবং বিস্ফোরণের ওই দৃশ্য দেখার পর আমি পাথর হয়ে

গেলাম। আমার সারা শরীর আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লাগল। কী আশ্চর্যভাবেই না আমরা বেঁচে গেলাম! এক অদ্ভুত আবেগে আমার চোখে জল এসে গেল।

ঝিমলি আমার হাত ধরে টান মারতেই সংবিৎ ফিরে পেলাম। আবার ছুটতে শুরু করলাম।

॥ আটাশ ॥

যখন জ্বলন্ত টাটা সুমো থেকে আমরা নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছি তখন কিন্তু আমরা চলে এসেছি নতুন বিপদের আরও কাছাকাছি। যদিও সেটা বুঝতে পারিনি।

আকাশে মেঘ থেকে-থেকেই হুমকি দিচ্ছিল। তার সঙ্গে কখনও-কখনও বিদ্যুৎরেখা। এগুলো বৃষ্টির আগাম সংকেত কি না জানি না, তবে মনে হচ্ছিল, প্রিয়র দেবতা যদি না চান তা হলে বৃষ্টি হবে না।

আমি আর ঝিমলি ভীষণ হাঁপাচ্ছিলাম। আমাদের জোড়া নিশ্বাসের শব্দ সাপের ফোঁসফোঁসের মতো শোনাচ্ছিল।

ঝিমলি ছুটতে-ছুটতেই বলল, 'অন্তরা, আমি এক্‌জস্টেড—আর পারছি না।'

আমার অবস্থাও ওর চেয়ে কিছু ভালো ছিল না। একটু থামলে পরে ভালো হত।

ঠিক সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম প্রিয়বরণের গলা, 'এবার থামুন। এদিকটায়—গাছের পাশটায় সরে দাঁড়ান।'

আমরা থমকে দাঁড়ালাম। তারপর হাতধরাধরি করে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগলাম। অন্ধকারে এদিক-ওদিক নজর চালিয়ে প্রিয়বরণকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওকে বা মলিনকে দেখতে পেলাম না। হয়তো ওরা কোনও গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

তাড়াহুড়োর মধ্যে মিহিরদাকেও আমরা এতক্ষণ খেয়াল করিনি। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ওপরে নজর রাখছিলেন। হঠাৎই কোথা থেকে যেন আঁধার ফুঁড়ে এসে হাজির হলেন আমাদের কাছে। সঙ্গে গণপতি।

মিহিরদা হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'তোমরা ঠিক আছ তো?'

আমি খসখসে গলায় বললাম, 'হ্যাঁ—।'

তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করলাম, 'প্রিয় কোথায়?'

মিহিরদা এদিক-ওদিক নজর চালিয়ে বললেন, 'কোথায় গেল? এই তো

একটু আগে দেখলাম...।'

গণপতি বলল, 'উনি আর বাচ্চাটা তো বামদিক ঘেঁষে ছুটছিলেন...।'

বলতে-বলতেই প্রিয়বরণকে দেখতে পেলাম। মলিনের হাত ধরে একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে।

অন্ধকারে ওদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু দেখতে পেলাম মলিনের জন্যে। কারণ, ওর গা থেকে এখন শুধু গন্ধ নয়—হালকা একটা আলোর আভাও বেরোচ্ছে।

ওর ছোট্ট শরীরের খোলা অংশ থেকে অদ্ভুত এক সবুজ আলোর আভা ঠিকরে বেরোচ্ছিল। অনেকটা ভোরের কুয়াশার মতো। যেন কোমল আদরে বাচ্চাটাকে ঘিরে রয়েছে।

আমরা চারজন অবাক হয়ে মলিনকে দেখতে লাগলাম।

ওরা কাছে এলে প্রিয়কে জিগ্যেস করলাম, 'মলিনের গা থেকে ওরকম আলো বেরোচ্ছে কেন?'

প্রিয় চাপা গলায় বলল, 'কিছু মনে করবেন না। এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। আর জানলেও এখন সেসব উত্তর দেওয়ার সময় নয়। এখন সামনে বিপদ।'

ওর কথায় খেয়াল হল। তাই বিপদের দিকে তাকালাম। দেখলাম, এর মধ্যে বিপদ অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। এত কাছে যে, মশালের আলোয় কয়েকটা মুখের আবছা আঁকিবুকি নজরে পড়ছে।

আমাদের চারপাশ এখন অন্ধকার। জোনাকির দল উড়ছে এখানে-ওখানে। বাতাসের গরম ভাবটা ধীরে-ধীরে কেটে যাচ্ছে। বাতাসের গতি বেড়েছে। কালো-কালো গাছগুলো হেলছে দুলছে। আঁধার থেকে ভেসে আসছে পোকামাকড়ের চিৎকার। সেইসঙ্গে নিশিফোটা ফুলের বুনো গন্ধ।

প্রিয়বরণ আমাদের সবাইকে লক্ষ করে বলল, 'আর এগোনোর দরকার নেই। সবাই এখানটায় দাঁড়ান। আমি আর মলিন একটু সামনে এগোচ্ছি...।'

আমি, ঝিমলি, মিহিরদা আর গণপতি একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছিল। এখন কী হবে কে জানে!

প্রিয়বরণ মলিনকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিহিরদা পেছন থেকে ওকে চেঁচিয়ে ডাকলেন ঃ 'মলিনকে আমাদের কাছে রেখে যান। ও ওইটুকু ছেলে—ওর কোনও বিপদ হলে...।'

প্রিয় পেছন ফিরে তাকাল। নিচু গলায় বলল, 'ওকে নিয়ে ভাববেন না। ও আমাদের সবার রক্ষাকবচ...।'

মিহিরদা কিংবা গণপতির তুলনায় আমি আর ঝিমলি প্রিয়বরণের কাছাকাছি

ছিলাম। তাই আমরা ওর জবাবটা শুনতে পেলেও মিহিরদারা শুনতে পেলেন না।

মিহিরদা শুধু দেখলেন, ওঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে প্রিয়বরণ মলিনকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'প্রিয়বরণ কী বলল, অন্তরা?'

আমি ছোট্ট করে শুধু বললাম, 'উনি বললেন মলিনের কোনও ভয় নেই।'

মিহিরদা 'ও—' বলে গণপতির সঙ্গে কীসব কথা বলতে লাগলেন।

তখন ঝিমলি আমাকে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'রক্ষাকবচ মানে কী রে?'

এরই নাম ঝিমলি। কিন্তু উপায় কী! তাই বাধ্য হয়ে বললাম, 'রক্ষাকবচ মানে বলতে পারিস...সাম সর্ট অফ ট্যালিজম্যান...উইথ অকাল্ট্ পাওয়ার...ও. কে.?'

'ও. কে.—।' বলল ঝিমলি।

সামনে তাকিয়ে লক্ষ করলাম, মশালগুলো আমাদের কাছ থেকে প্রায় একশো ফুট দূরত্বের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যায় প্রায় দশ-বারোটা হবে। লালচে-হলুদ শিখাগুলো লকলক করে কাঁপছে। দু-চারটে আগুনের ফুলকি শিখাগুলো থেকে ছিটকে ভেসে যাচ্ছে ওপরদিকে।

আমরা চোখ বড়-বড় করে প্রিয়বরণ আর মলিনকে দেখছিলাম। মশালের আলোর পটভূমিতে ওরা তখন সিল্যুয়েট কালো ছায়া। আর মশালধারীদের কালো চকচকে মুখে চঞ্চল আলো খেলা করছে।

এমন সময় শত্রুদের একজন তার হাতের মশালটাকে ওপরদিকে উঁচিয়ে ধরে এক অদ্ভুত চিৎকার করে উঠল।

সে-চিৎকার থামতেই বাকিরা একই সুরে ডেকে উঠল। ডাকটার মানে না বুঝলেও ব্যাপারটা অনেকটা যুদ্ধের জিগিরের মতো শোনাল।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এখুনি একটা লড়াই বাধবে নাকি!

যদি সত্যি-সত্যি লড়াই শুরু হয় তা হলে তো গেছি!

মশালের সংখ্যা দশটা কি বারোটা হলেও লোকসংখ্যা যে আরও বেশি সেটা এই দূরত্ব থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে।

সেই আশঙ্কার কথাই মিহিরদাকে বললাম।

মিহিরদা শত্রুদলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার কথায় বিড়বিড় করে বললেন, 'আমরা কোথায় আর পালাব, অন্তরা! আমাদের আর ফেরার পথ নেই। তা ছাড়া, তুমি তো ওই গুহার মধ্যে ঢুকতে চেয়েছিলে...।'

'ও—।'

এই থইথই বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমার কেমন যেন অভিমান হল। আমিই তা হলে সব বিপদের জন্যে দায়ী? তা তো হবেই! কারণ, বাপি যে শুধু আমার বাপি—আর কারও নয়।

ঝিমলি আমার হাতটা চেপে ধরেছিল। তার জন্যেই বোধহয় আমার প্রতিক্রিয়াটা অনুভব করতে পারল। হয়তো আমার হাতের পেশি পলকে একটু বেশি শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

ও তাড়াতাড়ি বলল, 'ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড, অন্তরা। মিহিরদা যেটা বলতে চাইছেন...এখন ভয় পেলে চলবে না। তা ছাড়া, আমরা পালিয়ে যাবই বা কোথায়! গাড়ি নেই, রাস্তা অন্ধকার...শিট...।'

মিহিরদা অন্ধকারেই আমার কাঁধে হাত দিলেন ঃ 'অন্তরা, শক্ত হও। তোমারই কথাতে...আমরা শেষের খুব কাছে এসে গেছি। শুড নট টার্ন ব্যাক নাউ, উড য়ু?'

'সরি, মিহিরদা—।'

নিচু গলায় এ-কথা বলতে না বলতেই দ্বিতীয়বার চিৎকারটা শোনা গেল। চিৎকারের ঢংটা আগের মতো হলেও এবারের জিগির আরও তীব্র, আরও রুক্ষ।

আমরা সবাই সেদিকে ফিরে তাকালাম।

গণপতি মিহিরদাকে জিগ্যেস করল, 'এসব কী ব্যাপার, স্যার? নানারকম বিপদ-আপদ আপনাদিগের সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে—।'

'আমরা খবরের কাগজের লোক—এখানে একটা খবরের খোঁজে এসেছিলাম। তারপর...তারপর যেসব কাণ্ড দেখছি তাতে আমাদেরই মগজটা গুলিয়ে গেছে—।'

দ্বিতীয় চিৎকারটা মিলিয়ে যাওয়ার মিনিটখানেকের মধ্যে দেখলাম, দুটো মশাল জটলা ছেড়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তাদেরই একজন চিৎকার করে বলল, 'অবিশ্বাসীদের দেবতার থানে যেতে দিব না। কিছুতেই না।'

প্রিয়বরণ চেঁচিয়ে পালটা জবাব দিল, 'ওঁরা অবিশ্বাসী নয়। দেবতা নিজে ওঁদের ডাক দিয়েছেন। আমাকে আদেশ করেছেন, ওঁদের পথ দেখাতে।'

'মিছা কথা। তুই পাপী। তুই ওই থানে গেলে বিরবাও হবে। তাতে সব নাস হবে।'

প্রিয় একটা হাত ওপরে তুলে বলল, 'দ্যাখো আমার সঙ্গে কে আছে। আমাদের কেউ নাস করতে পারবে না। আমরা থানে যাবই...।'

আমি প্রিয়র দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওর রুখে দাঁড়ানো কথাবার্তা শুনছিলাম। যখন ও বলল, 'দ্যাখো আমার সঙ্গে কে আছে...' তখন ও হাতের ইশারা করে মলিনকে দেখিয়েছে।

মিহিরদা অস্ফুটে বললেন, 'আশ্চর্য!'

তাতে বুঝলাম, ব্যাপারটা মিহিরদাও লক্ষ করেছেন এবং অবাক হয়েছেন।

'তুই তা হলে আমাদের কথা শুনবি না?' রাগী গলায় জানতে চাইল শত্রু।

'না, না, না!' অবাধ্যের মতো চেঁচিয়ে জবাব দিল প্রিয়।

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা অচেনা ভাষায় কী একটা বলে হুঙ্কার দিল। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে মন্ত্র পড়ার মতো কীসব বলতে লাগল।

লোকটার মন্ত্র পড়া চলছিল। তার মধ্যেই দেখি একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া গাছ মড়মড় করে হেলে পড়তে লাগল।

গাছটা ছিল প্রিয়বরণ আর মশালধারী দুজনের মাঝামাঝি জায়গায়। অন্ধকারে মশালের আলো বড় কম নয়। স্পষ্ট দেখলাম, অতবড় দীর্ঘ সবল গাছটা কোন এক অলৌকিক ধাক্কায় ধীরে-ধীরে হেলে পড়ছে। শক্ত পাথুরে মাটি থেকে শেকড় ছেঁড়ার শব্দ হচ্ছে। আশপাশের গাছের সঙ্গে শাখাপ্রশাখার সংঘর্ষে ডাল ভাঙছে, মটমট শব্দ হচ্ছে। গাছের ডালপালায় ঘুমিয়ে থাকা পাখির দল আচমকা আলোড়নে জেগে উঠেছে। দিগভ্রান্তের মতো ওড়াউড়ি করছে, তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করছে। মশালের আলোয় ছটফটে শরীরগুলো কখনও-কখনও একঝলকের জন্যে দেখা যাচ্ছিল।

আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে না দেওয়ার জন্যে পথ বন্ধ করার এই আলৌকিক প্রক্রিয়া আমি মুগ্ধ ভয়ে দেখতে লাগলাম।

অন্যান্য গাছের ডালপালায় ধাক্কা খেয়ে ভারী গাছটার পড়তে সময় লাগছিল। মনে হচ্ছিল, স্লো মোশানে সিনেমা দেখছি।

কিন্তু সিনেমা দেখার অনেক বাকি ছিল।

হঠাৎই মশালধারী শত্রুর দল উলুধ্বনি দিতে শুরু করল। ফলে পুরো ব্যাপারটায় একটা পুজো-পুজো ভাব এসে গেল। মশালের আলোয় দেখলাম, ওরা অনেকেই কপালে হাত ঠেকিয়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করছে।

গাছটা যেভাবে পড়ছিল তাতে প্রিয়বরণ বা মলিনের আঘাত পাওয়ার কথা নয়। আর আমরা তো বেশ খানিকটা পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

কিন্তু প্রিয় ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারল না। ওর বোধহয় মনে হল, গাছটা আমাদের পথ জুড়ে পড়া মানেই কালো ম্যাজিকের লড়াইয়ে প্রথম রাউন্ডে হেরে যাওয়া। কারণ, দেখলাম, প্রিয় অসম্ভব ছটফট করতে লাগল।

তারপরই ও হিংস্রভাবে চিৎকার করে মলিনকে বলল, 'মলিন! মলিন! এবারে দেখিয়ে দে, কে বড় কে ছোট! দেখিয়ে দে, কে ওপরে কে নীচে!'

মলিন আর দেরি করল না। ওর ছোট্ট শরীরটা ডানপাশে হেলিয়ে দিল। তারপর বাঁ-হাতটা তুলে ধরল শূন্যে—পাঞ্জা টান-টান করে পাঁচটা আঙুল পঞ্চমুখী শঙ্খের মতো ছড়ানো।

তারপরই যা দেখলাম তা ভাষায় লিখে বোঝানো খুব কঠিন। তবুও চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?

মলিনের ছড়ানো আঙুলের ডগা থেকে ছিটকে বেরোল পাঁচ-পাঁচটা নীল

বিদ্যুৎশিখা। দেওয়ালিতে পোড়ানো ইলেকট্রিক তারের মতো আলোর ফিনকি দিয়ে সেই পঞ্চমুখী বিদ্যুৎরেখা পৌঁছে গেল পড়ন্ত গাছটার কাছে। ওয়েল্ডিং করার সময় যেমনটা হয়—গাছটা পঞ্চমুখী বিদ্যুৎরেখায় ঝলসে গেল। তার প্রকাণ্ড কাণ্ডটায় আগুন ধরে গেল। তখনও মলিনের বিদ্যুৎ পাঁচটা নীল আগুনের তুলি দিয়ে গাছটার সর্বাঙ্গ দুরন্ত বেগে চাটছে। বিদ্যুতের ঝিলিক খুশিতে পাগল হরিণের মতো নাচতে-নাচতে ছুটে বেড়াচ্ছে ওপর থেকে নীচে, নীচ থেকে ওপরে।

গাছটা যতটা হেলে পড়েছিল তারচেয়ে এক ডিগ্রিও বেশি হেলল না। সেই অবস্থাতেই স্থির হয়ে নিরুপায় সতীর মতো জ্বলে ছাই হতে লাগল। আশ্চর্য! তার গায়ের আগুন কোন এক চমৎকারী শাসনে অন্যান্য গাছের গায়ে এককণাও ছড়িয়ে পড়ল না।

আশপাশের গাছের পাখির দল নিশ্চিত ঘুম ছেড়ে এলোমেলো ওড়াউড়ি করছিল, ভয়ে ডাকাডাকি করছিল। তুমুল হট্টগোলে নিস্তব্ধ জঙ্গল ছেয়ে গেল।

আমরা সবাই অবাক হয়ে গোটা দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলাম আর ভাবলাম, গত জন্মে কত পুণ্য করলে এ-জন্মে এরকম একটা অপরূপ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়।

মলিন! মলিন! এত শক্তি তোর! কোথা থেকে এত শক্তি পেলি তুই?

দৃশ্যটা দেখে আমরা যেমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, তেমনই হতচকিত হয়ে গিয়েছিল অপরপক্ষও। ওরা পাতালদেবতার যতই গভীর ভক্ত হোক, এরকম দৃশ্য ওরাও দেখেনি কখনও।

কাঠ-পোড়া গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সেইসঙ্গে ধোঁয়া আর ছাইয়ের গুঁড়ো। চড়চড় শব্দে গাছটা পুড়তে লাগল আর আগুনের ফুলকি উড়তে লাগল আকাশে।

বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও আগুনের তাপ আমরা অনুভব করতে পারছিলাম। একইসঙ্গে বাপির ডায়েরির কথা মনে পড়ছিল আমার ঃ '...মলিন সামন্ত ছেলেটার অনেক আশ্চর্য গুণ আছে। ওকে কলকাতায় নিয়ে গেলে বেশ হয়...।'

কিন্তু বাপি মলিনের এইরকম গুণের কথা কি জানত?

মিহিরদা কয়েকবার কাশলেন। হয়তো ধোঁয়ার দূষণ ওঁকে বিব্রত করেছে।

কাশি থামলে মিহিরদা বললেন, 'অ্যাস্টাউন্ডিং, অন্তরা। চোখের সামনে এসব দেখছি বলে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না।'

আমি শুধু বললাম, 'আজকের ইলেকট্রনিক্স আর কম্পিউটারের যুগে এসব কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। আজগুবি বলে উড়িয়ে দেবে।'

গণপতি বারবার ভক্তিভরে কপালে হাত ঠেকাচ্ছিল।

মিহিরদা কয়েকবার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মলিনের নানান পিকিউলিয়ারিটির সঙ্গে ওর এই অকাল্ট্ পাওয়ার নিশ্চয়ই কানেক্টেড। ওর সেইসব বহু পুরোনো ঘটনা মনে করে বলার ব্যাপারটা...মানে, জন্মান্তর টাইপের, তাই না?

আমি বললাম, 'একটু আগেই প্রিয় বলছিল, মলিন আমাদের সবার রক্ষাকবচ। এখন তার মানে বুঝলাম।'

ঝিমলি বলল, 'অন্তরা, সামহাউ আমার মনে হচ্ছে, মলিন ইজ সো পাওয়ারফুল যে, ও সঙ্গে থাকলে আমাদের আর কোনও ভয় নেই।'

আমি ওর কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'আমারও তাই ধারণা—।'

॥ উনতিরিশ ॥

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অতবড় গাছটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জানি না, আগুনের শিখার উষ্ণতা কত হলে এরকম একটা গাছ শূন্যে দাঁড়িয়ে এত অল্প সময়ে ছাই হয়ে যেতে পারে।

আগুন যে কোথাও ছড়িয়ে পড়েনি সে-ব্যাপারটা আমাকে অবাক করেছিল। বারবার ভাবছিলাম, এরকম অলৌকিক অগ্নিবাণের শিক্ষা মলিন পেল কোথায়!

আগুন জ্বলে ওঠার শুরু থেকেই ঝোড়ো বাতাস বইছিল। গরম বাতাস ওপরে উঠছিল আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে ঠান্ডা বাতাস আশপাশ থেকে পাগলের মতো ছুটে আসছিল। বাতাসের পোড়া গন্ধ আমাদের নাকে ধাক্কা মারছিল।

এই ঘটনায় আমরা যেমন অবাক হয়ে গেছি শত্রুপক্ষও তেমনই ধাক্কা খেয়েছে। তাকিয়ে দেখি ওদের কেউ-কেউ হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে হাতজোড় করে কোন এক অজানা দেবতার কাছে কৃপাভিক্ষা চাইছে। যেন আর কোনও সর্বনাশ ওদের দেখতে না হয়।

মলিন প্রিয়বরণকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর অবাক চোখে আগুনের শিখার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এইমাত্র যে-অলৌকিক চলচ্চিত্র আমরা দেখলাম, আমাদের মতো মলিনও তার হতবাক দর্শক। অথচ ও-ই যে সেই চলচ্চিত্রের মহানায়ক, সেটা কিছুতেই এখন আর বোঝার উপায় নেই।

শত্রুপক্ষের দিকে তাকিয়ে প্রিয়বরণ চিৎকার করে উঠল, 'এবার পথ ছাড়ো। আমরা দেবতার থানে যাব।'

চিৎকারটা শেষ হতে-না-হতেই অপরপক্ষের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল।

আন্দাজে বুঝলাম, প্রিয়বরণের পক্ষে-বিপক্ষে আওয়াজ উঠেছে। এখন আমাদের চুপ করে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

গাছের আগুন আর নেই। তাই মশালের স্তিমিত আলোয় মলিনের গা থেকে বেরোনো আভাটা আবার নজরে পড়ছিল।

প্রিয় আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'পথ ছাড়বি কি না বল্?'

ওপাশ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু ওরা যে পথ ছাড়তে রাজি সেটা ওদের আচরণে বোঝা গেল।

দেখলাম, মশালগুলো নড়তে শুরু করল, ধীরে-ধীরে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল, আর আমাদের ঘিরে অন্ধকার বাড়তে লাগল।

প্রিয়বরণ মলিনকে নিয়ে আমাদের কাছে চলে এল, চাপা গলায় বলল, 'এবার আমাদের এগোতে হবে। তবে একটা কথা...।'

মিহিরদা জিগ্যেস করলেন, 'কী কথা?'

'আপনারা সবাই আমার সঙ্গে যেতে চান তো?'

মিহিরদা গণপতির কাছে গেলেন। ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'গণপতি, এ-ঝামেলায় তুমি ঢুকো না। তুমি বরং...।'

গণপতি শব্দ করে হেসে ফেলল : 'স্যার, আমার গাড়ি তো আর নেই। এই আঁধারে জঙ্গলে-জঙ্গলে একা-একা ঘুরব কি মরার জন্যে? এই জঙ্গলে কত্তরকম জানবার আছে জানেন! পলক ফেলতে-না-ফেলতেই আমায় কপাত করে গিলে নিয়ে হজম করে দেবে। তার চে' আমার এটাই ভালো। আপনাদের কাছ ছেড়ে আমি নড়ছি না। তা ছাড়া এই যে ছোট ছেলেটা—ও থাকলে আমার আর ভয় নেই।'

সত্যিই তো! গণপতি এখন যাবে কোথায়! ওর ভাগ্য এখন আমাদের সঙ্গে একই কালিতে লেখা হয়ে গেছে।

প্রিয়র নির্দেশে আমরা সামনে পা ফেলে এগোতে লাগলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, মলিনের কাণ্ড দেখার পর আমাদের দুরুদুরু বুক অনেক শান্ত হয়েছে।

ঘাস-পাতা-মাটি-ছাই মাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। এ-পথ আমার চেনা হওয়ার কথা, কিন্তু অন্ধকার আর নানান ঘটনায় সব কেমন গুলিয়ে গেছে।

কতক্ষণ পথ চলেছি খেয়াল নেই, হঠাৎই ঝরনার জলের শব্দ পেলাম।

আমরা তা হলে টমকের কাছাকাছি চলে এসেছি!

সত্যিই তাই। কারণ, আরও খানিকটা এগোনোর পর প্রিয়বরণ আমাদের থামতে বলল। এখন শুধু ঝরনার শব্দ নয়, তার ঝিরিঝিরি জল আবছাভাবে দেখতেও পাচ্ছি। ওই তো, একপাশে গাঢ় ছায়ার মতো তিনটে পাথর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

প্রিয়বরণ মিহিরদাকে বলল, 'মিহিরবাবু, আপনার টর্চটা আমাকে দিন।'

মিহিরটা ঝোলা-ব্যাগ হাতড়ে টর্চটা বের করে প্রিয়কে দিল। প্রিয় সামনের দিক তাক করে টর্চ জ্বালল।

চোখে পড়ল ঝরনার জল বয়ে চলেছে। ঢুকে গেছে ঘন গাছপালার ঝোপের আড়ালে।

এটাই তো সুড়ঙ্গের পথ।

প্রিয় টর্চ হাতে সেই গাছপালার ঝোপের দিকে এগোল, বলল, 'আপনারা আমার পেছন-পেছন আসুন—।'

গাছের ডাল, লতাপাতা ঠেলে সরিয়ে ও মলিনকে সঙ্গে করে ভেতরে ঢুকে গেল। ঠিক যেন পরদা সরিয়ে কেউ গ্রিনরুমে ঢুকল। আমরাও ওর দেখাদেখি ঢুকে পড়লাম।

ভেতরে ঢুকতেই একটা ঝাঁজালো মিষ্টি গন্ধ টের পেলাম। তা ছাড়া, টর্চের সামান্য আলোয় যা দেখলাম তাতে মনে হল আমরা একটা প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

আমাদের দুপাশে পাথরের দেওয়াল। তার নানান ফাঁকফোকরে ঘাস কিংবা আগাছা ছেয়ে আছে। মেঝেটা ঢালু হয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নামছে। তারই একপাশ দিয়ে কুলুকুলু করে ঝরনার জল বয়ে চলেছে।

আমাদের সামনেটা অন্ধকার। টর্চ তাক করলেও শুধু অন্ধকারই চোখে পড়ছে। আর শোনা যাচ্ছে পোকামাকড়ের ডাক।

সুড়ঙ্গের স্যাঁতসেঁতে বাতাসে দম-চাপা একটা পুরোনো গন্ধ ছিল। যেন এই বাতাসটা হাজার-হাজার বছর ধরে একইভাবে বন্দি হয়ে আছে। তবে মিষ্টি গন্ধটা সঙ্গে মিশে থাকায় বাতাসের গন্ধটা অসহ্য মাত্রায় যায়নি। তা ছাড়া, বুঝতে পারছিলাম, একটু পরেই গন্ধটা আমাদের নাকে সয়ে যাবে।

প্রিয়বরণ এদিক-ওদিক টর্চের আলো ফেলছিল, সময় নিয়ে সামনে পা ফেলছিল। আর মাঝে-মাঝেই আমাদের লক্ষ করে বলছিল, 'সাবধানে আসুন—।'

ঝিমলি চলতে-চলতে হঠাৎ টাল খেয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে সামলে নিল। প্রায় ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, 'আমরা একজ্যাক্টলি কোথায় যাচ্ছি বল্ তো?'

আমি বললাম, 'জাহান্নমে।'

'জাহান্নমে?'

'হ্যাঁ—হুইচ মিন্‌স হেল। আমরা হেলগড়ের খোঁজে চলেছি।'

ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে ঝিমলি চুপ করে গেল।

অন্ধকারে চলতে-চলতে আমার বাপির কথা খুব মনে পড়ছিল। না,

অপদেবতার এই সুড়ঙ্গ বাপি দেখেনি। দেখলে বাপির ডায়েরিতে সে-কথা নিশ্চয়ই লেখা থাকত। তবে মলিনের অ্যাবনরমাল ব্যাপারটা বাপি বোধহয় আঁচ করেছিল—যদিও ওর সুপারন্যাচারাল পাওয়ারের নমুনা বাপি হয়তো দেখে যেতে পারেনি।

মধুদার কথা মনে পড়ল আমার। বারবারই মনে হচ্ছিল, মধুসূদন আমাদের সঙ্গে থাকলে ষোলোকলা পূর্ণ হত। মধুদা বলেছিল, অপদেবতার হাতে পড়ে যে একবার অঙ্গ খুইয়েছে তার আর কোনও ভয় নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, দেবতার চেয়ে তার ভক্তরা কিছু কম ভয়ংকর নয়। তারাও নানান ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার মালিক। কপাল ভালো যে, প্রিয়বরণকে আমরা সঙ্গে পেয়েছিলাম। ও না থাকলে আজ এই পর্যন্ত আমরা এসে পৌঁছতাম না।

আনমনে কত কথাই না ভাবছিলাম। আচমকা 'সাপ! সাপ!' চিৎকারে ঘোর কাটল।

চিৎকারটা করেছে গণপতি। কারণ, প্রিয়বরণের টর্চের আলোয় সুড়ঙ্গের দেওয়াল ঘেঁষে চলা একটা লম্বা কালো সাপ ও দেখতে পেয়েছে।

প্রিয় সঙ্গে-সঙ্গে 'শ্-শ্-শ্-শ্...' শব্দ করে চিৎকার থামাতে বলেছে আর টর্চের আলোর বর্শা সাপটার দিকে তাক করেছে।

আলো পড়তেই সাপটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাথরের টুকরোর খাঁজে-খাঁজে ওর শরীরটা চার-পাঁচটা ঢেউখেলানো ভাঁজ হয়ে রয়েছে।

সাপটা লম্বায় প্রায় সাত-আট ফুট হবে। কুচকুচে কালো গায়ের রং। টর্চের আলোয় ওটার শরীর এমন চকচক করছে যেন সারা গায়ে লালা মাখানো। সাপটা মাথা ঘুরিয়ে টর্চের আলো বরাবর তাকিয়েছিল। ওটার চোখ কাচের গুলির মতো ঝকঝক করছিল। আর উত্তেজনায় প্রাণীটা ফোঁসফোঁস করছিল।

ঝিমলি ভয় পেয়ে প্রায় কেঁদে উঠল। প্রিয়কে লক্ষ করে বলল, 'আপনি হঠাৎ ওটার ওপর আলো না ফেললে আমরা ওটার কামড়েই মারা যেতাম।'

প্রিয় শান্তভাবে বলল, 'আপনাদের কোনও ভয় নেই, ম্যাডাম। আমাদের সঙ্গে মলিন আছে।'

কথাটা বলে মলিনের দিকে ঘুরল প্রিয়, ডাকল ছেলেটাকে ঃ 'মলিন, সাপটাকে কী করবি কর...।'

কথাটা বলতে যতটুকু সময় লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে মলিন চিতার ক্ষিপ্রতায় একলাফে সাপটার সামনে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল।

এবং এক মুহূর্ত দেরি না করে সাপটা মলিনকে ছোবল মারল।

আর মলিন? বেজির তৎপরতায় ও পালটা ছোবল মারল। ডানহাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল সাপটার গলা। সাপটা হাঁ করে বাতাসে কামড় বসাল কয়েকবার।

এদিকে মিহিরদা, গণপতি আর ঝিমলি ভয়ে আশঙ্কায় চাপা চিৎকার করে উঠেছে। কিন্তু মলিনের কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ও ততক্ষণে সাপটার মাথা সুড়ঙ্গের দেওয়ালের স্যাঁতসেঁতে রুক্ষ পাথরে ঘষতে শুরু করেছে।

দশ কি পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। একসময় সাপটার রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন মাথাটা ছেড়ে দিল মলিন। তখনও প্রাণীটার শরীর দুমড়েমুচড়ে পাক খাচ্ছে।

আমরা সবাই চুপ। ছেলেটা আর আমাদের কত অবাক করবে?

মলিন উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টে হাত মুছল। তারপর একলাফে প্রিয়বরণের কাছে এসে ওর হাত চেপে ধরল। আমরা আবার এগোতে লাগলাম।

সুড়ঙ্গটা মোটেই সরলরেখার মতো নয়—বরং থেকে-থেকেই ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। তবে ওটার ঢাল কখনও খুব একটা কমেনি। নীচের দিকে নামছে তো নামছেই।

প্রিয়র হাতে ধরা টর্চের আলো ক্রমশ কমজোরি হয়ে আসছিল। সেটা লক্ষ করে মিহিরদা প্রিয়কে বললেন, 'প্রিয়বাবু, টর্চের আলো তো মনে হয় আর বেশিক্ষণ টিকবে না—।'

প্রিয়বরণ উত্তরে বলল, 'ঘাবড়াবেন না। আমাদের সঙ্গে মলিন আছে।'

এ-কথায় আমি আর ঝিমলি চোখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। মনে হল, সবরকম সমস্যা সমাধানের সবখোল চাবি হল মলিন। মলিনের এই শক্তিশালী সত্তার কথা আমি কোনওদিন কল্পনা করতে পারিনি।

টর্চের আলো নিভে গেলে মলিন কী করে আলোর ব্যবস্থা করবে?

প্রশ্নটা মনে জাগার সঙ্গে-সঙ্গেই একটু আগের ঘটনা মনে পড়ে গেল। মলিনের পাঁচ আঙুলের ডগা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল নীল আগুনের শিখা।

ঝিমলিকে আমার ভাবনার কথা চাপা গলায় বলতেই ও বলে উঠল, 'এসব প্রবলেমের কথা ভুলে যা, অন্তরা। দিস ওয়ান্ডার বয় ইজ দ্য কিং অফ ব্ল্যাক ম্যাজিক। স্বর্ণভূষণ তরফদাররা এই ছেলেটার কাছে কিচ্ছু না।'

ঝিমলির কথায় মলিনের প্রতি একটা আস্থা আর শ্রদ্ধা যেন টের পেলাম। আমার হারানো সাহস ফিরে এল আবার।

আমার অনুমানে যে ভুল হয়নি সেটা বুঝতে পারলাম একটু পরেই। টর্চের আলোটা নিভু-নিভু হয়ে এসেছিল। সামনের পথ দেখতে প্রিয়বরণের অসুবিধে হচ্ছিল। তাই হঠাৎই ও চাপা গলায় মলিনকে ডাকল।

'মলিন—।'

'কী, কাকু?'

'আলো কমে গেছে। আলোর একটা ব্যবস্থা কর্...।'

সঙ্গে-সঙ্গে আবার আমরা অবাক।

মলিনের গা থেকে বেরোনো সবুজ আলোর আভাটা পলকে অন্তত দ্বিগুণ হয়ে গেল।

॥ তিরিশ ॥

আলোর আভাটা এমনভাবে কালো পাথরের দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়ল যে, আমার গা-ছমছম করতে লাগল।

ঝিমলি আমার আঙুলে আঙুল পেঁচিয়ে হাতটাকে একেবারে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরেছে। আর মাঝে-মাঝেই আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে, 'আমার কেমন একটা ইরি ফিলিং হচ্ছে। শুড উই টার্ন ব্যাক, অন্তরা? আর এগোনোটা কি ঠিক হবে? তোর কী মনে হয়?'

দু-তিনবার এরকম ধরনের কথা বলার পর আমি একটু বকুনির গলায় বলেছি, 'আমার তো কোনও উপায় নেই। ইট ইজ মাই ডেস্টিনি।...তুই চাইলে ফিরতে পারিস। কিন্তু তোকে একা ফিরতে হবে...আমি যাব না।'

'ও. কে., ও. কে.,' বলে ঝিমলি ওর ভয়টাকে সামলে নিয়েছে। অন্তত তখনকার মতো।

মিহিরদা হঠাৎই বারতিনেক কেশে উঠলেন। সেই শব্দটার অদ্ভুত এক পৌনঃপুনিক প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম আমরা। যেন পেতলের একটা শূন্য কলসি সুড়ঙ্গের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে চলেছে—দূর থেকে ক্রমশ আরও দূরে চলে যাচ্ছে। ঠিক একই ঢঙে প্রতিধ্বনির শব্দগুলো মিলিয়ে গেল। যেন আমাদের অনেক আগেই পৌঁছে গেল পাতালে।

চারপাশের বাতাস হঠাৎ বেশ ঠান্ডা মনে হল আমার। কখন যেন আমরা উষ্ণ সমতলভূমি থেকে পাহাড়ি পথ বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে পড়েছি। অথচ আমরা চলেছি নীচের দিকে।

চলতে-চলতে ঠান্ডাটা ক্রমশ বাড়ছিল। আর আমার উৎকণ্ঠার পারদ চড়ছিল। আমরা নামছি তো নামছিই। আমাদের এই পাতালপথের শেষ কোথায়?

বাতাস ঠান্ডা হতে-হতে প্রায় শীতকাল চলে এল। মিষ্টি গন্ধটাও হয়ে এল অনেক জোরালো। তখনই শিসের শব্দটা আমরা শুনতে পেলাম।

কিন্তু শিসের শব্দটা এত পালটে গেছে যে, হঠাৎই সেটাকে আমি বাঁশির সুর ভেবে ভুল করলাম।

খুব শান্ত মোলায়েমভাবে বাজছে সেই বাঁশি। কখনও খাদে, কখনও সামান্য উঁচুতে। মনোযোগ দিয়ে খেয়াল না করলে হঠাৎই বেহালার সুর বলে ভ্রম হয়।

সুরটার মধ্যে কীরকম যেন একটা অলৌকিক হাতছানি ছিল। অন্তত আমার সেরকম মনে হল। কারণ, কখন যেন সুরের টানে আমি চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছি।

সুড়ঙ্গের ঢাল এখনও নীচের দিকে। ঝরনার কুলুকুলু জল এখনও আমাদের পাশে-পাশে বয়ে চলেছে। শীত আড়াল করতে ঝিমলি ওর ওড়নাটাকে গলায় মাথায় জড়িয়ে নিয়েছে। ওর দেখাদেখি আমিও।

গণপতি হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে বলে উঠল, 'স্যার, এ তো দেখছি ডিসেম্বর মাস চলে এল।'

মিহিরদা বললেন, 'একটু তো সহ্য করতে হবে, গণপতি।'

মিহিরদা প্রিয়বরণের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আর কতদূর?'

প্রিয়বরণ বলল, 'এই তো, এসে গেছি।'

সত্যি-সত্যিই আর মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম।

পৌঁছে যে গেছি সেটা বোঝার জন্যে আমার প্রিয়বরণের সাহায্যের দরকার হয়নি। কারণ, সামনের অচিন দৃশ্য আমাকে কোন জাদুমন্ত্রে পাথর করে দিয়েছে। আমার চোখে মহাভারতের অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের দৃষ্টি। বেশ বুঝতে পারছিলাম, সে-দৃষ্টিতে রয়েছে মুগ্ধতা, বিস্ময়, আর ত্রাস।

সুড়ঙ্গের শেষ বাঁকটা ঘুরেই আমরা এই অভাবনীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হয়েছি।

আমাদের সামনে অনন্ত-বিস্তৃত এক দিঘি। নাকি বলব সমুদ্র?

সেই দিঘিতে জল-টল কিছু নেই। তার বদলে অদ্ভুত এক সবুজ জেলি থইথই করছে। ভেজা, চকচকে, আঠালো—কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু।

সেই গোটা জেলির তালটা একবার ফেঁপে উঠছে, একবার চুপসে যাচ্ছে। ঠিক শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ওঠা-নামার মতো।

মিষ্টি গন্ধটা আমার ঘ্রাণের প্রায় সবটাই দখল করে নিয়েছিল। ক্লোরোফর্মের গন্ধের সঙ্গে গন্ধটার যেন মিল খুঁজে পেলাম। আর কাজেরও খুব একটা তফাত পেলাম না। কারণ, আমি যেন ধীরে-ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। মনে হচ্ছিল, এখনই বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব।

জেলির ওই প্রকাণ্ড তাল থেকে সবুজ আলোর আভা ঠিকরে বেরোচ্ছিল। সেই সবুজের ছটা দিঘি থেকে উৎসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। সেই তীব্র আভায় মলিনের গা থেকে বেরোনো সবুজ আলো ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের চারপাশে কালচে রঙের এবড়োখেবড়ো দেওয়াল। সেই দেওয়াল চারপাশ থেকে জায়গাটাকে ঘিরে উঠে গেছে অনেক ওপরে।

মাথা উঁচু করে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। হয়তো টলে পড়েই যেতাম যদি না ঝিমলি পাশ থেকে আমাকে খামচে ধরত।

ও ফিসফিস করে বলল, 'অন্তরা, এত নীচে নেমে এসেছি আমরা! দিস ইজ অ্যামেজিং!'

সত্যি, সিলিং-এর ভয়ংকর উচ্চতার দিকে তাকালে বোঝা যায় সুড়ঙ্গ ধরে নামতে-নামতে আমরা কতটা পাতালে চলে এসেছি। সেই সিলিং থেকে বটগাছের ঝুরির মতো ঝুলছে লম্বা-লম্বা শ্যাওলার তাল। অদ্ভুত সবুজ আলোয় ওগুলোকে ঝুলন্ত সাপের মতো লাগছে।

আমি অবাক বিস্ময়ে এই প্রকাণ্ড দৃশ্যটাকে গ্রহণ করছিলাম। মিষ্টি গন্ধ আর শিসের সুর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কে জানত, পুরুলিয়ার এই পাহাড়ি অঞ্চলের পাতালে এরকম অলৌকিক এক ব্যাপার লুকিয়ে আছে!

থইথই জেলির সমুদ্রের সামনে প্রিয়বরণ হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছিল। জোড়হাত করে ইনিয়েবিনিয়ে কীসব বিড়বিড় করছিল। আমার নদীর পাড়ের দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল। সেই ঢেউখেলানো নদীর জল। ছিটকে আসা বরফকুচি।

প্রিয় বলেছিল, সবই নাকি ওর পাতালদেবতার ইচ্ছে। তিনি যে কখন কী লীলা দেখাবেন, তা তিনিই জানেন।

এখন সামনে যা দেখছি সেটাও কি প্রিয়র পাতালদেবতার লীলা?

আমি সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে মিহিরদাদের দিকে তাকালাম।

মিহিরদা জেলির সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওঁর চশমার কাচে সবুজ আলোর আভা। ওঁর মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনিও আমার চেয়ে কম অবাক হননি। লক্ষ করলাম, শীতের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে কখন যেন পকেট থেকে রুমাল বের করে গলায় বেঁধে নিয়েছেন।

ঝিমলি শুধু অবাক হয়নি—তার সঙ্গে ভয়ও পেয়েছে। ও আমাকে পাশ থেকে আঁকড়ে ধরে চোখ বড়-বড় করে চারিদিকে চোখ বোলাচ্ছে। ওর পাতলা ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে রয়েছে। সামনের দুটো দাঁত অল্প দেখা যাচ্ছে। তবে সবুজ আলোর আভায় তাদের রং এখন সবুজ। ঝিমলির শরীরের কাঁপুনি আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম।

গণপতি ড্রাইভার মানুষ। তার ওপরে লোকাল ছেলে। ওকে দেখে মনে হল না তেমন ভয়-টয় পেয়েছে। ও হাঁ করে সবকিছু দেখছিল ঠিকই, তবে আজব কোনও ব্যাপার দেখলে মানুষের যেমন হয়, ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকটা সেইরকম।

ও আপনমনেই হঠাৎ বলে উঠল, 'এ তো দেখছি তাজ্জব ব্যাপার! এই সবুজ রঙের জিনিসটা কী? তুঁতে মিশিয়ে ময়দার আঠা আগুনে ফোটালে যেমন হয়, এ তো অনেকটা সেরকম দেখছি!'

কথাগুলো গণপতি বলেছে মিহিরদাকে লক্ষ করে। মিহিরদা ওর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু হাতের ইশারায় ওকে চুপ করতে বললেন।

বাকি রইল মলিন।

একমাত্র ওকেই আমি দেখলাম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ও নির্বিকারভাবে ওই সবুজ দিঘির পাড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর চোখ যেন একটা মামুলি দৃশ্য দেখছে—ভাবটা অনেকটা সেইরকম। তা ছাড়া, শীতটা ও তেমনভাবে টের পাচ্ছে বলে মনে হল না।

প্রিয়বরণ ওর মন্ত্র পড়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। পায়ে-পায়ে আমার কাছে এল। চাপা গলায় বলল, 'ম্যাডাম, এই আমাদের দেবতা। আমাদের মতো ভক্তদের জীবন উনিই পরিচালনা করেন।'

প্রিয় যখন কথা বলছে সেইসময় দেখি মিহিরদা ওঁর ঝোলা-ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে সামনের দৃশ্যের দিকে তাক করেছেন।

প্রিয় সেটা চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করেছিল। ও আমার দিক থেকে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল মিহিরদার দিকে। চেঁচিয়ে বলল, 'ছবি তুলবেন না, ছবি তুলবেন না। ক্যামেরা ব্যাগে ঢোকান। শিগগির!'

কিন্তু মিহিরদা প্রিয়র কথা শুনে কিছু করে ওঠার আগেই সবুজ দিঘি থেকে কিছু একটা তীব্র ছোবলের মতো ছিটকে এল মিহিরদার দিকে। ক্যামেরাটাকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে আবার ফিরে গেল দিঘির দিকে। ঠিক যেমন আঠালো জিভ দিয়ে গিরগিটি পোকা ধরে।

ক্যামেরাটা যে ধনুকের মতো বাঁকা পথে উড়ান দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল বোঝা গেল না।

সবুজ দিঘি থেকে লম্বা সাপের মতো যে-জিনিসটা ছিটকে এসেছিল সেটাকে আমরা কেউই ভালো করে দেখতে পাইনি। কারণ, ঘটনাটা ঘটেছে বিদ্যুৎঝলকের মতো দ্রুত।

মিহিরদা বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্যালফ্যালে মুখে আমাদের দিকে বারবার তাকাতে লাগলেন।

প্রিয়বরণ আমার কাছে এল। বলল, 'ম্যাডাম, আপনি আমাদের দেবতাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, দেবতাকে দেখতে চেয়েছিলেন—এখন আপনি খুশি তো! বলুন, আমাদের দেবতা সম্পর্কে আপনি আর কী জানতে চান?'

আমি সবুজ দিঘির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। প্রিয়বরণের কথায় ওর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলাম, 'সামনের এই বিশাল সবুজ ব্যাপারটা কী? ওটা থেকে সবুজ আলো বেরোচ্ছে কেমন করে? আর মলিনের শরীর থেকেই বা আলো বেরোনোর মিস্ট্রিটা কী?'

প্রিয়বরণ আমার প্রশ্ন শুনে সামান্য হাসল। সবুজ আলোর আভায় ওর হাসিটা কেমন অদ্ভুত দেখাল।

ও আমার প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে দিঘির একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। দু-হাতের তালু বাঁকিয়ে মুখের সামনে ধরে চিৎকার করে বলল, 'প্রশ্ন তো শুনেছ, প্রভু। এবারে দেখা দাও!'

প্রিয়র চিৎকার ওই ফাঁকা শূন্যতার মধ্যে বিচিত্র প্রতিধ্বনি তুলল। সেইসব প্রতিধ্বনির রেশ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই দিঘির ভেতরে এবং বাইরে অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

শিসের শব্দটা থেমে গিয়ে একটা হিসহিস শব্দ শুরু হল। সেই শব্দ অনুসরণ করে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে দেখি মরা সাপের মতো ঝুলে থাকা শ্যাওলার দড়িগুলো নড়ছে, দুলছে, শরীর মুচড়ে পাক খাচ্ছে—হঠাৎই ওগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। আর হিসহিস শব্দটা যেন ওপর থেকেই আসছে।

একটু পরেই বুঝলাম, শব্দটা শুধু ওপর থেকেই আসছে না—আসছে দিঘির দিক থেকেও। সেইসঙ্গে দিঘির জেলির মধ্যেও একটা রদবদল আমার চোখে পড়ল।

জেলির সমুদ্রে যেন একটা আলোড়ন তৈরি হল। সবুজ আলোর আভাটা একবার উজ্জ্বল একবার অনুজ্জ্বল হতে লাগল। কী একটা জিনিস যেন তারই মধ্যে পাক খেতে লাগল।

পাক খেতে-খেতে ফুলে উঠল জেলির সমুদ্র। তা থেকে স্পষ্ট আকার নিল একটা প্রকাণ্ড সরীসৃপ। তার শরীরের ব্যাস প্রায় তিন কি চার ফুট হবে। আর দৈর্ঘ্য? না, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ, অস্বাভাবিক মোটা সরীসৃপটা পাক খাচ্ছিল। ওটার দেহ নানানভাবে ওঠা-নামা করছিল। গোটা দিঘির আয়তন জুড়েই ওর শরীরের সর্পিল বিভঙ্গের খেলা চলছিল। অথচ ওটার মাথাটা আমি শত চেষ্টা করেও খুঁজে পেলাম না।

সবুজ আলোর দিঘি থেকে এই অদ্ভুত সরীসৃপটাকে জেগে উঠতে দেখে মিহিরদা আর ঝিমলি ভয়ে চিৎকার করে উঠল। আর গণপতি বেচারা তো 'আঁ-আঁ-আঁ—' শব্দ করে অজ্ঞানই হয়ে গেল।

অথচ বিস্ময়-বালক মলিন কোমরে হাত দিয়ে দিঘির কিনারায় নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি ভয় পেয়ে ছুটে গেলাম প্রিয়বরণের দিকে। ওকে পাগলের মতো জাপটে ধরলাম।

আমারও বোধহয় কোনও জ্ঞান ছিল না। কারণ, ওই শীত, ওই হিসহিস শব্দ, ওই সবুজ, আর অস্বাভাবিক বেড়ের ওই ভয়ংকর সরীসৃপ—সবকিছু আমাকে পাগল হওয়ার কাছাকাছি ঠেলে দিয়েছিল।

পাগল যে হইনি তার কারণ বোধহয় বাপি। আমি মনে-মনে বাপিকে ডাকছিলাম, 'ফিয়ারলেস' মজুমদারকে ডাকছিলাম। আর মায়ের শীর্ণ অথচ উজ্জ্বল মুখটা আমার চোখের সামনে ভাসছিল।

প্রিয়বরণকে জাপটে ধরে আমি ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। আর দিঘির মধ্যে অতিকায় সরীসৃপের উথালপাথাল দেখছিলাম। কিন্তু ওটার মাথা কিংবা লেজ কোনওটাই একমুহূর্তের জন্যেও দেখা গেল না।

ওই বিশাল দিঘির মধ্যে যে-সরীসৃপ শরীরটা লাট খাচ্ছিল, মোচড় দিচ্ছিল, অজানা এক অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করছিল, তার দৈর্ঘ্য আমি বলতে পারব না। শুধু মনে হচ্ছিল, ওটার যেন কোনও শেষ নেই। ওটা যেন পাতাল সমুদ্রের এক সরীসৃপ দানব। ওটার মাথা একটা না কয়েকশো তা আমি জানি না বটে, তবে কয়েকশো যদি হয়ও তা হলে আমি অবাক হব না।

প্রাণীটার গায়ের রং ঘোর সবুজ। আর তারই মধ্যে সাদা এবং কালো বরফির ছিটে। লাউডগা সাপ উত্তেজিত হলে তার গায়ের রঙে যে-কালো নকশা ফুটে বেরোয় অনেকটা সেইরকম।

দিঘির তরলটা যে ঠিক কী সেটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে জল যে নয় সেটা বুঝতে পারছিলাম। কারণ, তরলটা বেশ ভারী আর আঠালো—অনেকটা গঁদের আঠার মতো।

সবুজ আলোর আভার জন্যে তরলের সঠিক চরিত্র বোঝা না গেলেও প্রাণীটার ছটফটানিতে সেই তরল দোল খাচ্ছিল, ছিটকে উঠছিল, টগবগ করে ফুটেছিল যেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর আমার হাড় হিম করা ভয় স্তিমিত হল। তখনই খেয়াল হল যে, আমি প্রিয়বরণকে একেবারে জাপটে ধরে আছি।

অপ্রস্তুত হয়ে ওকে ছেড়ে সামান্য সরে দাঁড়ালাম। দেখলাম, মিহিরদা আর ঝিমলি আমাদের কাছাকাছি জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। একটু দূরেই যে গণপতি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সেটা খেয়াল নেই। অবশ্য খেয়াল থাকার কথাও নয়।

প্রাথমিক ভয়ের ধাক্কাটা কেটে যেতেই আমরা সবাই যেন কেমন অবশ হয়ে পড়েছি।

ব্যতিক্রম শুধু মলিন। ও ওর জায়গা থেকে একচুলও নড়েনি। এখনও আগের মতোই স্থিরচোখে মামুলি ঢঙে তাকিয়ে রয়েছে সবুজ দিঘির দিকে, সরীসৃপটার দিকে। যেন এসব ওর কাছে কিছুই নয়।

আমি প্রিয়বরণকে কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলাম, 'আপনার দেবতার মাথা আর লেজ কোথায়?'

প্রিয় ওর দেবতার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমাদের দেবতার কোনও শেষ নেই। তিনি অনন্ত। তাঁর মুখ কখনও কেউ দ্যাখেনি। ওই যে লকেটটা আপনারা দেখেছেন—সেই লকেটের ছবিটা ভক্তদের কল্পনা। যেমন আপনারা আপনাদের নানান দেবতাকে কল্পনা করে তাঁদের মূর্তি গড়েছেন...।'

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'আরও বলুন। ওই সবুজের ব্যাপারটা...ময়না সরেন...চুনারাম মাহাত...গভীর কুয়োর নীচে সবুজ আভা...আমি সব জানতে চাই, প্রিয়...।'

'তা হলে শুনুন—' বলে প্রিয়বরণ একটা গভীর শ্বাস নিল।
'ম্যাডাম, এই দেবতার জন্ম কবে থেকে হয়েছে কেউ জানে না—আমিও না।' শীত ঠেকাতে বুকের কাছে দু-হাত জড়ো করে প্রিয়বরণ বলতে শুরু করল, 'তবে আমি যাঁর কাছে এই দেবতার কাহিনি শুনেছিলাম তিনি বাঘমুন্ডিতেই থাকতেন...বছর চারেক আগে মারা গেছেন। তাঁর নাম ছিল সুকৃতিকুমার দীন। সুকৃতিদার কাছেই আমি সব শুনেছি, সব জেনেছি। যখন আমাকে এসব গুপ্তকথা শোনান তখন ওঁর বয়েস নব্বই কি তারও বেশি...।'

আমি শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। ঝিমলি আর মিহিরদার অবস্থাও একইরকম। মিহিরদা গণপতির ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওকে নাড়াচাড়া দিচ্ছিলেন, ওর জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওঁর জড়োসড়ো শীতার্ত ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

প্রিয়বরণের কথায় সামান্য ফাঁক পেতেই আমি বললাম, 'এই প্রচণ্ড শীতটার কিছু একটা করা যায় না?'

'অবশ্যই যায়—' হেসে বলল প্রিয়। তারপর মলিনকে কাছে ডাকল।

সঙ্গে-সঙ্গে মলিন অনুগত বালকের মতো চলে এল ওর 'কাকু'-র কাছে।

'এই শীতে আমরা আর পারছি না, মলিন। কিছু একটা ব্যবস্থা কর...।'

মলিন কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেল উথালপাথাল দিঘির কিনারার কাছে। চিৎকার করে অনেকটা আদেশের সুরে বলল, 'আমাদের শীত করছে। এখন চলে যাও—পরে ডাকলে আবার আসবে...।'

সঙ্গে-সঙ্গে ওই সবুজ আঠালো তরলে আলোড়ন তুলে পাতালদেবতা ডুবে

গেল, তলিয়ে গেল কোন পাতালে। দিঘির ওপরে কয়েকটা বুদবুদ উঠে এল। আলোড়নগুলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল।

মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখি ঝুলে থাকা শ্যাওলার ঝুরিগুলো আবার স্থির নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। কোন মন্ত্রবলে কে যেন ওদের প্রাণভোমরা সরিয়ে নিয়েছে। আচমকা ব্যাটারি খুলে নিলে কোনও খেলনার যেমনটা হয়।

শীত কমতে লাগল দ্রুত। আমরা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগলাম। মলিন দিঘির কিনারায় চুপটি করে বসে পড়ল—অপলকে তাকিয়ে রইল দিঘির সবুজের দিকে।

প্রিয়বরণ আমাকে বলল, 'চলুন, আমরা ওই জায়গাটায় গিয়ে বসি। আমার গল্প অনেক লম্বা—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনতে আপনাদের কষ্ট হবে।'

যে-ফাঁকা জায়গায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলাম, আগেই বলেছি, তার চারপাশের দেওয়ালগুলো কালো এবড়োখেবড়ো পাথরের তৈরি। সেই পাথরের গা বেয়ে কোথাও-কোথাও জল ঝরে পড়ছে, কোথাও বা বেরিয়ে আছে গাছের শেকড়।

আমরা যখন কথা বলছি, তখন অদ্ভুত এক ফাঁপা প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমাদের সকলের মুখের কাছে প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা-মাইক ধরা রয়েছে।

চারপাশের দেওয়ালটা যেমন, জায়গাটার মেঝেটাও একই ধাঁচের। সেখানে পাথর ছাড়াও রয়েছে মাটির ঢিবি। তবে গাছপালা বলতে কিছুই নেই। সূর্যের আলো না পেলে যা হয় আর কী। শুধু একধরনের কালচে শ্যাওলা সর্বত্র ছেয়ে আছে। এ ছাড়া গোটা জায়গাটা ভেজা-ভেজা, স্যাঁতসেঁতে।

প্রিয়বরণ যে-জায়গাটা দেখাল তার চেহারাও একইরকম। আমরা তিনজনে সেখানে গিয়ে বসলাম। মিহিরদা তখন গণপতিকে ধরে তুলছেন। ও বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারপাশে দেখছে আর আমাদের দিকে অবাক চোখে তাকাচ্ছে।

মিহিরদা ওকে ধরে-ধরে আমাদের কাছে নিয়ে এলেন। সাহস জুগিয়ে আশ্বাস দিয়ে বসালেন। লক্ষ করলাম, মলিন তখনও একইভাবে দিঘির পাড়ে বসে আছে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে প্রিয়বরণ আবার ওর কাহিনির খেই ধরল।

'ম্যাডাম, এই সরীসৃপ-দেবতার শুরু কেমন করে হয়েছিল কেউ জানে না। সুকৃতিদাও সে-কথা জানতেন না—তাই আমাকেও বলতে পারেননি।

'থুখুড়ে ওই বুড়ো মানুষটা আমাকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিলেন। সংসারে ওঁর কেউ ছিল না। আমারও তো কেউ নেই! তাই বোধহয় আমাদের মধ্যে ভাবসাব

হয়ে গিয়েছিল। আমি দু-বেলা সুকৃতিদার চালাঘরে যেতাম, রান্না করে দিতাম, জ্বরজারি হলে ডাক্তার-বদ্যি করতাম...মানে যতটা পারি হেল্প করতাম আর কী!

'...তো ওই বুড়ো দাদা প্রায়ই বলতেন, ওঁর কাছে কীসব গুপ্তকথা আছে—উনি সেগুলো চোখের মণির মতো আগলে রেখেছেন। আমি জিগ্যেস করতাম, "কী কথা, দাদা?" উনি মাথা নাড়তেন। বলতেন, "সে বড় গোপন কথা, প্রিয়...বড় গোপন কথা। বিপদে-আপদে মানুষের ভালো করে এমন একজনের কথা...।"

'যখন সুকৃতিদা অশক্ত হয়ে পড়লেন, কাহিল হয়ে পড়লেন...শরীরটা আর বইতে পারছেন না এমন অবস্থা, তখন একদিন বললেন, "প্রিয়, আমার বোধহয় দিন ফুরোল। আমার গুপ্তকথা আর ধরে রাখব না—তোর কাছে চেলে দেব।"

'আমি জিগ্যেস করলাম, "'চেলে দেব' মানে?"

'সুকৃতিদা ফোকলা দাঁত বের করে হেসে বললেন, "সময় ফুরিয়ে এলে এই গুপ্তকথা চালতে হয়। মানে, খুব কাছের একজনকে, খুব ঘনিষ্ঠ, খুব নিকট কাউকে বলে দিতে হয়। আবার তার যখন সময় ফুরিয়ে আসবে, তখন সেও সেই বিবরণ চেলে দিয়ে যাবে আর কারও কানে। এই প্রথাই চলে আসছে শ'-শ' বছর ধরে... এইরকম কথা চালাচালি...।"

'তো একদিন রাতে ওঁর ঘরের দাওয়ায় বসে সবকথা—স-ব গুপ্তকথা সুকৃতিদা আমাকে বললেন। অবাক করে দেওয়া সেই কাহিনি। তার অনেকটাই তো আপনারা জেনেছেন, দেখেছেন...।

'আমাদের পাতালদেবতার নিবাস পাতালে। পাতালের নানান পথে সবজায়গায় তিনি যেতে পারেন। তিনি যেতে পারেন না এমন কোনও জায়গা নেই। সমুদ্রের নীচে, পাহাড়ের পাথরের স্তূপের তলায়, আগ্নেয়গিরির অতলে। পাতালের সবটাই তাঁর দখলে। একটু আগে দেবতাকে আপনারা দর্শন করেছেন—তাঁর একরকম চেহারা দেখেছেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য হতে পারেন—কিন্তু সেই অবস্থাতেও তাঁর শক্তি কমে না। তা ছাড়া, প্রকৃতি তাঁর দখলে, ছ'টা ঋতু তাঁর দখলে। ইচ্ছে করলেই আকাশ কালো করে বজ্র-বিদ্যুৎ দিতে পারেন, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়—সবই দেখাতে পারেন। নদীর জলে যেমন ঢেউ তুলতে পারেন, তেমনই জলকে পলকে বরফ করতে পারেন—আর বরফকে জল...।'

আমি মোহাচ্ছন্নের মতো প্রিয়বরণের কথা শুনছিলাম আর পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ছিল। আচমকা আকাশ কালো করে ঝড়, শীত, এবং শান্ত নদীর জলে বিশাল ঢেউ। প্রিয়বরণের হাঁটুগেড়ে প্রার্থনা, আমার গায়ে ছিটকে আসা বরফকুচি।

এত ক্ষমতাবান কেউ আছে বলে আমার জানা ছিল না। প্রকৃতিকে শাসন করতে পারে এমন কেউ যে সত্যি-সত্যি থাকতে পারে তা কখনও ভাবিনি।

মিহিরদা কয়েকবার কাশলেন। সেই শব্দের গমগমে প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম আমরা।

কাশি থামলে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'মাটিতে ফাটল...ফাটলের নীচে...কিংবা কুয়োর তলায়...সব জায়গায়...?'

প্রিয়বরণ মিহিরদার দিকে ফিরে বলল, 'হ্যাঁ—সব জায়গায়। পাতালদেবতা যেমন অনন্ত তেমনই তাঁর শরীরের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা। পাতালের নানান জায়গায় তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। একইসঙ্গে দেখা দিতে পারেন মজে যাওয়া কুয়োর নীচে, আবার পাঁচ কি সাত কিলোমিটার দূরে মাটির ফাটলের গর্তেও দর্শন দিতে পারেন একই সময়ে। এমনই আশ্চর্য তাঁর ক্ষমতা।'

একটু আগে সামনের দিঘিতে আমরা যা দেখেছি আমি মনে-মনে সেই প্রকাণ্ড আকারের সহস্রমুণ্ড এক সরীসৃপের কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। যার অসংখ্য কিলবিলে শাখাপ্রশাখা। ওই প্রকাণ্ড সরীসৃপগুলো মাটির নীচে সবজায়গায় অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ তারা একই শরীরের অংশ, একই সূত্রে গাঁথা।

আমি মনে-মনে শিউরে উঠলাম। প্রিয়বরণের এই পাতালদেবতা আমার বাপির প্রাণ নিয়েছে। ময়না সরেন, চুনারাম মাহাতকেও গ্রাস করেছে। এগুলো হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কী! 'দেবতা' উপাধি নিলেই কি যা খুশি করা যায়? সে-কথাই জিগ্যেস করলাম প্রিয়কে।

'আপনার দেবতা এভাবে নিরীহ মানুষকে গ্রাস করেন কেন? এরকম দেবতা কি কেউ চায়?'

আমার রুক্ষ প্রশ্নে প্রিয়বরণ একটুও রাগ করল না। বলল, 'ব্যাপারটা যতটা নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে আসলে ততটা নয়। আপনাদের আমি বুঝিয়ে বলছি—।'

প্রিয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ওর মুখে সবুজ আলোর আভা ঠিকরে এসে পড়েছে। ওর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে অপার্থিব মনে হচ্ছিল। একইসঙ্গে বুঝলাম, আমার মুখের চেহারাও একইরকম। শুধু বাড়তি আলোর আভার জন্যে মলিনের মুখটা অন্যরকম লাগছিল।

জোরে একটা শ্বাস টানল প্রিয়। বোধহয় একলহমা ভাবল, বলবে কি বলবে না। তারপর মনে-মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলল।

'আগেই বলেছি, আমাদের দেবতার বয়েসের কোনও গাছ-পাথর নেই। তাঁর সঠিক বয়েস কত কেউ জানে না। সুকৃতিদাদাও জানতেন না। শুধু যেটা জানি, পরমায়ুকে লম্বা করার জন্যে দেবতা কিছু প্রাণকে উৎসর্গ করেন—নিজের জন্যে...।' প্রিয়বরণ কথা বলতে-বলতে কপালে হাত ঠেকাল : 'তবে একটা কথা—।'

আমাদের সকলের মুখের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল প্রিয়। তারপর

আমার মুখের ওপর এসে ওর নজর স্থির হল।

'ম্যাডাম, বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবে জেনে রাখুন...আমাদের দেবতা শুধু সেইসব মানুষের প্রাণ গ্রহণ করেন যাদের কপালে নিশ্চিত অপঘাত মৃত্যু লেখা আছে...।'

'তার মানে? কী বলতে চান আপনি?'

'এটুকু বোঝাতে চাই যে, ময়না সরেন, চুনারাম মাহাত—ওদের প্রাণ নিয়ে দেবতা নিজের পরমায়ু বাড়িয়েছেন বটে, কিন্তু ওদের কপালে এমনিতেই অপঘাত মৃত্যু লেখা ছিল। মানে, দেবতার কাছে ওদের উৎসর্গ করা না হলে সাতদিন পরেই ময়না জলে ডুবে মারা যেত। খোঁজ করে দেখবেন, ও সাঁতার জানত না। তা ছাড়া...।'

'আর চুনারাম মাহাত?' প্রিয়র কথায় বাধা দিয়ে প্রশ্নটা করলেন মিহিরদা।

'চুনারাম মারা যেত সাপের কামড়ে—।' শান্ত গলায় প্রিয়বরণ বলল।

'আপনি এতসব কথা জানলেন কেমন করে?' ঝিমলি।

'সুকৃতিদা আমাকে পাতালদেবতার এই নিয়মের কথা বলেছিলেন। আর ময়না, চুনারাম, কিংবা ওদের মতো আরও যারা আছে তাদের নিয়তির কথা আমাকে পাতালদেবতা নিজে বলেছেন...।'

মিহিরদা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী বলতে চান আপনি? পাতালদেবতা কি কথা বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ—পারেন। উনি মনে-মনে কথা বলেন...।'

'টেলিপ্যাথি?' ঝিমলির অবাক প্রশ্ন।

ওর দিকে তাকাল প্রিয়ঃ ' "টেলিপ্যাথি" মানে কী আমি জানি না, ম্যাডাম। তবে পাতালদেবতা চাইলেই কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেন—মনে-মনে।'

আমি এবার প্রিয়কে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার সঙ্গে ছাড়া আর কার সঙ্গে তিনি মনে-মনে কথা বলেন?'

'কারও সঙ্গে না—শুধু আমার সঙ্গে। এর আগে উনি কথা বলতেন সুকৃতিকুমার দীনের সঙ্গে। সুকৃতিদা চলে যাওয়ার পর থেকে শুধুই আমার সঙ্গে। আমার মারফতই তিনি নিজের ইচ্ছের কথা সবাইকে জানান।'

মিহিরদা চোখ থেকে চশমা খুলে কাচদুটো মুছলেন। তারপর চশমা চোখে দিয়ে দিঘির দিকে একবার তাকালেন। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে মলিনের দিকে। এবং সবশেষে প্রিয়বরণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ময়না, চুনারাম, বা আরও অনেকের অপঘাতে মারা যাওয়ার ভবিতব্যের কথা আপনাদের দেবতা জানলেন কেমন করে?'

চোখে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের দ্যুতি নিয়ে মিহিরদার দিকে তাকাল প্রিয়। থেমে-

থেমে আবেগভরা গলায় বলল, 'আমাদের সবার ভূত-ভবিষ্যৎ তাঁর নখদর্পণে। এরকম অপঘাত মৃত্যুর ভবিতব্য ছাড়া কাউকে তিনি প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেন না...।'

প্রিয়বরণ 'প্রসাদ' কথাটা যথেষ্ট ভক্তিভরে উচ্চারণ করল বটে কিন্তু শব্দটা শোনামাত্রই আমার গা-টা কেমন শিউরে উঠল। একইসঙ্গে যে-প্রশ্নটা মনে লাফিয়ে উঠল সেটা হল, আমার বাপির ভবিতব্যেও কি অপঘাত মৃত্যু লেখা ছিল? প্রিয়বরণের ত্রিকালজ্ঞ দেবতা কি তাঁর গণনায় বাপির সেরকম কোনও ভবিষ্যতের খোঁজ পেয়েছিলেন?

থাকতে না পেরে এই প্রশ্নটাই করলাম প্রিয়বরণকে।

ও এক মায়াময় দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকার পর আস্তে-আস্তে বলল, 'ম্যাডাম, আমরা সবসময় আমাদের দেবতা কিংবা তাঁর পুজোকে আড়াল করে রাখি। মানে, যারা অবিশ্বাসী, যারা আমাদের পাতালদেবতা কিংবা তাঁর ভক্তদের ক্ষতি করতে পারে—তাদের কাছ থেকে আমাদের গোপন পুজোর ব্যাপারটা আমরা প্রাণ দিয়েও আড়াল করতে চেষ্টা করি। সেইজন্যেই ময়না সরেনের উৎসর্গের ব্যাপারটা আপনারা দেখে ফেলার পর ভক্তরা প্রাণের মায়া ছেড়ে আপনাদের গাড়ির ওপরে মরণঝাঁপ দিয়েছিল—' বিষণ্ণ হাসল প্রিয়। বলল, 'আমি সব জানি। আপনারা যা বলেছেন, বলেছেন। বাকিটা সেই ভক্তদের কাছ থেকে আমি জেনেছি।

'আপনার বাপি—সুরঞ্জন মজুমদার—মলিনের কাছ থেকে শুরু করে ধীরে-ধীরে পাতালদেবতার রহস্য ভেদ করার দিকে এগোচ্ছিলেন। তিনি একদিন "পথিক" হোটেলের কাছের একটা মাঠে একটা মজা কুয়োর ভেতরে আমাদের দেবতার চেহারা দেখে ফেলেন। তারপর গাঁয়ের লোকদের নানান জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন...।'

মিহিরদা আমার দিকে তাকালেন। আমার মনে পড়ে গেল বাপির ডায়েরির সেই লেখা ঃ '...কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তে আমি সাপ বের করে ফেলেছি।' আর মিহিরদাকে ফোন করেও বাপি একই কথা বলেছিল। বাপি বুঝতে পেরেছিল, শেষ খুব একটা দূরে নেই।

প্রিয় অস্বস্তি ভরা চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল, আর চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ইতস্তত করে বলল, 'ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না...আপনার বাপির জন্যে আমাদের দেবতার আড়াল, আমাদের আড়াল, সরে যাচ্ছিল। তাই সব প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমাদের দেবতা আপনার বাপিকে আঘাত করেন। কিন্তু...কিন্তু...' বারকয়েক ঢোক গিলল প্রিয়বরণ। তারপর ঃ 'সুরঞ্জনবাবুকে পাতালদেবতা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করেননি...।'

আমার অবাক লাগল। বাপির কাছ থেকে সবকিছু লুকিয়ে রাখার জন্যে এত

চেষ্টা যার, সে কেন অকপটে সবকিছু আমাদের কাছে খুলে বলছে, কেন উদার হাতে সরিয়ে দিচ্ছে সমস্ত আড়াল?

ঝিমলি আমার কানের কাছে মুখ এনে ঠিক সেই প্রশ্নটাই করল।

'অন্তরা, দিস ইজ স্ট্রেঞ্জ। তোর বাপির বেলায় এত হাশ-হাশ, আর আমাদের কাছে ব্ল্যাটান্ট্লি সব খুলে বলছে! হোয়াট ডু য়ু থিংক?'

আমি আর দেরি না করে সেই প্রশ্নটাই করলাম প্রিয়বরণকে। কিন্তু তার যে-উত্তর ও দিল তাতে মনে হল, প্রশ্নটা না করলেই ছিল ভালো।

'আমি যে সব আপনাদের কাছে খুলে বলছি তার কারণ কী জানেন?' আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে ও বলল, 'কারণ হলেন আপনি, ম্যাডাম। আপনাকে দেখার পর থেকে আমার সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে আগে দেখা হলে আপনার বাপিকে...মানে, আমি প্রাণপণে বাধা দিতাম...আমাদের দেবতার কাছে মাথা খুঁড়তাম, কাকুতিমিনতি করতাম।' কথা বলতে-বলতে প্রিয়বরণ কেঁদে ফেলল: 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই আমি এই টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে গেছি। আমার কাছে দিন-রাতের মানে বদলে গেছে, ভালো-মন্দ গুলিয়ে গেছে, ঠিক-বেঠিকের হিসেবে গরমিল হয়ে গেছে। আমি যেন অন্য কেউ হয়ে গেছি...।'

দু-হাতে মুখ ঢাকল প্রিয়। কান্না-ভাঙা গলায় বলল, 'আমাকে মাপ করবেন, ম্যাডাম, আমাকে মাপ করে দেবেন। এ জায়গায় এসে...আপনার সামনে আর...আর আমাদের দেবতার সামনে আমি কিছুতেই মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না...কিছুতেই পারলাম না...।'

প্রিয়বরণের জন্যে এক অদ্ভুত মায়া জেগে উঠল আমার মনে। ঝিমলির দিকে একপলক তাকালাম। দেখলাম, ওর মুখ মলিন, গম্ভীর। অথচ অন্যসময় হলে ও আমাকে চোখ ঠারত। 'অ্যাক্স এফেক্ট' বলে ঠাট্টা করত।

প্রিয়বরণ মাথা নিচু করে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে-ফুপিয়ে কাঁদছিল। ওর কান্না ওই ফাঁপা গহ্বরে বিচিত্র প্রতিধ্বনি তুলছিল।

।। একতিরিশ ।।

প্রিয়বরণ একটু শান্ত হলে আমি জিগ্যেস করলাম, 'আর মলিন? এইটুকু ছেলের মধ্যে এত আশ্চর্য ক্ষমতা তৈরি হল কেমন করে? ওর কথায় শীত কমছে কেমন করে? আর পাতালদেবতাই বা ওর কথায় বাধ্য ছেলের মতো চলে যাচ্ছে কেন?'

মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে চোখ তুলে তাকাল প্রিয়বরণ। ওর ভেজা চোখে সবুজ আভা। এক অদ্ভুত আর্তি নীরব তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ছে সেই চোখ থেকে। অন্তত আমার তাই মনে হল।

যে-মুখের দিকে তাকিয়ে কখনও-কখনও আমার মায়া জড়ানো বলে মনে হয়েছে এখন মনে হল সেই মুখ আমার বুকের ভেতরে এক অদ্ভুত টান তৈরি করছে। ভাবতে অবাক লাগছে, আমার জন্যে—শুধু আমার জন্যে—এই ছেলেটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওর বিপজ্জনক ধর্মকে পরোয়া না করে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের সামনে লজ্জাহীনভাবে ওর দুর্বলতা বইয়ের খোলা পাতার মতো মেলে ধরেছে। মৃত্যুকে এই প্রিয়বরণ ভয় পায় না। ভয় পায় না পাতালদেবতাকেও। ও আমার প্রতি দুর্বল বলেই এত শক্তিমান। এত বিনত বলেই এত উদ্ধত।

ভাবতে-ভাবতে আমার চোখে জল এসে গেল। সেই অবস্থাতেই লক্ষ করলাম, ঝিমলি হতবাক হয়ে ওর বিদ্রুপলাঞ্ছিত 'অ্যাক্স এফেক্ট'-কে দেখছে। মিহিরদাও প্রিয়র দিকে তাকিয়ে—এমনকী গণপতিও।

শুধু মলিন আগের মতোই একমনে সবুজ দিঘির বিস্তারের দিকে চেয়ে আছে।

প্রিয়বরণ বলল, 'ম্যাডাম, সব কথা যখন বলেছি তখন মলিনের কথাই বা বাকি থাকে কেন?'

একবার মলিনের দিকে দেখল প্রিয়। তারপর বলল, 'আমাদের পাতালদেবতা শ'-শ' বছর ধরে উৎসর্গ করা প্রাণ নিয়ে নিজের পরমায়ু বাড়িয়েছেন। কিন্তু পরমায়ু বাড়ালেও তাঁর শেষ আছে। অনন্ত-প্রাণ তিনি নন।'

'এ কী কথা বলছেন আপনি?' অবাক হয়ে মিহিরদা বললেন।

'ঠিকই বলছি।' বলে চোখ মুছল প্রিয় ঃ 'যখন আমাদের দেবতার শেষ ঘনিয়ে আসে তখন তাঁর জায়গা নেয় আর-একজন। নতুন এক আত্মা আমাদের দেবতার শরীরে জায়গা করে নেয়।

'তবে এর তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় অনেক আগে থেকেই। মানে, সুকৃতিদা যেমন সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সব গুপ্তকথা আমার কাছে চেলে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই পাতালদেবতা তাঁর শ'-শ' বছরের সব স্মৃতি চেলে দিচ্ছেন মলিনের মাথার ভেতরে। তাই এর মধ্যেই মলিন জাতিস্মর হয়ে উঠেছে। বহু পুরোনো কথা ও গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারে। ওর মধ্যে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা এসে গেছে। এখনই ও পাতালদেবতার মতো শক্তিমান। আর কয়েকমাসের মধ্যেই মলিন হারিয়ে যাবে। ও মিশে যাবে পাতালদেবতার শরীরে, প্রাণে।'

প্রিয়বরণ হঠাৎই কথা থামিয়ে লম্বা শ্বাস নিল।

ঝিমলি ঠোঁটের ওপর দুবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'মিশে যাবে মানে?

আর ফিরে আসবে না?'

'না—আসবে না। এ-কথা আমি ওর বাবা-মাকেও বলিনি—কিন্তু আপনাদের বলছি।' মাথার ওপরে চোখ তুলে ঝুলন্ত ঝুরিগুলোকে দেখল প্রিয় ঃ 'মলিন মিলিয়ে যাবে। নতুন দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করবে। তখন আমার কাজও শেষ হবে। ব্যস...।' স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলল প্রিয়বরণ।

প্রিয়বরণের 'কাজ শেষ' হওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হল না।

সে-কথা ওকে জিগ্যেস করতে ও বলল, 'আমি মলিনের...ইয়ে...মানে... কেয়ারটেকার। যতদিন না ও নতুন দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করছে ততদিন ওকে বিপদ-আপদ থেকে আগলে রাখার দায়িত্ব আমার। এখন মলিনের বয়েস প্রায় দশবছর হতে চলেছে। ওর মধ্যে পাতালদেবতার অনেক ক্ষমতাই চলে এসেছে। এখন পাতালের অন্ধকারের সিংহাসনে মলিন বসবে। ব্যস, তখনই আমার ছুটি...' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রিয়বরণ। চারপাশে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'বলুন, আর কী জানতে চান আপনারা?'

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম।

অবিশ্বাস্য এই কাহিনি শোনার পর আমার মন পেন্ডুলামের মতো দুলতে লাগল। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের বিভেদরেখার ওপরে দাঁড়িয়ে দু-হাত দুপাশে বাড়িয়ে আমি যেন প্রাণপণ চেষ্টায় ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছি। আর আমার মুখোমুখি কান্না-ভেজা চোখে বসে থাকা অসহায় ছেলেটাকে দেখছি।

কী আশ্চর্য এই ছেলে! এ ক'দিন ধরে ওর মনের ওপর দিয়ে কী ঝড়ই না বয়ে চলেছে! মলিনকে আগলে রাখার দায়িত্ব, পাতালদেবতার প্রতি অটুট ভক্তি, আমার দিকে টান, আর সতীর্থদের সঙ্গে বেপরোয়া বিবাদ। কী টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই না ওর সময়টা কেটেছে...কাটছে!

হঠাৎই আমার সবুজ পাথর আর পুঁথির কথা মনে পড়ল। বাঘমুন্ডি পাহাড়ের সেই গুণিন আমাদের বলেছিল, পাতালের এই অপদেবতা একটা পুঁথি আর একটা সবুজ পাথর পাহারা দেয়। কী আছে সেই পুঁথিতে? আর ওই সবুজ পাথরের রহস্যই বা কী?

প্রিয়কে এ-কথা আমার বলা হয়নি। কিন্তু পাথর আর পুঁথির কথা জিগ্যেস করতেই দেখলাম, ব্যাপারটা ও জানে। ও বলে উঠল, 'ও হ্যাঁ। ওই দুটো ব্যাপারে আমার কিছু বলা হয়নি।' আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রিয় বলল, 'ওই পুঁথিটা ভারী রহস্যময়, ম্যাডাম। দেবতার কাছে শুনেছি, ওতে আদিকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কালের ইতিহাস লেখা আছে। গত কয়েকশো বছর ধরে লেখা ওই

পুঁথির হরফ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বদলেছে। যে-আত্মা যে-সময়ে পাতালদেবতার অন্তরে বাসা বেঁধেছে, সে তার নিজের ভাষায়, নিজের অক্ষরে, কালের ইতিহাস লিখে গেছে। ও-পুঁথি একমাত্র দেবতা ছাড়া আর কেউ কখনও দেখেনি। মলিনের যখন সময় আসবে তখন মলিনও ওই ইতিহাস লিখবে—নিজের মতো করে...।'

আমরা হতবাক হয়ে প্রিয়বরণের কথা শুনছিলাম। পাতালে লেখা হচ্ছে কালের ইতিহাস! কয়েকশো বছর ধরে...কিংবা হাজার-হাজার বছর ধরে! প্রিয় বলেছে, ওদের এই দেবতার বয়েসের কোনও গাছ-পাথর নেই। ফলে পাতালদেবতার শুরু কবে হয়েছিল কেউ জানে না। জানে শুধু ওই বিচিত্র ভয়ংকর দেবতা। মলিনও জানবে আর কিছুদিন পরে।

এখন শুধু বাকি রইল পাথরের কথা।

প্রিয়বরণ বলল, 'ওটার রহস্য আমরা কেউই ঠিকমতো জানি না, ম্যাডাম। কেউ বলে, ওটা থেকেই আমাদের দেবতা সবুজ রং পেয়েছেন, আর এই দিঘির রং হয়েছে সবুজ...।'

মিহিরদা জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, দিঘির ওই গ্রিন লিকুইডটা কী?'

'ওটা আমাদের দেবতার লালা। নানান ধরনের উত্তেজনার সময় তাঁর শরীর থেকে ওই সবুজ লালা বেরিয়ে আসে। সেই লালা বছরের-পর-বছর জমে-জমে এই দিঘি তৈরি হয়েছে। ওই পাথরটার জন্যে নাকি এই লালার রংও সবুজ।'

একটু চুপ করে থেকে প্রিয়বরণ আবার বলল, 'জানেন, আমাদের ভক্তদের মধ্যে কারও-কারও বিশ্বাস, ওই পাথরে চোখ রেখেই পাতালদেবতা মর্তের সবকিছু দেখতে পান। আবার কেউ বলে, ওই পাথরটা পাতালদেবতার কাছে শুভ। ওই পাথরটা আছে বলেই তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ তাঁর ক্ষতি করতে পারে না।' এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকাল প্রিয় ঃ 'না, ম্যাডাম—এই পাথরটার ব্যাপার আমি ঠিক-ঠিক জানি না—তাই আপনাকেও ঠিকমতো শিয়োর হয়ে বলতে পারছি না...।'

প্রিয় থামল। ওর কথাগুলো গুহার দেওয়ালে যে-গমগমে প্রতিধ্বনি তুলছিল একলহমা পরে সেটাও থেমে গেল। চারিদিক ভীষণ চুপচাপ হয়ে গেল। আমি ওর বলে যাওয়া অবিশ্বাস্য অলৌকিক কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

একটু পরে প্রিয় জিগ্যেস করল, 'আর কিছু কি জানার আছে, ম্যাডাম?'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'না, আমার আর কিছু জানার নেই।'

মিহিরদা বললেন, 'এ-কাহিনি আমি কাগজে লিখতে পারব না। কারণ, তাতে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারের কোনও সমাধান তো হবেই না—উলটে আপনাদের মতো

কিছু মানুষ বিপদে পড়বে, দলাদলি আরও বাড়বে। না, প্রিয়বরণবাবু, আর কিছু আমাদের জানার নেই...।'

ঝিমলি হঠাৎই প্রশ্ন করল, 'তাই বলে এটার কোনও এন্ড নেই?'

বিষণ্ণভাবে হাসল প্রিয়, বলল, 'এন্ড আছে কি নেই জানি না, ম্যাডাম—তবে যদি-বা থাকে, তা হলে সেটা আছে পাতালদেবতার হাতে—মলিনের হাতে।'

'চলুন, এবারে আমরা ফিরে যাই—' বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর প্রিয়বরণকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্যে কেন জানি না ওর দিকে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিলাম।

প্রিয় আমার চোখের দিকে তাকাল। তারপর ডানহাতের মুঠোয় আমার হাতটা চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

আমরা সবাই রওনা হওয়ার জন্যে একসঙ্গে জড়ো হলাম।

প্রিয়বরণ মলিনকে ডাকল, 'মলিন, এদিকে আয়। আমরা এখন ফিরে যাব।'

মলিন ঠিক যেন পোষা কুকুরের মতো ছুট্রে চলে এল প্রিয়র কাছে।

প্রিয় আমার হাতটা তখনও মুঠো করে ধরে ছিল। অবশ্য আমিও হাতটা আর ছাড়িয়ে নিইনি।

মলিন ছুটে এসে প্রিয়র অন্য হাতটা চেপে ধরে জিগ্যেস করল, 'আমরা এখন কোথায় যাব, কাকু?'

'বাড়ি যাব। রাত অনেক হয়ে গেছে—।'

ঠিক তখনই একটা হইচই গোলমাল আমাদের কানে এল। যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা মউমাছির একঝাঁক গুঞ্জন।

প্রিয়বরণের চোখ-মুখ পালটে গেল। ও আমার দিকে ফিরে চাপা গলায় বলল, 'আপনারা এইখানটায় দেওয়াল চেপে লুকিয়ে থাকুন, ম্যাডাম। আমি সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে দেখছি ব্যাপারটা কী। মলিন আপনাদের কাছে থাক...।'

আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখের দিকের ছুটে গেল প্রিয়বরণ। সবুজ আলোর আভায় ওকে স্পষ্ট দেখা গেল না। একটু পরেই ও ঝাপসা আলো-আঁধারিতে মিলিয়ে গেল।

আমরা সুড়ঙ্গের এবড়োখেবড়ো দেওয়ালে গা মিশিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মলিনের মধ্যে অবশ্য কোনও হেলদোল দেখলাম না। ও কোমরে হাত রেখে এমনভাবে অপেক্ষা করতে লাগল যেন সামনে প্রবল লড়াই চলছে আর সেনাপতি সেটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে।

আমার একটুও ভয় করছিল না। কারণ, আমাদের সঙ্গে মলিন রয়েছে। প্রিয়বরণের কাছ থেকে সব শোনার পর আমার সমস্ত ভয়-আশঙ্কা কেটে গেছে।

এমনকী সবুজ দিঘির ওই মুণ্ডহীন সরীসৃপ আবার দেখা দিলেও তেমন একটা ভয় পাব বলে মনে হয় না।

শুধু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল প্রিয়বরণের জন্যে। আমাদের জন্যে আর কত লড়াই ও লড়বে!

সুঁড়ঙ্গের ভেতর থেকে ভেসে আসা শব্দটা কখন যেন বেড়ে উঠেছে। একটু আগেই যেটা ছিল মউমাছির গুঞ্জন সেটা এখন যেন হিংস্র পশুর চাপা গর্জন।

দুশ্চিন্তার মাত্রা যখন আরও একটু বেড়েছে তখন প্রিয়বরণ উদভ্রান্তের মতো ছুটে এল আমাদের কাছে। মলিনের দু-কাঁধ চেপে ধরে বলল, 'মলিন! মলিন! ওরা থামেনি! ওদের সঙ্গে অনেক নতুন লোক। ওরা সব জোট বেঁধে ঢুকে পড়েছে সুড়ঙ্গের ভেতরে। ওরা অনেক বেশি ঝাড়ফুঁক জানে। কী হবে এখন! তুই...তুই কিছু একটা কর...।'

প্রিয়বরণকে এর আগে এতটা ভয় পেতে আমি দেখিনি। বরং বারবারই ও বলেছে, মলিন যখন আমাদের সঙ্গে আছে তখন কোনও ভয় নেই।

আমি প্রিয়কে বললাম, 'আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

প্রিয় মলিনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে ঃ 'ওরা কয়েকজন তান্ত্রিক ভক্তকে নিয়ে এসেছে। তারা অনেক মন্ত্র-টন্ত্র জানে—আমার চেয়ে বেশি। সুড়ঙ্গের ভেতরে অন্ধকারের মধ্যে তার কয়েকটা নমুনা আমি দেখতে পেয়েছি, ম্যাডাম...।'

'কিন্তু মলিনের চেয়ে তো বেশি নয়?'

'না, তা নয়—।'

'তা হলে আর ভয় কীসের?'

'সেইজন্যেই তো মলিনকে নিয়ে যেতে এসেছি। প্রথমটায় ভেবেছিলাম আমিই ঠেকাতে পারব। পরে দেখলাম, না—মলিনকে লাগবে। আপনারা এখানেই লুকিয়ে থাকুন—' মলিনের দিকে তাকাল প্রিয়বরণ ঃ 'চ', মলিন, চ'। শিগগির! হাতে আর টাইম নেই।'

'চলো, কাকু...।'

সঙ্গে-সঙ্গে প্রিয়বরণ সুড়ঙ্গের মুখ লক্ষ করে আবার ছুট লাগাল। ওর পেছন-পেছন মলিন।

ঠিক তখনই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটে গেল।

জলন্ত আগুনের একটা বল অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে আচমকা ঠিকরে এল। তারপর গাইডেড মিসাইলের মতো শূন্যে প্রায় নব্বই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে ছুটে এল প্রিয়বরণের দিকে। এবং ওর বুকে এসে আছড়ে পড়ল।

প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ হল। তার সঙ্গে মিশে গেল প্রিয়বরণের আর্ত চিৎকার। আর আমিও যে কখন চিৎকার করে উঠেছি জানি না।

প্রিয়বরণ ছুটে যাচ্ছিল সুড়ঙ্গের মুখের দিকে। আগুনের গোলাটা বুলেটের মতো ওর বুকে আছড়ে পড়তেই ওর রোগা শরীরটা পেছনদিকে ছিটকে পড়ল। যেন অদৃশ্য দেওয়ালে আচমকা ধাক্কা খেয়েছে।

আমি, মিহিরদা, ঝিমলি, গণপতি—সবাই ছুটে গেলাম প্রিয়র কাছে।

ওর শরীরের ওপরে ঝুঁকে পড়লাম।

ওর জামায় আগুন ধরে গিয়েছিল। চট করে আমার আর ঝিমলির ওড়না টেনে নিয়ে মিহিরদা প্রিয়র শরীরে ঝাপটা মারতে লাগলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আগুন নিভে গেল।

কিন্তু ততক্ষণে আমি যা দেখার দেখে ফেলেছি। দেখেছে প্রত্যেকেই।

প্রিয়র বুকের কাছটায় একটা পোড়া গর্ত। সেখান থেকে একটা লোহার রড বেরিয়ে আছে। আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর শরীর।

প্রিয়বরণ সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ দুটো বড়-বড়। মুখটা হাঁ করা। মাঝে-মাঝে হেঁচকি তুলছে আর সেই দমকে মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

আমি মিহিরদার কাছ থেকে ওড়না দুটো নিয়ে প্রিয়র বুকে চেপে ধরলাম। ও-দুটো রক্তে ভিজে গেল।

মলিন প্রিয়র ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'কাকু! কাকু!' বলে কাঁদতে লাগল।

মিহিরদা আর গণপতি মিলে জোরে টান মেরে লোহার রডটা ওর শরীর থেকে বের করে নিল। তার সঙ্গে কয়েক ঝলক রক্তও ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল।

প্রিয় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'মলিন, কাউকে ছাড়বি না। এর...এর...একটা শেষ হওয়া দরকার। তুই...তুই...।'

'কাকু!' কান্না-ভাঙা গলায় কেঁদে উঠল মলিন।

'তুই...তুই...পাতালদেবতা...হবি না...কক্ষনও না। এর শেষ...হওয়া দরকার... বুঝলি?' নইলে সবাই...আমার মতো...এইভাবে শেষ হয়ে যাবে। কেউ...বাঁচবে না।

হেঁচকি তুলে-তুলে কথা বলছিল প্রিয়বরণ। ওর গলার স্বর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছিল।

মলিন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি সব শেষ করে দেব, কাকু—সব শেষ করে দেব। শেষ...শেষ...শেষ!'

মিহিরদার হাতে লোহার রডটা ধরা ছিল। দেখলাম সেটা রড নয়, একটা তির। রডের মাথায় একটা লম্বা ছুঁচলো ফলা। তাতে নিশ্চয়ই রক্ত লেগে আছে।

কারণ, সবুজ আলোয় লাল রক্তকে কালো দেখাচ্ছিল বলে ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিল না।

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ঝিমলিও ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

প্রিয়বরণ হেঁচকি তুলে বলল, 'অন্তরা ম্যাডাম, আমি...যাই। মলিন...রইল। কোনও...ভয়...নেই...।'

আমি ওর মুখের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম। কিছু একটা বলতে চাইলাম, কিন্তু মুখ থেকে শুধু কয়েকটা কান্নার টুকরো বেরিয়ে এল।

॥ বত্রিশ ॥

প্রিয় অতিকষ্টে বলল, 'অন্তরা ম্যাডাম, আমি...আমি...।'

ওর চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। কথা আটকে যাচ্ছিল বারবার। শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ কষ্টে ও বলল, 'আপনার...আপনার...কোনও ভয়...নেই। মলিন...মলিন...রইল। আ...আমি যাই...। অন্তরা ম্যাডাম...।'

প্রিয় থেমে গেল। আর লড়াই করতে পারল না। ওর শরীরটা শেষ আক্ষেপে একবার তীব্রভাবে কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুকের ভেতরে যেন একটা লোহার তির গেঁথে গেল। চোখের ওপরে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল। দু-গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল। আমি প্রিয়র করুণ মৃতদেহের দিকে অবশ চোখে চেয়ে রইলাম।

'কাকু! কাকু গো!' বলে বুকফাটা চিৎকারে পাতালগুহা কাঁপিয়ে দিল মলিন। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর নিথর শরীরের ওপরে। প্রিয়র গায়ে মাথা ঘষে-ঘষে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ও সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

একটু আগেই শোকে কাতর এক সাদাসিধে বালককে দেখেছিলাম। এখন যাকে দেখছি তার চোখে রুদ্র ক্রোধ।

আচমকা এক তীব্র শিস দিয়ে উঠল ছেলেটা।

সেই শিসের তীব্রতায় আর তীক্ষ্ণতায় আমাদের কানে তালা লেগে গেল। আমরা চটপট কানে আঙুল দিলাম।

মলিন শিস দিতে-দিতেই ছুটে গেল সুড়ঙ্গের মুখের দিকে। ওর ডানহাতটা আক্রমণের ভঙ্গিতে সামনে বাড়ানো। যেন কোনও যোদ্ধা তরোয়াল সামনে বাড়িয়ে

যুদ্ধের জিগির তুলে ছুটে চলেছে।

আমরা প্রিয়বরণের মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়েই মলিনকে দেখতে লাগলাম।

হঠাৎই ছেলেটা শিস দেওয়া বন্ধ করল। চিৎকার করে হিজিবিজি কী একটা বলল। এবং ঠিক তার পরের মুহূর্তেই ওর সামনে বাড়ানো হাতের প্রান্ত থেকে জ্বলন্ত তির ছিটকে বেরোতে লাগল—একের পর এক।

সেই তিরগুলো দুরন্ত বেগে ছুটে গেল সুড়ঙ্গের ভেতরে।

আমি একছুটে মলিনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। যোদ্ধা ছেলেটা তখনও আগুনের তির নিক্ষেপ করে চলেছে। ওর 'কাকু'র অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে।

মলিনের ছুড়ে দেওয়া আগুনের বলগুলো একের-পর-এক ছুটে যাচ্ছিল সুড়ঙ্গের ভেতরে। ওদের আলোর আভায় সুড়ঙ্গের ভেতরটা আলো হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখলাম, সুড়ঙ্গের প্রথম বাঁকে তিরগুলো স্বচ্ছন্দ বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুড়ঙ্গের পথ ধরে এগিয়ে আসা বিরোধীপক্ষের কলরোল এখন আরও স্পষ্ট। অর্থাৎ, ওরা আমাদের আরও কাছাকাছি চলে এসেছে।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই শুরু হয়ে গেল আর্ত চিৎকার। মলিনের আগুন-তির তখনও একের-পর-এক ছুটে চলেছে। আর সুড়ঙ্গের অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসা আর্তনাদের ডেসিবেল মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সেইসঙ্গে পোড়া গন্ধ।

মলিন হঠাৎই থামল। তারপর সুড়ঙ্গের দিকে আগুনঝরা চোখে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোরা সব খতম! খতম!' আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওর সামনে বাড়ানো হাতের আঙুলের ডগা থেকে নীল বিদ্যুতের স্রোত বেরিয়ে এল। দুরন্ত বেগে সাপের মতো এঁকেবেঁকে সেই স্রোত ছুটে গেল সুড়ঙ্গের ভেতরে। উজ্জ্বল নীল আভায় সুড়ঙ্গের ভেতরটা ঝলসে উঠল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সব আর্ত চিৎকার শেষ।

মলিন আবার তীব্র শিস দিয়ে উঠল—পাতালদেবতার শিসের মতো। তারপর ঘুরে তাকাল প্রিয়বরণের মৃতদেহের দিকে। বালকের মতো নিষ্পাপ স্বরে বলে উঠল, 'ওরা আর নেই, কাকু। ওরা আর নেই।'

তারপর ও গুহার ছাদের দিকে মুখ তুলে করুণ স্বরে একটানা চিৎকার করে চলল। এক অসহায় পশুর বুকফাটা কান্না।

আমরা চুপ করে রইলাম। দেখতে লাগলাম ছিন্ন অলৌকিক সম্পর্কের যন্ত্রণা।

কিছুক্ষণ পর মলিন থামল। তখন মিহিরদা মলিনের কাছে এগিয়ে গেলেন। ওকে জিগ্যেস করলেন, 'মলিন, যে-পথে আমরা এখানে এসে ঢুকেছি সে-

পথ দিয়ে এখন কি আর বেরোনো যাবে? আমরা এই পাতাল থেকে বেরোব কেমন করে?'

আমি বুঝতে পারলাম, মিহিরদা সুড়ঙ্গে পথ আটকে পড়ে থাকা শত্রুদের মৃতদেহ কিংবা ধ্বংসাবশেষের কথা ভাবছেন। অবশ্য আমার মাথাতেও সে-চিন্তা ঘুরছিল।

মলিন কিন্তু একটুও বিচলিত হল না। ও অভিভাবকের চোখে মিহিরদার দিকে তাকাল। তারপর ভরসা দিয়ে বলল, 'ভয় নেই, আমি তো আছি! আমি পথ করে দেব...।'

কথাটা বলেই মলিন ছুট লাগাল দিঘির এক প্রান্তের দিকে। সেখানে গিয়ে গুহার দেওয়ালে কী যেন দেখতে লাগল।

আমরা অবাক হয়ে মলিনকে লক্ষ করতে লাগলাম।

ও হঠাৎই ছাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকল। সঙ্গে-সঙ্গে আমি আর ঝিমলি চোখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

ঝিমলি আমার হাত ধরে টান মেরে বলল, 'অন্তরা লেট্স গো। আমার কেমন দম আটকে আসছে। কাম অন—কুইক।'

আমি অসহায়ভাবে প্রিয়বরণের দিকে তাকালাম। কালো এবড়োখেবড়ো জমিতে স্থিরভাবে পড়ে আছে। দিঘির দিক থেকে সবুজ আলোর আভা ওর বাঁ-গালে এসে পড়েছে।

আমার চোখে আচমকা বান ডাকল। এক কোমল মোলায়েম মমতা বুকের ভেতরে উথলে উঠল। আমার 'অ্যাক্স এফেক্ট'। আমার জন্যে ও প্রাণ দিয়েছে। আমার জন্যে কেউ সত্যি-সত্যি প্রাণ দিতে পারে এ-কথা কখনও ভাবিনি। তাই এই করুণ মৃতদেহটা আমার কাছে ভীষণ দামি। আমার গলার কাছে একটা শক্ত বল আটকে গেল। রুদ্ধ-কণ্ঠে কোনওরকমে মিহিরদাকে বললাম, 'প্রিয়বরণ এখানে এভাবে পড়ে থাকবে, মিহিরদা?'

মিহিরদা আমাকে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন। তারপর বললেন, 'না, ওকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। গণপতি—' বলে গণপতির দিকে ফিরলেন ঃ 'হাত লাগাও। ডেডবডিটা তোলো...।'

সুতরাং আমরা চারজন আর প্রিয়বরণ মলিনের দিকে এগোলাম। কিন্তু ওই ছেলেটার কাছে পৌঁছতেই ও কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'কাকুকে আপনারা নিয়ে এলেন কেন? কাকু বলেছিল, এই পাতালে এসে একদিন জীবন শেষ করবে। বলত, এই পাতাল আমাদের দেবতার থান। এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। সেইজন্যেই কাকুকে আমি তুলে আনিনি। নইলে এটুকু আর কী এমন শক্ত কাজ!'

মিহিরদা ধরা গলায় বললেন, 'না, ওকে আমরা এখানে ফেলে রেখে যাব না। ও আমাদের অনেক উপকার করেছে। ওকে এই অশুভ জায়গায় রেখে যাব না। হি ডিজার্ভস বেটার...।'

শেষ কথাটা মিহিরদা বিড়বিড় করে বললেন।

ঝিমলি মলিনকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ।

ডুকরে উঠে বলল, 'মলিন, তুমি আমাদের সব। প্রিয়...চলে...গেছে। তুমি যেন চলে যেয়ো না। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ য়ু! উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ য়ু, মলিন...।'

হঠাৎ করেই যেন ঝিমলির নার্ভের সুতো ছিঁড়ে গেছে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করতে চাইলাম। টের পেলাম, ওর রোগা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

মলিন চোখ মুছে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ভেজা চোখে কাঠকয়লার আগুন জ্বেলে বলল, 'আমি আছি, দিদি। আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমিই এখন পাতালদেবতা। আমার কথা সবাইকে শুনতে হবে—শুনতেই হবে।'

গুহার দেওয়ালের খুব কাছে চলে গেল ছেলেটা। ডানহাতের একটা আঙুল দেওয়ালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার মতো কী যেন বলল। তারপরই দেওয়াল থেকে আঙুলটা সরিয়ে নিল।

সঙ্গে-সঙ্গে দাঁতের কামড়ে তালমিছরি ভাঙার মতো কড়মড়-কড়মড় শব্দ হল। আর কালো দেওয়ালের একটা জায়গা থেকে পাথরের ছোট-ছোট টুকরো খসে পড়তে লাগল।

পাঁচমিনিটের মধ্যেই আমাদের চোখের সামনে নতুন একটা সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে গেল। সুড়ঙ্গটার ঢাল ওপরদিকে হওয়ায় ভাঙা পাথরগুলো গড়িয়ে পাতালগুহায় এসে পড়তে লাগল।

মলিন আমাদের চেঁচিয়ে সাবধান করল, সরে যেতে বলল। আমরা ওর কথামতো চটপট দুপাশে সরে দাঁড়ালাম, পাথর পড়া দেখতে লাগলাম।

একটু পরেই মলিন আমাদের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়তে বলল।

আমি আর ঝিমলি সবে সুড়ঙ্গের মুখটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, মলিন বলল, 'একটু দাঁড়াও, দিদি। একটা কাজ এখনও বাকি...।'

মলিন কিছু না বললেও আমরা দাঁড়িয়ে পড়তাম। কারণ, ওর তৈরি করা নতুন সুড়ঙ্গটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

মিহিরদা আর গণপতি প্রিয়বরণের মৃতদেহটা মেঝেতে শুইয়ে দিয়েছিল। মিহিরদা জানতে চাইলেন, 'কী কাজ মলিন?'

মলিন বলল, 'বদলা।'

তারপর ও মিহিরদা আর গণপতির কাছে এগিয়ে গেল। ডানহাতের একটা আঙুল প্রিয়বরণের মৃতদেহে ছুঁইয়ে বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিল সবুজ দিঘি লক্ষ করে। এবং ট্রেনের হুইস্‌লের মতো ভয়ংকর তীব্র এক শিস দিয়ে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে দপ করে আগুন জ্বলে গেল সবুজ দিঘির তরলে। তবে সে-আগুনের রং হলদে কিংবা লাল নয়—সবুজ। ইলেকট্রিকের তারে স্পার্ক হওয়ার সময় কখনও-কখনও এরকম সবুজ আগুনের ঝিলিক দেখেছি।

আগুন জ্বলে ওঠার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পাতালের সেই দেবতা অথবা দানবকে দেখা গেল। তার প্রকাণ্ড সর্পিল শরীর আবার ভেসে উঠল দিঘিতে। প্যাঁচানো স্প্রিং-এর মতো শরীরটাকে মুচড়ে পাগলের মতো ছটফট করতে লাগল সেই অতিকায় হিমশীতল সরীসৃপ।

হিসহিস শব্দে পাতালগুহাটা ভরে গিয়েছিল। শব্দ লক্ষ করে ওপরদিকে তাকিয়ে দেখি গুহার ছাদ থেকে ঝুলে থাকা লম্বা-লম্বা ঝুরিগুলো আবার হিলহিল করে নড়ছে, আর হিসহিস শব্দ করে ফুঁসছে।

দেখতে-দেখতে সবুজ আগুনের শিখা পাতালদানবকে প্রায় ঢেকে ফেলল। তবে সেই লকলকে শিখার আড়াল ভেদ করেও তার অস্থির ছটফটানি মাঝে-মাঝে চোখে পড়ছিল। আর তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিলিংয়ের সরীসৃপগুলোর যন্ত্রণাকাতর মোচড়ানি বাড়ছিল।

আমি এতই অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখছিলাম যে, খেয়ালই করিনি পাতালগুহার উষ্ণতা কখন যেন ধীরে-ধীরে কমে গেছে। আমি শীতের কামড় বেশ টের পাচ্ছিলাম। অথচ আমাদের সামনে সবুজ আগুন জ্বলছে। এ কী বিচিত্র শীতল আগুন!

হঠাৎই মলিন শিস দেওয়া থামাল। তারপর ওপরদিকে মুখ তুলে খলখল করে হেসে উঠল। হাসিটার মধ্যে কোথায় যেন বিদ্রুপ আর তৃপ্তি মিশে ছিল।

তখনই আমি বুঝলাম, পাতালদেবতার ঐতিহ্যের এখানেই শেষ। ওই প্রাচীন পুঁথি আর ওই অমূল্য পাথরের খোঁজ আর কেউ কখনও পাবে না।

দিঘির ওপরে জ্বলতে থাকা সবুজ আগুনের শিখা ক্রমশ দৈর্ঘ্যে বাড়ছিল। বাড়তে-বাড়তে একসময় ওটা গুহার ছাদ ছুঁয়ে ফেলল—ছুঁয়ে ফেলল ঝুলন্ত সরীসৃপগুলোকে।

মলিন হাসি থামিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'দিদি, এবার চলো। আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসব ধ্বংস হয়ে যাবে। সব খতম হয়ে যাবে...।'

আমরা আর দেরি না করে মলিনের তৈরি করা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমি ওকে বললাম, 'তুমি আগে-আগে চলো। না হলে এই ঘুটঘুট্টে অন্ধকারে আমরা

কিছুই দেখতে পাচ্ছি না...।'

মলিন আমাকে আর ঝিমলিকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

সবুজ আগুনের আভার জন্যে ওর গা থেকে বেরোনো আলোর ছটা এতক্ষণ ঠিকমতো ঠাহর হচ্ছিল না। কিন্তু ও সুড়ঙ্গের অন্ধকারে ঢুকে পড়তেই সবুজ আলোর ছ'টা আবার প্রকাশিত হল।

ঠান্ডা সুড়ঙ্গের এবড়োখেবড়ো পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। মলিনের পেছনে আমি আর ঝিমলি। তার পেছনে প্রিয়বরণের মৃতদেহ নিয়ে মিহিরদা আর গণপতি।

সুড়ঙ্গটা কিছুটা ওপরমুখী হওয়ায় আমাদের এগোতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। পেছন থেকে মিহিরদা আর গণপতির বড়-বড় শ্বাস ফেলার শব্দ টের পাচ্ছিলাম। অথচ আমার সামনে মলিন বেশ তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল আর তাড়াতাড়ি পথ চলার জন্যে আমাদের তাড়া দিচ্ছিল। আমরাও হাঁপাতে-হাঁপাতে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে অনুসরণ করছিলাম।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, তারাভরা একটুকরো আকাশ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, আমরা মলিনের তৈরি সুড়ঙ্গের খোলা মুখের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

আর ঠিক তখনই বিস্ফোরণটা শুরু হল।

আমাদের পেছন থেকে সুড়ঙ্গের পথ ধরে 'গুমগুম' শব্দটা ছুটে এসে আমাদের ধাক্কা মারল।

আমরা মরিয়া হয়ে যত জোরে পারি পা চালিয়ে সুড়ঙ্গের খোলা মুখের দিকে এগোলাম। আমাদের পেছনে একটার-পর-একটা বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে। ঠিক যেন বজ্রমেঘের গম্ভীর গুড়গুড় শব্দ।

আমরা সুড়ঙ্গের বাইরে এসে সবে দাঁড়িয়েছি, এক মহাবিস্ফোরণে পায়ের নীচের জমি, আকাশ, বাতাস—সব কেঁপে উঠল। এক প্রবল ধাক্কায় আমরা সবাই ছন্নছাড়া মার্বেলের মতো এদিক-সেদিক ছিটকে পড়লাম। ঝিমলি আর আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। সেইসঙ্গে মলিনের গলা দিয়েও অপার্থিব এক চিৎকার বেরিয়ে এল। তবে সেই চিৎকারটা উল্লাস না আতঙ্কের ঠিক বোঝা গেল না।

আমি এবড়োখেবড়ো জমিতে চিত হয়ে পড়েছিলাম। দেখলাম, গুড়গুড় গর্জনের সঙ্গে মাটি-পাথর ফেটে চৌচির। ফুঁসে ওঠা আগ্নেয়গিরির মতো সবুজ আগুনের ফোয়ারা ঝলকে-ঝলকে ছিটকে উঠছে শূন্যে। আমার শরীরের নীচে মাটি থরথর করে কাঁপছে। ধ্বংসের মহাগর্জন কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎই মাটির নীচ থেকে কে যেন প্রচণ্ড জোরে আমাকে ধাক্কা মারল। আমি পাখির মতো ভেসে উঠলাম শূন্যে। রাতের কালো আকাশ আমার চোখের সামনে

দুলে উঠল। আমার শরীরটা আবার নীচের দিকে নেমে আসতে লাগল। তারপর একটা পাথরের বিছানায় যেন আছড়ে পড়ল।

এরপরই বোধহয় আমি জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম। কারণ, আর আমার কিছু মনে নেই।

চেতনা যখন ফিরে পেলাম তখন আমার চোখ পড়ল আকাশের দিকে।

অন্ধকার কালো আকাশ। তাতে অসংখ্য হলদে আলোর ফুটকি। কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই।

চিত হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই টের পেলাম, সব গর্জন থেমে গেছে। সবুজ আগুনের শিখাও আর চোখে পড়ল না। চারিদিক প্রশান্ত। শুধু ঝিঁঝিপোকার ডাক শোনা যাচ্ছে।

পাশ ফিরতে গিয়ে বুঝলাম, শরীরে বেশ ব্যথা। চেতনার তরঙ্গ স্বাভাবিক হয়ে আসতেই মিহিরদাদের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মলিনের কথা।

আমি মিহিরদার নাম ধরে কয়েকবার ডাকলাম।

কোনও সাড়া নেই।

তখন মলিনের নাম ধরে ডেকে উঠলাম।

এবারও কোনও সাড়া নেই।

তখন বাধ্য হয়ে পাশ ফিরলাম, অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎই কান্নার আওয়াজ পেলাম। মনে হল, একটা বাচ্চা ছেলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

অন্ধকারে ভালো করে নজর চলে না। যেটুকু দেখা যাচ্ছে, ছায়া-ছায়া এলোমেলো গাছপালা আর জোনাকি পোকার আলো। এ ছাড়া হালকা একটা পোড়া গন্ধ যেন নাকে আসছিল।

কান্নার শব্দ লক্ষ করে আন্দাজে সবে এগোতে শুরু করেছি, হঠাৎই আমার নাম শুনতে পেলাম। মিহিরদা 'অন্তরা! অন্তরা!' বলে ডাকছেন।

এরকম অসহায় অবস্থায় অন্ধকারে চেনা লোকের গলায় নিজের নাম শুনলে যে এত আনন্দ হয় তা আমি আগে জানতাম না।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মিহিরদা! মিহিরদা! এই যে, আমি এখানে—।'

মিহিরদা আবার আমার নাম ধরে ডাকলেন। বুঝলাম, ডাকটা ক্রমেই আমার কাছে এগিয়ে আসছে।

এইভাবে ডাক আর পালটা ডাকের খেলা খেলতে-খেলতে আমরা কিছুক্ষণের

মধ্যেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম। আমি 'মিহিরদা!' বলে ওঁকে জড়িয়ে ধরলাম। আবেগে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। এতক্ষণ ধরে মন শক্ত করে যে-ভয়টাকে প্রাণপণে রুখছিলাম এখন মিহিরদাকে কাছে পেয়ে আমার সব প্রতিরোধ উবে গেল। মনে হল, মিহিরদাই আমার সবচেয়ে বড় ভরসা। সব বিপদে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন।

মিহিরদা আমার মাথায় কয়েকবার হাত বুলিয়ে বললেন, 'অন্তরা, চলো, আমাদের নীচে নামতে হবে। তুমি পারবে তো?'

'পারতেই হবে, মিহিরদা—।' আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, 'কান্নার শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। বোধহয় মলিন। চলো বাকিদের খুঁজে বের করি...।'

মিহিরদার কাঁধে ঝোলা-ব্যাগ নেই। থাকলে নিশ্চয়ই টর্চটা বের করতেন। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলেও ওটা দু-একমিনিট অন্তত টিমটিম করে জ্বলত।

মিহিরদাকে সে-কথা বলতেই বললেন, 'লাস্ট এক্সপ্লোশানটায় আমি যখন ছিটকে পড়েছি তখনই ব্যাগটা কোথাও হয়তো হারিয়ে গেছে...।'

অনেক কষ্টে খোঁজাখুঁজি করে আমরা একে-একে সবাইকেই পেলাম।

মলিন যেমন ভয় পেয়ে কাঁদছিল, ঝিমলিও সেরকম কাঁদছিল। কিন্তু ওর কান্না আমরা শুনতে পাইনি। ওকে আমরা আচমকাই খুঁজে পেয়ে গেলাম।

খুঁজে পেলাম প্রিয়বরণ আর গণপতিকেও।

গণপতির গলায় চোট লেগেছিল বলে ও কথা বলতে পারছিল না। তাই ও বুদ্ধি করে অন্য পথ নিয়েছিল। ওর কাছে একটা গ্যাস লাইটার ছিল। ও সেটা একবার জ্বালছিল, একবার নেভাচ্ছিল। সেই আলো হঠাৎই আমি আর মিহিরদা দেখতে পেয়েছিলাম।

গণপতির কাছাকাছিই ছিল প্রিয়বরণের বিধ্বস্ত মৃতদেহ। গণপতি আর মিহিরদা আবার মৃতদেহটা তুলে নিল। আমরা সবাই কোনওরকমে বাঘমুন্ডি পাহাড় থেকে নীচে নামতে লাগলাম। যেহেতু রাস্তা চিনি না সেহেতু আমাদের 'ধ্রুবতারা' ছিল নীচে মেটাল রোডের আলোগুলো।

মলিন আমার সঙ্গে নামছিল। কিন্তু ছেলেটা এখন যেন একেবারে পালটে গেছে। ভয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে, আর সর্বক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করছে, 'মা-র কাছে যাব। মা-র কাছে যাব।'

কিন্তু আমার আর চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল কতক্ষণে বিছানায় গিয়ে শরীরটাকে ঢেলে দেব।

শেষ পর্যন্ত কী করে যে আমরা মেটাল রোডের কাছে নেমে এলাম জানি

না। সেখানকার দোকানদার আর এলাকার মানুষজন আমাদের ছেঁকে ধরল। নীচ থেকে ওরা সবাই সবুজ আগুনের বিস্ফোরণ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

মিহিরদা আগেই আমাদের বলে রেখেছিলেন, কারও সঙ্গে একটি কথাও নয়। আমরা যা দেখেছি, তা যেন আর কেউ জানতে না পারে। পাতালদেবতার রহস্য রহস্যের আড়ালেই থাক।

ফেরার দিন ট্রেনে বসে কত কথাই না মনে পড়ছিল আমার! কিছুদিন আগে কোন 'আমি' এই পুরুলিয়ায় এসেছিলাম, আর আজ কোন 'আমি' কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

ট্রেনে জানলার ধারে বসে পেছনে ছুটে যাওয়া মাঠ-প্রান্তর দেখছিলাম। আর সেই চঞ্চল প্রকৃতির বুকে প্রিয়বরণের মুখটা বারবার ভেসে উঠছিল। ওর ডিওডোর‌্যান্টের গন্ধ পাচ্ছিলাম আমি। আর কে যেন কানের খুব কাছে 'ম্যাডাম!' বলে ডেকে উঠছিল। তারপর বলছিল, '...ম্যাডাম, আপনাকে দেখার পর থেকে আমার সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে আগে দেখা হলে আপনার বাপিকে...।'

আমি হাতের পিঠ দিয়ে চোখের কোণ মুখে নিলাম।

বাপির মৃত্যুরহস্য আমি ভেদ করতে এসেছিলাম। পুরোটা না পারলেও তার অনেকটাই বোধহয় পেরেছি। তবে আরও যেটা আমরা পেরেছি সেটা হল, পাতালদেবতা আর তাকে ঘিরে গজিয়ে ওঠা হাজার কিংবদন্তি আমরা খতম করতে পেরেছি। বিস্ময়বালক মলিন সামন্ত আমাদের হয়ে সে-কাজ করেছে।

সেই রাতের পর থেকেই মলিন বদলে গেছে। ও এখন সুস্থ স্বাভাবিক আট-ন'বছরের এক বালক। ও আর আগের জন্মের কথা বলতে পারে না। ওর শরীরের উষ্ণতা বেড়ে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আশা করি, প্রতি মাসে ওর গা থেকে যে-অস্বাভাবিক গন্ধটা বেরোত সেটাও আর বেরোবে না।

সবচেয়ে আশ্চর্য হল, পাতালদেবতাকে ঘিরে সবকথাই ছেলেটা ভুলে গেছে, কিন্তু ওর 'প্রিয়কাকু'র কথা একটুও ভোলেনি। মাঝে-মাঝেই কাকুর কথা মনে করে ছেলেটা কেঁদে উঠছিল।

আজ চলে আসার সময়ে মলিন আমার জামা ধরে কম টানাটানি করেনি। ওর বাবা আর মা আরও ক'টা দিন থেকে যাওয়ার জন্যে আমাদের বারবার করে বলছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, তা হয় না। বাড়িতে আমার মা আমার জন্যে অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছে।

ফিরে গিয়ে মা-কে আমি বাপির গল্প শোনাব। আরও শোনাব রোগাসোগা আবেগপ্রবণ এক তরুণের কথা—যে আমাদের নতুন জীবন দিয়েছে, আর নিজের প্রাণ দিয়েছে।

আমার দু-চোখে আবার ঢেউ এসে গেল। ট্রেনের জানলায় হাত রেখে তার ওপরে চিবুক রাখলাম। জলভরা চোখে সেই ভাসা-ভাসা মুখটা দেখতে লাগলাম। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছিল না। চোখের জল মুছতেও ইচ্ছে করছিল না। আমি মনে-মনে 'ম্যাডাম!' ডাকটা শুনতে পেলাম।

আমার 'অ্যাক্স এফেক্ট'। আমার প্রিয় 'অ্যাক্স এফেক্ট'।

ঝিমলি ওপাশের সিটে বসে আমাকে নাম ধরে ডাকছিল, কিন্তু আমার সাড়া দিতে ইচ্ছে করছিল না।

আমি যে তখন অন্য একজনের ডাকে সাড়া দিচ্ছি।